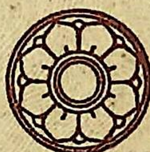
শ্রীঅরবিন্দের গীতা

দ্বিতীয় খণ্ড



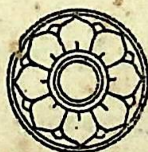


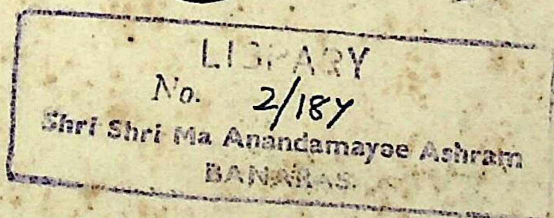
শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দের গীতা

দ্বিতীয় খণ্ড

(শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gita হইতে অনূদিত)





ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

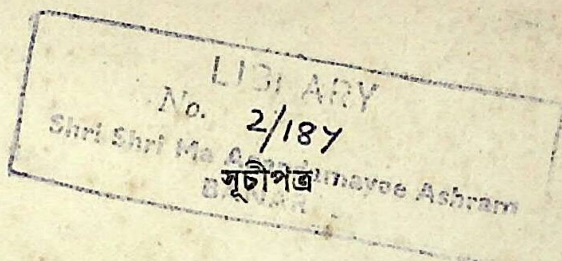
প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

অনুবাদক
শ্রীঅনিলবরণ রায়

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
১৯৩৯

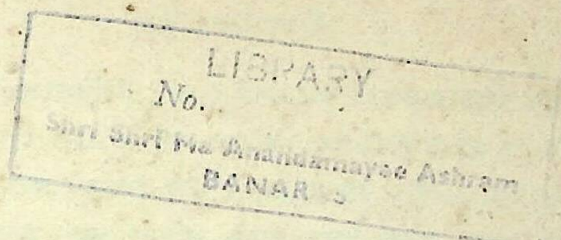
প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ ভড়
শক্তি প্রেস
২৭।৩বি হরি ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

২
আড়াই টাকা



সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১১।	কর্ম্ম ও যজ্ঞ	১
১২।	যজ্ঞের মর্ম্ম	১৫
১৩।	যজ্ঞের অধীশ্বর	৩১
১৪।	দিব্য কর্ম্মের নীতি	৪৬
১৫।	অবতারের সম্ভাবনা ও প্রয়োজন	৬৫
১৬।	অবতরণের প্রণালী	৮৭
১৭।	দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম	১০৪
১৮।	দিব্য কর্ম্মী	১১৮
১৯।	সমতা	১৩৭
২০।	সমতা ও জ্ঞান	১৫৯
২১।	প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব	১৮০
২২।	ত্রিগুণাতীত	২০২
২৩।	নির্ব্বাণ ও সংসারের কাজ	২১৯
২৪।	কর্ম্মযোগের সারতত্ত্ব	২৪৪



শ্রীঅরবিন্দের গীতা

কর্ম্ম ও যজ্ঞ

বুদ্ধিযোগ এবং বুদ্ধিযোগের পরিণাম ব্রাহ্মীস্থিতি—ইহা লইয়াই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগ লিখিত হইয়াছে। এইখানেই গীতার অনেক শিক্ষার বীজ নিহিত রহিয়াছে,—গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম, সমতা, বাহ্যসন্ন্যাস পরিত্যাগ, ভগবানে ভক্তি, এই সকল শিক্ষারই সূত্রপাত এখানে হইয়াছে, তবে তাহা খুব স্বল্প এবং অস্পষ্ট। এখন পর্য্যন্ত যে শিক্ষার উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে তাহা এই—মানুষ যে সাধারণতঃ কামনা লইয়া কার্য্য করে তাহা হইতে বুদ্ধিকে ফিরাইতে হইবে, ইন্দ্রিয়সুখের সন্ধানে ফিরিয়া সাধারণতঃ মানুষের চিত্ত মনের যে বেগ ও অজ্ঞতা হয় তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে, লক্ষ বাসনার পশ্চাতে ধাবমান বুদ্ধি ও ইচ্ছাকে ফিরাইয়া ব্রাহ্মীস্থিতির নিষ্কাম স্থির ঐক্য, নিরুদ্বেগ শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অর্জ্জুন এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলেন। এসব তাঁহার কাছে একেবারে নূতন নহে; ইহা তৎকালে প্রচলিত সেই শিক্ষার সার

মর্ম্ম যাহা মানুষকে জ্ঞানের পথ দেখাইয়া দেয়, সিদ্ধিলাভের উপায়স্বরূপ সংসার ও কর্ম্ম ত্যাগের পথ, সন্ন্যাসের পথ দেখাইয়া দেয়। ইন্দ্রিয়-সুখ, কামনা, মানবীয় কর্ম্ম ছাড়িয়া বুদ্ধিকে ঈশ্বরমুখী করা, সেই এক নিষ্ক্রিয় পুরুষ, অচল অরূপ ব্রহ্মের অভিমুখ করা—ইহা যে জ্ঞানের সনাতন বীজ তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে কর্ম্মের স্থান নাই, কারণ কর্ম্ম অজ্ঞানের; কর্ম্ম জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত; কামনা ইহার বীজ এবং বন্ধন ইহার ফল। ইহাই তৎকাল প্রচলিত দার্শনিক মত এবং কৃষ্ণ যখন বলিলেন যে, বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট, তখন তিনিও এই মত স্বীকার করিয়া লইলেন বলিয়াই মনে হয়। অথচ, তিনি বিশেষ করিয়া কর্ম্মকে যোগের অঙ্গ বলিতে লাগিলেন, অতএব, এই শিক্ষায় মূলতঃ একটা অসামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। শুধু তাহাই নহে; কারণ, কিছুকাল অতি সামান্য, নিতান্ত নির্দ্দোষ কোন কর্ম্ম করা চলিতে পারে; কিন্তু এখানে অর্জ্জুনের সম্মুখে যে কর্ম্ম তাহা আত্মার নিষ্কম্প শান্তি ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী,—এ কর্ম্ম ভীষণ, এমন কি পৈশাচিক, ইহা নিষ্ঠুর রক্তপাতের যুদ্ধ, একটা বিরাট হত্যাকাণ্ড। অথচ আভ্যন্তরীণ শান্তি, নিষ্কাম সমতা এবং ব্রাহ্মীস্থিতি সম্বন্ধে শিক্ষার দ্বারা এই ভীষণ কর্ম্মকে সমর্থন করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই যে বিরোধ, এখনও ইহার সামঞ্জস্য করা হয় নাই। অর্জ্জুনের অভিযোগ এই যে, তাঁহাকে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা বিরোধপূর্ণ এবং গোলমেলে—মানুষ যাহার সাহায্যে সোজা নিশ্চিত শ্রেয়ের দিকে যাইতে পারে এ শিক্ষা সেরূপ নহে। এই আপত্তির উত্তরে গীতা কর্ম্মের প্রকৃত নীতি আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

গুরু প্রথমেই মুক্তিলাভের দুইটি স্বতন্ত্র পন্থার প্রভেদ করিলেন,—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩।৩

এ সংসারে মুক্তিলাভ করিতে হইলে মানুষ জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ যে-কোন একটি অবলম্বন করিতে পারে। সাধারণ ধারণা এই যে, জ্ঞানমার্গ কর্ম্মকে মুক্তির পরিপন্থী বলিয়া পরিত্যাগ করে, কর্ম্মমার্গ কর্ম্মকে মুক্তির সহায় বলিয়া গ্রহণ করে। ভগবান এখন এই দুইয়ের মিশ্রণের বা সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিলেন না, কেবল এই দেখাইয়া আরম্ভ করিলেন যে, সাংখ্যদের যে ত্যাগ, শারীরিক ত্যাগ, "সন্ন্যাস," তাহা একমাত্র পথও নহে, অন্যটি অপেক্ষা ভাল পথও নহে। অবশ্য আত্মাকে, পুরুষকে "নৈষ্কর্ম্ম্য" বা শান্ত কর্ম্মশূন্যতার ভাব লাভ করিতে হইবে ; কারণ প্রকৃতিই কর্ম্ম করে, আত্মাকে এই কর্ম্মস্রোতের উপরে উঠিতে হইবে এবং মুক্তি ও শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির ক্রিয়া-পরম্পরা অবিচলিতভাবে অবলোকন করিতে হইবে। পুরুষের নৈষ্কর্ম্ম্য বলিতে বস্তুতঃ ইহাই বুঝায়, প্রকৃতির ক্রিয়াপরম্পরার বিরতি বুঝায় না। অতএব, কোনরূপ কর্ম্ম না করিলেই যে এই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ ও ভোগ করা যায় এরূপ ভাবা ভুল। শুধু কর্ম্ম পরিত্যাগই যথেষ্ট নহে, এমন কি মুক্তিলাভের ইহা ঠিক পথও নহে।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৩।৪

কর্ম্ম হইতে বিরত হইলেই কেহ নিষ্ক্রিয় ভাব ভোগ করে না, কেবল কর্ম্মসন্ন্যাসেই সিদ্ধিলাভ হয় না।

মর্ম্ম যাহা মানুষকে জ্ঞানের পথ দেখাইয়া দেয়, সিদ্ধিলাভের উপায়স্বরূপ সংসার ও কর্ম্ম ত্যাগের পথ, সন্ন্যাসের পথ দেখাইয়া দেয়। ইন্দ্রিয়-সুখ, কামনা, মানবীয় কর্ম্ম ছাড়িয়া বুদ্ধিকে ঈশ্বরমুখী করা, সেই এক নিষ্ক্রিয় পুরুষ, অচল অরূপ ব্রহ্মের অভিমুখ করা—ইহা যে জ্ঞানের সনাতন বীজ তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে কর্ম্মের স্থান নাই, কারণ কর্ম্ম অজ্ঞানের; কর্ম্ম জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত; কামনা ইহার বীজ এবং বন্ধন ইহার ফল। ইহাই তৎকাল প্রচলিত দার্শনিক মত এবং কৃষ্ণ যখন বলিলেন যে, বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট, তখন তিনিও এই মত স্বীকার করিয়া লইলেন বলিয়াই মনে হয়। অথচ, তিনি বিশেষ করিয়া কর্ম্মকে যোগের অঙ্গ বলিতে লাগিলেন, অতএব, এই শিক্ষায় মূলতঃ একটা অসামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। শুধু তাহাই নহে; কারণ, কিছুকাল অতি সামান্য, নিতান্ত নির্দ্দোষ কোন কর্ম্ম করা চলিতে পারে; কিন্তু এখানে অর্জ্জুনের সম্মুখে যে কর্ম্ম তাহা আত্মার নিষ্কম্প শান্তি ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী,—এ কর্ম্ম ভীষণ, এমন কি পৈশাচিক, ইহা নিষ্ঠুর রক্তপাতের যুদ্ধ, একটা বিরাট হত্যাকাণ্ড। অথচ আভ্যন্তরীণ শান্তি, নিষ্কাম সমতা এবং ব্রাহ্মীস্থিতি সম্বন্ধে শিক্ষার দ্বারা এই ভীষণ কর্ম্মকে সমর্থন করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই যে বিরোধ, এখনও ইহার সামঞ্জস্য করা হয় নাই। অর্জ্জুনের অভিযোগ এই যে, তাঁহাকে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা বিরোধপূর্ণ এবং গোলমেলে—মানুষ যাহার সাহায্যে সোজা নিশ্চিত শ্রেয়ের দিকে যাইতে পারে এ শিক্ষা সেরূপ নহে। এই আপত্তির উত্তরে গীতা কর্ম্মের প্রকৃত নীতি আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

গুরু প্রথমেই মুক্তিলাভের দুইটি স্বতন্ত্র পন্থার প্রভেদ করিলেন,—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩।৩

এ সংসারে মুক্তিলাভ করিতে হইলে মানুষ জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ যে-কোন একটি অবলম্বন করিতে পারে। সাধারণ ধারণা এই যে, জ্ঞানমার্গ কর্ম্মকে মুক্তির পরিপন্থী বলিয়া পরিত্যাগ করে, কর্ম্মমার্গ কর্ম্মকে মুক্তির সহায় বলিয়া গ্রহণ করে। ভগবান এখন এই দুইয়ের মিশ্রণের বা সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিলেন না, কেবল এই দেখাইয়া আরম্ভ করিলেন যে, সাংখ্যদের যে ত্যাগ, শারীরিক ত্যাগ, "সন্ন্যাস," তাহা একমাত্র পথও নহে, অন্যটি অপেক্ষা ভাল পথও নহে। অবশ্য আত্মাকে, পুরুষকে "নৈষ্কর্ম্ম্য" বা শান্ত কর্ম্মশূন্যতার ভাব লাভ করিতে হইবে; কারণ প্রকৃতিই কর্ম্ম করে, আত্মাকে এই কর্ম্মস্রোতের উপরে উঠিতে হইবে এবং মুক্তি ও শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির ক্রিয়া-পরম্পরা অবিচলিতভাবে অবলোকন করিতে হইবে। পুরুষের নৈষ্কর্ম্ম্য বলিতে বস্তুতঃ ইহাই বুঝায়, প্রকৃতির ক্রিয়াপরম্পরার বিরতি বুঝায় না। অতএব, কোনরূপ কর্ম্ম না করিলেই যে এই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ ও ভোগ করা যায় এরূপ ভাবা ভুল। শুধু কর্ম্ম পরিত্যাগই যথেষ্ট নহে, এমন কি মুক্তিলাভের ইহা ঠিক পথও নহে।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৩।৪

কর্ম্ম হইতে বিরত হইলেই কেহ নিষ্ক্রিয় ভাব ভোগ করে না, কেবল কর্ম্মসন্ন্যাসেই সিদ্ধিলাভ হয় না।

কিন্তু ইহা মোক্ষ লাভের একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপায় নহে কি? কারণ, প্রকৃতির কর্ম্ম যদি চলিতে থাকে তাহা হইলে পুরুষ তাহাতে বদ্ধ না হইয়া কেমন করিয়া থাকিবে? আমি যুদ্ধ করিব অথচ আমার আত্মা "যুদ্ধ করিতেছি" বলিয়া ভাবিবে না, জয়াকাঙ্ক্ষ করিবে না, পরাজয়ে বিচলিত হইবে না, ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইহাই সাংখ্যদের শিক্ষা যে, যে-ব্যক্তি প্রকৃতির ক্রিয়ায় নিযুক্ত হয় তাহার বুদ্ধি অহঙ্কার অজ্ঞান ও কামনায় বদ্ধ হয় এবং সেজন্য কর্ম্মে আকৃষ্ট হয়; কিন্তু যদি বুদ্ধি সরিয়া আইসে তাহা হইলে কামনা ও অজ্ঞানের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মও শেষ হইয়া যায়। অতএব মুক্তিলাভ করিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেই হইবে। অর্জ্জুন প্রকাশ না করিলেও তাঁহার মনে যে তৎকাল প্রচলিত এই যুক্তি উঠিয়াছিল তাহা তাঁহার পরের কথা হইতেই বুঝা যায়; ভগবান তৎক্ষণাৎ ইহা বুঝিয়াই উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, এরূপ ত্যাগ অবশ্যপ্রয়োজনীয় ত নহেই, এমন কি সম্ভবও নহে।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৩।৫

"কোনও ব্যক্তি কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। প্রকৃতি-জাত গুণসকলের দ্বারা চালিত হইয়া অবশভাবে সকলকেই কর্ম্ম করিতে হয়।" বিশ্ব জুড়িয়া চিরকাল বিশ্বশক্তির যে বিরাট ক্রিয়া চলিতেছে তাহার তীব্র অনুভূতিই গীতার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পরবর্ত্তীকালে তান্ত্রিক শাক্তগণ এইদিকে বিশেষ জোর দিয়াছিলেন—এমন

কি তাঁহারা শক্তিকে পুরুষেরও উপরে স্থান দিয়াছিলেন। গীতাতে যদিও ইহা তেমন পরিস্ফুট হয় নাই, তথাপি গীতার ঈশ্বরবাদ ও ভক্তিতত্ত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহা প্রাচীন বেদান্তের কর্ম্মত্যাগের দিকে ঝোঁক বিশেষভাবে সংশোধন করিয়াছে। প্রাকৃতিক জগতে দেহধারী মানব কর্ম্ম বন্ধ করিতে পারে না—এক মুহূর্ত্তের জন্য, এক সেকেণ্ডের জন্যও পারে না; তাহার এখানে বাঁচিয়া থাকাই একটা কর্ম্ম; সমগ্র বিশ্বজগৎই ভগবানের একটি কর্ম্ম, কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাও তাঁহারই লীলা।

আমাদের শারীরিক জীবন, ইহার পালন ও রক্ষা, ইহা একটি পথ-যাত্রার মত, "শরীরযাত্রা"—কর্ম্ম ভিন্ন ইহা সম্পন্ন করা যায় না। কিন্তু যদিই কোন মানব শরীর পালন না করিয়া থাকিতে পারে, যদি সর্ব্বদা গাছের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বা প্রস্তরের ন্যায় জড়বৎ বসিয়া থাকিতে পারে, "তিষ্ঠতি", তথাপি এরূপ নিশ্চল বা জড়ভাবে থাকিলেই সে প্রকৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না; প্রকৃতির ক্রিয়া-পরম্পরা হইতে সে মুক্তি পাইবে না। কারণ, কর্ম্ম শব্দে শুধু আমাদের শারীরিক ক্রিয়া এবং চলাফেরাই বুঝায় না; আমাদের মানসিক জীবনও একটা মস্ত বড় জটিল কর্ম্ম—বিশ্রামহীন শক্তির এইটাই বরং বৃহত্তর এবং অধিকতর প্রয়োজনীয় কর্ম্ম—এই মানসিক ক্রিয়াই শারীরিক ক্রিয়ার কারণ ও নির্দ্দেশক। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি আমাদের বন্ধনের উপলক্ষ্য মাত্র, তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে মনের ঝোঁকই প্রকৃত কার্য্যকরী কারণ। কোনও মানুষ তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে পারে এবং তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারে—কিন্তু তাহার মন

যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় চিন্তা করিতে থাকে তাহা হইলে তাহার কোন লাভই হইল না। এরূপ ব্যক্তি আত্মসংযমের ভুল ধারণার বশে নিজকে বিভ্রান্ত করে; সে ইহার উদ্দেশ্য বা প্রকৃত তথ্য বুঝে না,—নিজের আভ্যন্তরীণ জীবনের মূল তত্ত্বই বুঝে না; অতএব তাহার আত্ম-সংযমের সমগ্র প্রণালীই মিথ্যা এবং ব্যর্থ। *

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৩।৬

শুধু শরীরের কর্ম্ম, এমন কি শুধু মনের কর্ম্মও কিছু নয়,—সে সব বন্ধনও নহে, বন্ধনের প্রথম কারণও নহে। প্রকৃতির মহাশক্তি মন প্রাণ ও শরীররূপ তাহার বিরাট ক্ষেত্রে নিজভাবে ক্রীড়া করিবেই; তাহার মধ্যে বিপদের জিনিষ হইতেছে তাহার তিন গুণের মুগ্ধ করিবার শক্তি—এই তিন গুণ বুদ্ধিকে গুলাইয়া দিয়া আত্মাকে ঢাকিয়া ফেলে। আমরা পরে দেখিব যে, ইহা লইয়াই গীতার কর্ম্ম ও মুক্তির সমস্ত কথা। গুণত্রয়ের মুগ্ধকরী ক্রিয়া হইতে মুক্ত হও—তাহার পর কর্ম্ম থাকিতে পারে, থাকিবেই, এমন কি বৃহত্তম, সমৃদ্ধতম, বিষম উপদ্রবময় কর্ম্মও চলিতে পারে; তাহাতে কোন হানি হইবে না, কারণ আত্মা নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করে, আর কিছুই পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না।

কিন্তু উপস্থিত গীতা এই বড় কথাটা তুলিতেছে না। মনই যখন

---

* "মিথ্যাচার" শব্দের অর্থ কপটাচারী (hypocrite) বলিয়া আমার মনে হয় না! যে মনুষ্য এরূপ সম্পূর্ণ কঠোর ভাবে নিজেকে বঞ্চিত করে সে কেমন করিয়া কপটাচারী হইতে পারে? সে ভ্রমে পতিত, "বিমূঢ়াত্মা", এবং তাহার "আচার"—তাহার গতানুগতিক আত্মসংযমের প্রণালী মিথ্যা এবং ব্যর্থ—এই মাত্রই যে গীতার অর্থ তাহাতে সন্দেহ নাই।

যান্ত্রিক কারণ, কর্ম্মহীনতা যখন অসম্ভব, তখন শরীর ও মনের ক্রিয়াকে সংযত ও নিয়মিত করাই কর্ত্তব্য ও যুক্তিযুক্ত। বুদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিবে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে তাহাদের যাহা প্রকৃত কাজ, কর্ম্ম, তাহাতেই নিযুক্ত করিবে—কিন্তু যোগরূপে এই কর্ম্ম করিতে হইবে।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৩।৭

কিন্তু এই আত্মসংযমের সারতত্ত্ব কি, যোগরূপে কর্ম্ম করা বা কর্ম্ম-যোগের অর্থ কি? ইহা অনাসক্তি, ইন্দ্রিয়বিষয়ে এবং কর্ম্মের ফলে মনকে লিপ্ত হইতে না দিয়াই কর্ম্ম করিতে হইবে। সম্পূর্ণ কর্ম্মশূন্যতা নহে—ইহা ভ্রম, মোহ, আত্মপ্রতারণা, ইহা অসম্ভব। সম্যকভাবে, স্বাধীনতার সহিত কর্ম্ম করিতে হইবে, ইন্দ্রিয় ও রিপুর বশ্যতা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, কামনাশূন্য হইয়া অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে—এই সবই সিদ্ধিলাভের প্রথম গূঢ় রহস্য। কৃষ্ণ বলিলেন, এইরূপে আত্মসংযমের সহিত কর্ম্ম কর, নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্; আমি বলিয়াছি যে, জ্ঞান, বুদ্ধি কর্ম্ম অপেক্ষা বড়, জ্যায়সি কর্ম্মণঃ বুদ্ধিঃ, কিন্তু আমি এমন কথা বলি নাই যে, কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মশূন্যতা বড়, বরং বিপরীতটাই সত্য, কর্ম্ম জ্যায়ঃ হ্যকর্ম্মণঃ। কারণ, জ্ঞান বলিতে কর্ম্মত্যাগ বুঝায় না, সমতা এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ে ও কামনায় অনাসক্তিই বুঝায়। বুদ্ধি যখন প্রকৃতির নিম্নতর ক্রিয়া হইতে মুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মজ্ঞানের শক্তিতে এবং অধ্যাত্মসিদ্ধির শুদ্ধ বিষয়শূন্য আত্মানন্দে মন

ইন্দ্রিয় এবং শরীরের ক্রিয়াকে নিয়মিত করে, নিয়তম্ *, জ্ঞান বলিতে বুদ্ধির সেই অবস্থাই বুঝায়। কর্ম্মযোগের দ্বারা বুদ্ধিযোগ সম্পূর্ণ হয়; আত্মমুক্তিদায়ক বুদ্ধিযোগ কামনাশূন্য কর্ম্মযোগের দ্বারা সার্থক হয়। এইরূপে গীতা নিষ্কাম কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছে এবং সাংখ্যদের কেবল বাহ্যিক শারীরিক বিধি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের প্রণালীর সহিত যোগ প্রণালীর মিলন করিয়াছে।

কিন্তু এখনও একটা মূল সমস্যার সমাধান হয় নাই। মানুষ সাধারণতঃ যে কর্ম্ম করে, শুধু কামনার বশেই তাহা করিয়া থাকে; অন্তঃকরণ যদি কামনা হইতে মুক্ত হয় তাহা হইলে ত কর্ম্মের কোন প্রবৃত্তি বা প্রয়োজনীয়তাই থাকিবে না। শরীর রক্ষার জন্য কতকগুলি কর্ম্ম করিতে আমরা বাধ্য হইতে পারি বটে, কিন্তু ইহাও শরীরের কামনার পরাধীনতা এবং সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে ইহা হইতেও

*নিয়তম্ কর্ম্ম সাধারণতঃ যেরূপ ব্যাখ্যা করা হয় আমি সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারি নাই। সাধারণ টীকাকারেরা নিয়তং কর্ম্ম বলিতে সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতি বেদোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম বুঝিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের "নিয়ম্য" শব্দটাকে লইয়াই যে এই শ্লোকে "নিয়ত" করা হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রথমে কৃষ্ণ একটা তথ্য বর্ণনা করিলেন যে, যে ব্যক্তি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করে সেই শ্রেষ্ঠ—মনসা নিয়ম্য আরভতে কর্ম্মযোগম্, এবং ইহার পরেই এই তথ্য বর্ণনা হইতে একটা উপদেশ বাহির করিলেন, ইহার সারটুকু লইয়া ইহাকে একটি বিধিতে পরিণত করিলেন—নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্—তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর। এখানে "নিয়তম্" শব্দে"নিয়ম্য"-কে লওয়া হইয়াছে এবং আরভতে কর্ম্মযোগম্ হইতে বিধি করা হইয়াছে, কুরু কর্ম্ম। বাহ্যবিধিদ্বারা নির্দ্দিষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম নহে, মুক্ত বুদ্ধির দ্বারা নিয়ত কামনাশূন্য কর্ম্মই গীতার শিক্ষা।

আমাদের মুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় যে ইহা সম্ভব নহে, তাহা হইলে (আমাদের ভিতরের কিছুর দ্বারা পরিচালিত না হইয়া) কর্ম্মের কোন বাহ্য বিধি মানিয়া চলা ব্যতীত আর উপায় নাই; বেদের নিত্যকর্ম্ম, যজ্ঞানুষ্ঠান, নির্দ্দিষ্ট দৈনিক কার্য্য, সামাজিক কর্ত্তব্য এইরূপে বাহ্যবিধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত; যাহারা মুক্তি চায় তাহারা এই সব কর্ম্ম করিতে পারে; এই সকল কর্ম্ম যে তাহাদের কামনানুযায়ী এবং মনোমত সে জন্য নহে, শাস্ত্রে মুক্তিকামীগণকে এই সকল কর্ম্ম করিবার বিধি বা আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই তাহাদিগকে এই সকল নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে হয়। কিন্তু কর্ম্মের নীতি এরূপ বাহ্য না হইয়া যদি আভ্যন্তরীণ হয়, যদি মুক্ত এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও কর্ম্ম তাঁহাদের স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (স্বভাব-নিয়তম্) করিতে হয়—তাহা হইলে কামনা ব্যতীত কর্ম্মের আর কোন আভ্যন্তরীণ নীতিই নাই; এই কামনা উচ্চ বা নীচ হইতে পারে, শরীরের ভোগের কামনা হইতে পারে, হৃদয়ের আবেগ, মনের আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু এসবই প্রকৃতির গুণের অধীন। অতএব গীতার "নিয়ত কর্ম্ম" বলিতে বেদের "নিত্য-কর্ম্ম," আর্য্যসমাজের নীতি অনুযায়ী "কর্ত্তব্য কর্ম্ম" বুঝিতে হইবে এবং গীতার যজ্ঞার্থে কর্ম্ম বলিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনাশূন্য হইয়া বেদোক্ত যজ্ঞ এবং নির্দ্দিষ্ট সামাজিক কর্ত্তব্যসমূহেরই অনুষ্ঠান বুঝিতে হইবে। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার মনে হয় গীতার অর্থ এরূপ স্থূল ও সহজ নহে, এরূপ সঙ্কীর্ণ এবং দেশকালে সীমাবদ্ধ নহে। গীতার শিক্ষা উদার, মুক্ত, সূক্ষ্ম এবং গভীর; ইহা সকল যুগের সকল মনুষ্যেরই উপযোগী, কেবল

কোন বিশেষ যুগ বা কোন বিশেষ দেশের জন্য নহে। বিশেষতঃ, ইহা সকল সময়েই বাহ্য বিধি নিষেধের, খুঁটিনাটি অনুষ্ঠানের, গতানুগতিক ধারণা সমূহের বন্ধন ছাড়াইয়া মূল সত্যের দিকে গিয়াছে, আমাদের প্রকৃতির এবং আমাদের সত্তার প্রধান তত্ত্বগুলিরই হিসাব লইয়াছে। উদার দার্শনিক সত্য এবং প্রয়োগ-উপযোগী আধ্যাত্মিকতা লইয়াই গীতার শিক্ষা—ইহাতে ধর্ম্মের গোঁড়ামি নাই, বাঁধা ধরা বিধি নিষেধ বা বিশেষ দার্শনিক মতবাদে ইহা সীমাবদ্ধ নহে।

সমস্যা হইতেছে এই যে, আমাদের প্রকৃতি যখন এইরূপ এবং কামনাই যখন কর্ম্মের সাধারণ নীতি তখন প্রকৃতভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম করা কিরূপে সম্ভব? কারণ সাধারণতঃ যে সকল কর্ম্মকে নিঃস্বার্থ কর্ম্ম বলা যায় সেগুলি প্রকৃত নিষ্কাম নহে; ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিবর্ত্তে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য —দেশের জন্য, মানব জাতির কল্যাণের জন্য সে সকল কর্ম্ম করা হয়। এই সব কর্ম্ম নির্ব্যক্তিক মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে নির্ব্যক্তিক (impersonal) নহে। আবার, শ্রীকৃষ্ণ বারবার বলিয়াছেন যে, সকল কর্ম্মই আমাদের প্রকৃতির দ্বারা, প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। আমরা যখন শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করি তখনও আমরা নিজেদের প্রকৃতি অনুসারেই কর্ম্ম করি। সাধারণতঃ যে সকল কর্ম্মের বিধি শাস্ত্রে আছে সেগুলি পরোক্ষভাবে আমাদের স্বার্থেরই অনুকূল—আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ভাব, স্বার্থ বা অহঙ্কারের অনুকূল; কিন্তু যদিই অন্যরূপ ধরা যায়, যদি সেই সকল শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের কথা ধরা যায় যেগুলির সহিত আমাদের ছোট বড় কোনরূপ স্বার্থের সম্পর্ক নাই—সেগুলিও আমরা আমাদের প্রকৃতির বশেই করিয়া থাকি, কারণ, আমাদের স্বভাব যদি

ভিন্নরূপ হইত তাহা হইলে হয়ত আমরা ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিতে যাইতাম না।—হয় আমরা শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের স্থখের অনুসন্ধানেই কর্ম্ম করিতাম অথবা নিজেদের বুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্য বাছিয়া লইতাম—নতুবা সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া একক তপস্বী বা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতাম। আমাদের বাহিরের কোন আইন কানুন মানিয়া আমরা নির্ব্যক্তিক হইতে পারি না, কারণ এইভাবে আমরা নিজেদের বাহিরে যাইতে পারি না, শুধু আমাদের ভিতরেই যে সত্তা রহিয়াছে তাহাতে উঠিতে পারিলে, আমাদের যে মুক্ত আত্মা সর্ব্বভূতেরই এক আত্মা অতএব সকল ব্যক্তিক স্বার্থ হইতে মুক্ত তাহাতে উঠিতে পারিলে আমরা প্রকৃতভাবে নির্ব্যক্তিক হইতে পারি। বিশ্বের অতীত যে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন, যিনি তাঁহার বিশ্বকর্ম্ম বা ব্যক্তিগত কর্ম্ম কিছু দ্বারাই বদ্ধ নহেন, সেইখানে আমাদিগকে উঠিতে হইবে। গীতা ইহাই শিক্ষা দিয়াছে—কামনাশূন্যতা ইহার উপায় মাত্র, শুধু কামনাশূন্যতাই জীবনের লক্ষ্য নহে। বুঝিলাম, কিন্তু কেমন করিয়া ইহা হইতে পারে? ভগবান বলিলেন, যজ্ঞকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া সকল কর্ম্ম করিয়া ইহা হইতে পারে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৩।৯

—"যজ্ঞার্থে কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে লোক কর্ম্মে বদ্ধ হয়। অতএব, হে কৌন্তেয়, আসক্তিশূন্য হইয়া যজ্ঞার্থে কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর।" শুধু যজ্ঞ এবং সামাজিক কর্ত্তব্য নহে, সকল কর্ম্মই যজ্ঞার্থে করা যাইতে পারে; প্রত্যেক কর্ম্মই ছোট বা বড় স্বার্থের

জন্য করা যাইতে পারে অথবা ঈশ্বরার্থে করা যাইতে পারে। প্রকৃতির সকল বস্তু এবং সকল কর্ম্মই ঈশ্বরের জন্য। ইশ্বর হইতেই ইহার উৎপত্তি, তাঁহার দ্বারাই ইহা রক্ষিত হয়, এবং তাঁহার দিকেই ইহার লক্ষ্য। কিন্তু যতদিন আমরা অহংভাবের (ego sense) অধীন ততদিন আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি না, ততদিন আমরা অহং ভাবের বশে স্বার্থের জন্য কর্ম্ম করি, যজ্ঞার্থে নহে। অহঙ্কারই সকল বন্ধনের গ্রন্থি। অহং সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া ভগবানের উদ্দেশে কর্ম্ম করিলে আমরা এই গ্রন্থি শিথিল করিতে এবং শেষকালে মুক্তিলাভ করিতে পারিব।

যাহাই হউক, গীতা প্রথমে যজ্ঞের বেদোক্ত বর্ণনাই ধরিয়াছে এবং তৎকালীন প্রচলিত ভাষাতেই যজ্ঞের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছে। গীতা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই ইহা করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, সন্ন্যাস ও কর্ম্মের যে বিরোধ তাহা দুই প্রকারের—প্রথমতঃ, সাংখ্য ও যোগের মধ্যে যে বিরোধ, মূল নীতিতে এই বিরোধের সমাধান ইতি-পূর্ব্বেই করা হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, বেদবাদ ও বেদান্তবাদের মধ্যে যে বিরোধ তাহা সমাধান করিতে এখনও বাকী আছে। প্রথমটিতে এই বিরোধ সাধারণভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে এবং কর্ম্মশব্দ সাধারণ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সাংখ্যের আরম্ভ অক্ষর ও নিষ্ক্রিয় পুরুষের দিব্যভাব লইয়া—প্রত্যেক জীবই প্রকৃতপক্ষে এইরূপ পুরুষ; সাংখ্য পুরুষের নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতার প্রভেদ করিয়াছে—অতএব কর্ম্মত্যাগই সাংখ্য মতে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি। যোগের আরম্ভ ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া—ঈশ্বর প্রকৃতির কার্য্যাবলীর প্রভু অতএব

তাহাদের উপরে; সুতরাং কর্ম্মসন্ন্যাস যোগের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি নহে, কর্ম্মের উপর জীবের প্রাধান্যলাভ এবং সকল কর্ম্ম করিতে থাকিলেও মুক্ত থাকা ইহাই যোগের লক্ষ্য। বেদবাদ ও বেদান্ত-বাদের মধ্যে যে-বিরোধ সেখানে কর্ম্ম বলিতে বৈদিককর্ম্ম, এমন কি কখনও কেবল বৈদিক যজ্ঞ ও আনুষ্ঠানিক কর্ম্মই বুঝায়—অন্য কর্ম্ম মুক্তির সহায় নহে বলিয়া পরিত্যাজ্য। মীমাংসকগণের যে বেদবাদ তদনুসারে এই সকল কর্ম্ম মুক্তির উপায়স্বরূপ সম্পাদন করিতেই হইবে; উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদান্তবাদ অনুসারে অজ্ঞান অবস্থায় প্রাথমিক প্রক্রিয়াভাবেই কর্ম্মের উপযোগিতা, শেষে কর্ম্মকে অতিক্রম করিতে হইবে, পরিত্যাগ করিতে হইবে কারণ ইহা মুক্তির পরিপন্থী। বেদবাদ যজ্ঞের দ্বারা দেবতার পূজা করিত এবং বিশ্বাস করিত যে, তাঁহারা আমাদের মোক্ষলাভে সাহায্য করেন। বেদান্তবাদের মতে দেবতাসকল মানসিক এবং জড়-জগতের শক্তি এবং আমাদের মুক্তির পরিপন্থী (উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, মানুষ দেবতাদের গোধনস্বরূপ—তাঁহারা চান না যে মানুষ জ্ঞানলাভ করে বা মুক্ত হয়); এই মতে ভগবান অক্ষর ব্রহ্ম—তাঁহাকে যজ্ঞ ও পূজা আদি কর্ম্মের দ্বারা লাভ করা যায় না, জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। কর্ম্মের দ্বারা শুধু ঐহিক ফল এবং নিম্নতর স্বর্গলাভ করা যায়, অতএব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে।

গীতা এই বিরোধের মীমাংসা করিয়াছে—গীতা পুনঃপুনঃ বলিয়াছে যে, দেবতারা সকল যোগ ও পূজা ও যজ্ঞ ও তপস্যার প্রভু সেই এক দেবের, ঈশ্বরের, বিভিন্ন রূপ মাত্র; এবং যদি ইহা

সত্য হয় যে, দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিলে ঐহিক সুখ এবং স্বর্গ লাভ করা যায় তাহা হইলে ইহাও সত্য যে, ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ করিলে তাহাদের উপরে যাইয়া পরম মুক্তিলাভ করা যায়। কারণ ঈশ্বর এবং অক্ষর ব্রহ্ম বিভিন্ন নহেন, উভয়েই এক— উভয়ের মধ্যে যাহাকে হউক লক্ষ্য করিলে একই দিব্য জীবনের অভিমুখী হওয়া যায়। সকল কর্ম্মেরই পরিণতি ও পূর্ণতা হইতেছে ভগবানের জ্ঞানে, সর্ব্বং কর্ম্মাখিলম্ পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। কর্ম্ম-সকল বাধা নহে, তাহারা চরম জ্ঞান লাভের পথ। এইরূপে যজ্ঞ শব্দের উদার ব্যাখ্যা করিয়া এই বিরোধেরও সামঞ্জস্য করা হইল। বাস্তবিক, এই বিরোধ সাংখ্য ও যোগের মধ্যে বৃহত্তর বিরোধেরই একটি বিশিষ্ট রূপ। বেদবাদ একরকম সঙ্কীর্ণ বিশেষ রকমের যোগ; বৈদান্তিকদের মূল নীতি সাংখ্যদের সহিত এক, কারণ উভয় মতানুসারেই বুদ্ধিকে প্রকৃতির ভেদাত্মক শক্তিসকল হইতে, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় হইতে, অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং বাহ্যবিষয় সকল হইতে ফিরাইয়া লইয়া সেই অভিন্ন অক্ষরে লইয়া আসাই মুক্তি লাভের সাধনা। এইরূপ সামঞ্জস্য সাধনের উদ্দেশ্যে মনে রাখিয়াই গুরু প্রথমে যজ্ঞের বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু প্রথম হইতে বরাবরই তাঁহার লক্ষ্য সঙ্কীর্ণ বেদোক্ত যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহাদের উদার ব্যাপক অর্থের উপরই ছিল। এইরূপে সঙ্কীর্ণ আনুষ্ঠানিক ধারণাগুলিকে বিস্তৃত করিয়া তাহাদের মধ্যে বৃহৎ সাধারণ সত্য-গুলিকে লওয়া সকল সময়েই গীতার বিশিষ্ট প্রণালী।

যজ্ঞের মর্ম্ম

গীতা যজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝে তাহা দুইটি বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত করা হইয়াছে। একটি ব্যাখ্যা তৃতীয় অধ্যায়ে, অপরটি চতুর্থ অধ্যায়ে ; প্রথমটির ভাষা এরূপ যে শুধু তাহাই ধরিলে যজ্ঞ বলিতে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ (বৈদিক) বুঝায় বলিয়াই মনে হয় ; দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় যজ্ঞকে উদার দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের রূপক বলিয়াই বুঝান হইয়াছে এবং উহাকে উচ্চ মনস্তত্ত্বমূলক ও অধ্যাত্ম সত্যের স্তরে উন্নীত করা হইয়াছে।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩।১০-১৬

"সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞ সহিত প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ কর ; এই যজ্ঞই তোমাদিগকে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধন কর ; সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন; এইরূপে পরস্পরের সম্বর্দ্ধন করিতে করিতে তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে। যজ্ঞের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করিবেন ; এই দেবদত্ত ভোগ লাভ করিয়া যে-ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোগ করে সে চোরই। যাঁহারা যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন ; কিন্তু যাহারা কেবল আপনার জন্যই অন্ন পাক করে, সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে। অন্ন হইতে জীবগণ উৎপন্ন হয় ; মেঘের বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে, যজ্ঞ হইতে মেঘ এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুৎপন্ন ; অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহলোকে এইরূপে প্রবর্ত্তিত চক্র যে অনুবর্ত্তন না করে, হে পার্থ, পাপময় জীবন ইন্দ্রিয়পরায়ণ সে-ব্যক্তি বৃথা জীবিত থাকে।" এইস্থানে যজ্ঞ বলিতে বেদানুমোদিত আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বুঝাইতেছে বলিয়া যে মনে হয় ইহার প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। শ্রীকৃষ্ণ এখানে যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া কর্ম্ম অপেক্ষা আধ্যাত্মিক মানবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইলেন

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ৩।১৭, ১৮

"কিন্তু যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই পরিতুষ্ট এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠান অনাবশ্যক। ইহলোকে তাঁহার কর্ম্ম করিয়া কোন লাভ নাই, কর্ম্ম না করিয়াও কোন লাভ নাই; কোন ঈপ্সিত বস্তু লাভের জন্য তাঁহাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে কাহারও উপর নির্ভর করিতে হয় না।"

তাহা হইলে এখানে দুইটি বিভিন্ন বিরোধী আদর্শ দেখা যাইতেছে। একটি বৈদিক, অপরটি বৈদান্তিক। একদিকে কর্ম্মের আদর্শ, যজ্ঞের দ্বারা এবং মনুষ্য ও দেবগণের পরস্পরের উপর নির্ভরতা দ্বারা ইহকালে ভোগ সুখ ও পরকালে পরমার্থ লাভ, অন্যদিকে মুক্ত পুরুষের কঠোরতর জীবনের আদর্শ—তিনি আত্মসত্তায় স্বাধীন, কর্ম্ম বা ভোগের সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই, নরলোক বা দেবলোক লইয়া তিনি ব্যস্ত নহেন—শুধু পরমাত্মার শান্তির মধ্যে তিনি বাস করেন, ব্রহ্মের স্থির আনন্দে তিনি আনন্দলাভ করেন। পরের কয়েকটি শ্লোকে এই দুইটি বিরোধী আদর্শের সমন্বয়ের পথ করা হইয়াছে; উচ্চতর সত্যের অভিমুখ হইলেই কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে না—সেই সত্য লাভ করিবার পূর্ব্বে ও পরে নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনই গূঢ় রহস্য। মুক্ত পুরুষের কর্ম্মের দ্বারা লাভ করিবার কিছুই নাই, তবে কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়াও তাঁহার কোন লাভ নাই এবং কোন

২

ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে বা কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় না।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ৩।১৯
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। ৩।২০

"অতএব যে কর্ম্ম করিতে হইবে (জগতের জন্য, "লোকসংগ্রহার্থে) সর্ব্বদা অনাসক্ত হইয়া তাহা কর ; কারণ অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মানুষ পরমগতি প্রাপ্ত হয়। কারণ জনক প্রভৃতি মহাত্মারা কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন"। ইহা সত্য যে, কর্ম্ম এবং যজ্ঞ শ্রেয়োলাভের উপায়, শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ। কিন্তু কর্ম্ম তিন প্রকার— (১) যজ্ঞহীন যে কর্ম্ম শুধু ব্যক্তিগত ভোগের জন্য করা যায়—ইহা সম্পূর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত, এবং জীবনের মূল নীতির সহিত ইহার সামঞ্জস্য না থাকায় ইহা ব্যর্থ, মোঘং পার্থ স জীবতি। (২) সকাম হইয়াও যে কর্ম্ম যজ্ঞ সহিত করা যায়—এই কর্ম্মে যে ভোগ সুখ লাভ করা যায় তাহা হয় যজ্ঞের ফল স্বরূপ, অতএব ততখানি শুদ্ধ ও পবিত্র। (৩) নিষ্কামভাবে কোনরূপ আসক্তি না রাখিয়া যে-কর্ম্ম করা যায়। শেষোক্ত প্রকারের কর্ম্মের দ্বারাই পরমগতি লাভ করা যায়, পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।

যজ্ঞ, কর্ম্ম, ব্রহ্ম—এই শব্দগুলির আমরা যেরূপ অর্থ করিব তাহার উপরেই এই শিক্ষার সার মর্ম্ম নির্ভর করিতেছে। যজ্ঞ বলিতে যদি আমরা বৈদিক আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বুঝি, যে-কর্ম্ম হইতে ইহার উদ্ভব তাহা যদি বেদোক্ত কর্ম্মবিধি হয় এবং যে-ব্রহ্ম হইতে সকল

কর্ম্মের উদ্ভব তাহা বলিতে যদি আমরা "শব্দব্রহ্ম" বা বেদ বুঝি—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এখানে গীতা বেদোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছে, ইহার অধিক আর কিছুই নাই। আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই পুত্র, ধন, ভোগলাভের যথাযথ উপায়; আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের দ্বারাই বৃষ্টি হয় এবং তাহা দ্বারা প্রজার সমৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে; সমস্ত জীবনই মানুষ ও দেবগণের মধ্যে অনবরত আদান প্রদানের ব্যাপার—এখানে মানুষ দেবগণের প্রদত্ত ভোগ্য বস্তুর দ্বারা দেবগণের সম্বর্দ্ধন করে এবং তাহার ফলে নিজেরা সম্পদ্‌শালী হয়, রক্ষিত হয়, সম্বর্দ্ধিত হয়। অতএব সকল কর্ম্মকেই আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের সহিত করিতে হইবে; যে সকল কর্ম্ম এইরূপে দেবগণের উদ্দেশে করা না হয় তাহা অভিশপ্ত, আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ না করিয়া যে-ভোগ তাহা পাপ। এমন কি পরম শ্রেয়ঃ মুক্তি পর্য্যন্ত আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের দ্বারাই লাভ করিতে হইবে। ইহা কখনও পরিত্যাগ করা চলিবে না। এমন কি মুক্তিকামী ব্যক্তিকেও অনাসক্তভাবে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে; এইরূপে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম অনাসক্তভাবে সম্পাদন করিয়াই জনকাদি মহাত্মাগণ অধ্যাত্ম মুক্তি ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

গীতার অর্থ যে এরূপ হইতেই পারে না তাহা সহজেই বুঝা যায়, কারণ এরূপ অর্থ গীতার বাকী সমস্ত অংশের বিপরীত। এমন কি গীতার এই স্থানেই যাহা বলা হইয়াছে, (অন্য স্থানের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা না ধরিলেও) তাহা হইতে যজ্ঞের উদার অর্থই বুঝা যায়—কারণ, এখানে বলা হইয়াছে "কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উদ্ভূত হয়, কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে

উৎপন্ন, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে উৎপন্ন, অতএব সর্ব্বগত (সর্ব্বব্যাপী) ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।" এখানে এই "অতএব" শব্দের ব্যবহার এবং "ব্রহ্ম" শব্দের পুনরুক্তি প্রণিধানযোগ্য ; কারণ ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং" (ব্রহ্ম হইতেই কর্ম্মের উৎপত্তি) এই স্থলে ব্রহ্মের অর্থ বেদ নহে, ইহা হইতেছে সৃজনাত্মক শব্দ (the creative word), ইহা সর্ব্বব্যাপী, সনাতন, সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বকর্ম্মে অবস্থিত ব্রহ্মের সহিত এক। ভগবানের, শাশ্বতের জ্ঞানই বেদ—পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো"

"বেদসকলের দ্বারা আমিই বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়।" কিন্তু তিনি প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে, ত্রিগুণের ক্রিয়ার মধ্যে যেরূপ, বেদে শুধু তাঁহাকে সেইরূপই জানা যায়, ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ। প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যস্থিত যে ব্রহ্ম তাহা অক্ষর পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত—এই অক্ষর পুরুষ প্রকৃতির সমস্ত গুণক্রিয়ার উপরে, নিস্ত্রৈগুণ্য। ব্রহ্ম এক কিন্তু ইহার আত্মপ্রকাশের স্বরূপ দুইপ্রকার—অক্ষর সত্তা এবং ক্ষর জগতে সকল কর্ম্মের স্রষ্টা ও উদ্ভবকর্ত্তা, আত্মা, সর্ব্বভূতানি ; ইহা বস্তুসকলের অচল সর্ব্বব্যাপী আত্মা এবং ইহা বস্তুসকলের কর্ম্ম-ধারার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব—আত্মসংস্থ পুরুষ এবং প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল পুরুষ ; ইহা অক্ষর ও ক্ষর। এই উভয় স্বরূপেই ভগবান "পুরুষোত্তম" বিশ্বমাঝে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন ; সর্ব্বগুণের অতীত অক্ষরই তাঁহার শান্তি, আত্মস্থতা, সমতার অবস্থা, "সমম্ ব্রহ্ম" ; তথা হইতেই প্রকৃতির গুণে এবং তাহাদের বিশ্বকর্ম্মধারায় তাঁহার প্রকটন চলিয়াছে ;

এই প্রকৃতি-স্থ পুরুষ হইতে, এই সগুণ ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বশক্তির সমস্ত কর্ম্মের * উৎপত্তি; এই কর্ম্ম হইতেই যজ্ঞের তত্ত্ব উদ্ভূত। এমন কি দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে দ্রব্যাদির আদান প্রদান তাহাও এই তত্ত্বেরই অনুসরণে ঘটিয়া থাকে, যথা—যে বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় সেই বৃষ্টি এই কর্ম্মের উপর নির্ভর করে এবং অন্ন হইতে ভূতগণের শরীরের উদ্ভব হয়। কারণ প্রকৃতির সকল ক্রিয়াই প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ এবং ভগবানই সকল কর্ম্ম ও যজ্ঞের ভোক্তা এবং সর্ব্বভূতের মহেশ্বর—ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্ সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্। এই "সর্ব্বগতম্ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্" ভগবানকে জানাই সত্য জ্ঞান, বৈদিক জ্ঞান।

কিন্তু দেবগণের ভিতর দিয়া তাঁহার যে নিম্নস্তরের ক্রিয়া সেই ক্রিয়াতে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। দেবগণ প্রকৃতিতে ভগবানেরই শক্তি। দেব ও মনুষ্য পরস্পরের সহিত আদান প্রদানের দ্বারা যে সম্বর্দ্ধিত হইতেছে ইহার অনুসরণ করিয়া মনুষ্য ক্রমশঃ পরম শ্রেয়োলাভের

---

* এইরূপ ব্যাখ্যাই যে সমীচীন, অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম ভাগ হইতেই তাহা বুঝা যায়, সেখানে নিম্নলিখিত বিশ্বতত্ত্বগুলি বর্ণিত হইয়াছে, অক্ষর (ব্রহ্ম), স্বভাব, কর্ম্ম, ক্ষরভাব, পুরুষ, অধিযজ্ঞ। অক্ষর হইতেছে অক্ষর ব্রহ্ম বা আত্মা (spirit or self); স্বভাব অধ্যাত্ম, ইহা সত্তার মূল প্রকৃতিরূপে, বিবর্ত্তনের নিজস্ব ধারারূপে কর্ম্ম করে এবং ইহা আত্মা হইতে, অক্ষর হইতে উৎপন্ন; সেই স্বভাব হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি, এবং এই কর্ম্মই সৃষ্টির ধারা, বিসর্গ, ইহার দ্বারা সকল প্রাকৃত সত্তা এবং সত্তার সকল পরিবর্ত্তনশীল আন্তর ও ব্যাহ্য রূপ উদ্ভূত হয়; অতএব এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ সবই কর্ম্মের ফল, স্বভাব হইতে উৎপন্ন ক্ষর ভাব; অন্তরাত্মাই পুরুষ—এই ক্ষর জগতে তাহাই ভগবানের অংশ, অধিদৈবতম, তাঁহার অবস্থান হেতু কর্ম্মসকল অন্তরস্থ ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞস্বরূপ হইয়া থাকে; এই যে গুপ্ত ভগবান যজ্ঞ গ্রহণ করেন, তিনিই অধিযজ্ঞ।

যোগ্য হইয়া উঠে। মানুষ বুঝিতে পারে যে, জগতে ভগবানের এই যে কর্ম্মধারা চলিতেছে, তাহার নিজের জীবন তাহারই অংশ মাত্র—তাহা স্বতন্ত্র কিছু নহে, নিজের জন্য যাপন করিবার জিনিষ নহে। সে সংসারে যে সকল ভোগ ও কাম্য লাভ করে তাহা তাহার নিজের চেষ্টায় লব্ধ বলিয়া ভাবে না। সেই সকল যজ্ঞের ফল এবং দেবতাদের দান বলিয়াই সে গ্রহণ করে, অহংভাব ও স্বার্থপরতার বশে নিজের শক্তিতেই সংসার হইতে সে-সব লইবার পাপ চেষ্টা সে করে না। এই ভাব তাহার ভিতরে যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই সে নিজের কামনাসকলকে দমন করে, যজ্ঞকেই জীবনের ও কর্ম্মের নীতিরূপে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হয়, যজ্ঞের অবশেষ স্বরূপ যাহা থাকে তাহাতেই তৃপ্ত হয়, বাকী সমস্তই নিঃসঙ্কোচে তাহার জীবন এবং বিশ্বের জীবনের মধ্যে কল্যাণকর মহান আদান প্রদানে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করে। যাহারা কর্ম্মে এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই ভোগ ও কর্ম্মের অনুসরণ করে তাহাদের জীবন বৃথা; তাহারা জীবনের এবং আত্মোন্নতির প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা ধরিতে পারে নাই। যে-পথে পরম শ্রেয়োলাভ করা যাইতে পারে তাহারা সে পথের পথিক নহে। কিন্তু পরম শ্রেয়ঃ তখনই লাভ করা যায় যখন আর শুধু দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ না করিয়া সেই সর্ব্বব্যাপী, যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরের উদ্দেশে করা হয় দেবগণ যাঁহার নিম্নতন রূপ ও শক্তি। পরম শ্রেয়োলাভ তখনই হয়, যখন মানুষ নিম্ন প্রকৃতির কামনা, বাসনা পরিত্যাগ করে, নিজে সমস্ত করিতেছে এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিকেই সকল কর্ম্মের প্রকৃত কর্ত্রী বলিয়া বুঝিতে পারে এবং নিজেকে সকল কার্য্যের

ভোক্তা বলিয়া মনে না করিয়া বিশ্বাত্মা পরম পুরুষকেই প্রকৃতির সকল কার্য্যের ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধি করে। নিজের ব্যক্তিগত ভোগে নহে, কিন্তু সেই পরমাত্মাতেই তখন সে তাহার একমাত্র তৃপ্তি, পূর্ণ সন্তোষ ও বিমল আনন্দ ভোগ করে; তখন কর্ম্ম বা কর্ম্মশূন্যতায় তাহার কোন লাভালাভ থাকে না, তখন সে কোন বস্তুর জন্য দেব বা মনুষ্য কাহারও মুখ চাহিয়া থাকে না, কাহারও নিকট কোন লাভের প্রত্যাশা করে না কারণ আত্মানন্দেই তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি, কিন্তু সে শুধু ভগবানের জন্যই যজ্ঞরূপে আসক্তিশূন্য ও কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করে। এইরূপে সে সমতা লাভ করে এবং প্রকৃতির গুণ হইতে মুক্তি লাভ করে, নিস্ত্রৈগুণ্য হয়; তাহার আত্মা প্রকৃতির অনিশ্চয়তার মধ্যে নহে, কিন্তু অক্ষর ব্রহ্মের শান্তিতেইপ্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও তখনও প্রকৃতির কর্ম্মধারার মধ্যে তাহার কর্ম্ম চলিতে থাকে। এইরূপে যজ্ঞই হয় তাহার পরম শ্রেয়লাভের পথ।

গীতায় পরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিলাম ইহাই ঠিক। পরে বলা হইয়াছে, "লোকসংগ্রহই" কর্ম্মের উদ্দেশ্য; একমাত্র প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, ভাগবত পুরুষ সকল কার্য্যেরই সমান ভর্ত্তা (upholder) এবং সকল কর্ম্ম কার্য্যকালেই তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে (এইরূপে ভিতরে কর্ম্মের অর্পণ এবং বাহিরে কর্ম্মের সম্পাদন, ইহাই যজ্ঞের পরিণতি), এইরূপে সমতার সহিত বাসনাশূন্য হইয়া যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ৪।২২, ২৩

যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট, কর্ম্মের সফলতা বা বিফলতায় যাহার সমভাব তিনি কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ হন না। যখন কোন আসক্তিহীন মুক্ত পুরুষ যজ্ঞের জন্য কর্ম্ম করেন তখন তাঁহার সমুদায় কর্ম্ম লয়প্রাপ্ত হয়", অর্থাৎ, তাঁহার মুক্ত, শুদ্ধ, সিদ্ধ এবং সমতাপ্রাপ্ত আত্মার উপর সে সকল কর্ম্মের পরিণামস্বরূপ বন্ধন রহিয়া যায় না বা কোন দাগ পড়ে না। পরে আবার আমরা এই সকল শ্লোকের আলোচনা করিব। ইহাদের পরেই যজ্ঞের যে বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যে-ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা হইতেই নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, এই সকল কথা রূপক-ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং গীতায় যে যজ্ঞের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা বাহ্যিক নহে, আন্তরিক। প্রাচীন বৈদিক প্রথায় সর্ব্বত্রই দুই প্রকায় অর্থ ছিল—শারীরিক এবং মনস্তত্ত্বমূলক, বাহ্যিক এবং রূপক, যজ্ঞের বাহ্যিক অনুষ্ঠান এবং তাহার সকল বিধানের গূঢ় অর্থ। কিন্তু প্রাচীন বৈদিকদের সেই গূঢ় কবিত্বময় রূপকের মর্ম্ম লোকে বহুদিনই ভুলিয়া গিয়াছিল এবং তাহার পরিবর্ত্তে গীতাতে বেদান্ত এবং পরবর্ত্তী যোগের শিক্ষা অনুসারে যজ্ঞের উদার দার্শনিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যজ্ঞের অগ্নি স্থূল (material) অগ্নি নহে, উহা ব্রহ্মাগ্নি। সংযমই অগ্নি, অথবা শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ক্রিয়াই অগ্নি, অথবা প্রাণায়ামের দ্বারা নিয়মিত প্রাণশক্তিই অগ্নি, অথবা আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অগ্নি। যজ্ঞের অবশিষ্ট যাহা ভক্ষণ করা হয় তাহাকে অমৃত বলা হইয়াছে—তাহা ভোজন করিলে অমরত্ব লাভ করা যায়, এখানে প্রাচীন বৈদিক রূপকের কিছু রহিয়াছে—

যজ্ঞের দ্বারা যে অমৃত অর্থাৎ অমৃতত্বপ্রদায়ী দিব্য আনন্দ লাভ করা যায়, দেবগণকে অর্পণ করা হয়, মানুষও পান করে, সোমরস ছিল সেই দিব্য আনন্দেরই স্থূল প্রতীক। মানুষ শরীর বা মনের দ্বারা যে কোন কর্ম্ম দেবতাদের বা ভগবানের উদ্দেশে করে, অথবা নিজের ঊর্দ্ধতম আত্মা অথবা মানবজাতি ও সর্ব্বভূতের আত্মার উদ্দেশে করে তাহাই হইতেছে অর্পণ।

যজ্ঞের এই বিশদ ব্যাখ্যার আরম্ভ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞের ক্রিয়া, যজ্ঞের সামগ্রী, যজ্ঞের কর্ত্তা, যজ্ঞের গৃহীতা, যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সবই সেই এক ব্রহ্ম।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ৪।২৪

"অর্পণ ব্রহ্ম, উৎসর্গের দ্রব্য ব্রহ্ম, ব্রহ্মের দ্বারাই ইহা ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পিত, ব্রহ্মকর্ম্মে সমাধির দ্বারা ব্রহ্মই লভ্য।" অতএব এই জ্ঞানেই মুক্ত পুরুষকে যজ্ঞকর্ম্ম করিতে হইবে। "সোঽহম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "এই আত্মাই ব্রহ্ম", এই সকল মহান বেদান্ত বাক্যে এই জ্ঞানই সূচিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞান; একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তাই কর্ম্মের কর্ত্তা, কর্ম্ম এবং কর্ম্মের লক্ষ্যরূপে আবির্ভূত, জ্ঞাতা জ্ঞান এবং জ্ঞেয়রূপে অভিব্যক্ত। যে বিশ্বশক্তিতে কর্ম্ম অর্পণ করা হয় তাহা ভগবান; অর্পণের ক্রিয়া ভগবান; যাহা অর্পণ করা হয় তাহা ভগবানেরই কোন বিশেষ রূপ; যিনি অর্পণ করেন তিনিও মানুষের ভিতরে ভগবান ভিন্ন আর কেহ নহেন; ক্রিয়া, কর্ম্ম, যজ্ঞ সবই গতিরূপে কর্ম্মরূপে ভগবান; যজ্ঞের দ্বারা যে লক্ষ্যে পৌঁছিতে

হইবে তাহাও ভগবান। যে মনুষ্য এই জ্ঞানের অধিকারী এবং এই জ্ঞানানুসারে জীবন যাপন করে, কর্ম্ম করে—কর্ম্ম তাহার পক্ষে কোন বন্ধনই নহে, তাহার ব্যক্তিগত, অহংভাবে কোন কৃত কর্ম্ম থাকিতে পারে না, শুধু ভাগবত পুরুষ তাঁহার নিজেরই সত্তায় ভাগবত প্রকৃতির দ্বারা কর্ম্ম করেন, তাঁহার আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বিশ্বশক্তিরূপ অগ্নিতে সমস্ত অর্পণ করেন। ভগবদ্‌মুখী এই সকল কর্ম্মের লক্ষ্য হইতেছে ভগবানের সহিত যুক্ত জীবের ভাগবত জ্ঞানলাভ, ভাগবত জীবন, ভাগবত চেতনা লাভ। ইহা জানা এবং এই ঐক্যসাধক চৈতন্যে জীবন যাপন করা, কর্ম্ম করাই মুক্ত হওয়া।

কিন্তু যোগিগণের মধ্যেও সকলেই এই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥ ৪।২৫

"অন্য যোগিগণ দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; অপর যোগিরা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞার্পণ করেন।" প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা ভগবানকে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন শক্তিতে কল্পনা করেন এবং বিভিন্ন সাধন, অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে চান; শেষোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে তাঁহারা যে কর্ম্মই করুন সে সব ভগবানে অর্পণ করা, ঐক্যমূলক ভাগবত চৈতন্য ও শক্তির মধ্যে তাঁহাদের সকল কর্ম্ম নিক্ষেপ করা—কেবল এই যজ্ঞই হয় তাঁহাদের একমাত্র সাধন, তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম্ম। যজ্ঞের সাধন বিবিধ, অর্পণ নানা প্রকারের। আত্মসংযমরূপ যে মনস্তত্ত্বমূলক যজ্ঞ তাহার দ্বারা উচ্চ আত্মজয় লাভ করা যায়।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ৪।২৬, ২৭

"কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন, অন্য কেহ কেহ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকলকে নিক্ষেপ করেন। অপরে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রদীপ্ত আত্মসংযম-যোগরূপ অগ্নিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম এবং প্রাণকর্ম্ম হোম করেন।" অর্থাৎ, এক রকমের সাধনা আছে যাহাতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ গ্রহণ করা হয় অথচ এই ইন্দ্রিয়ক্রিয়ায় মনকে বিচলিত হইতে দেওয়া হয় না, ইন্দ্রিয়গণই যজ্ঞের পবিত্র অগ্নিস্বরূপ হয়; আর এক রকম সাধনা আছে যাহাতে ইন্দ্রিয়-গণকে শান্ত করা হয় যেন মনের ক্রিয়ার অন্তরাল হইতে শান্ত স্থির আত্মা তাহার বিশুদ্ধতায় আবির্ভূত হয়; আর এক রকম সাধনা আছে —যখন আত্মাকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, এই সাধনার দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম এবং সমস্ত প্রাণকর্ম্ম সেই এক স্থির শান্ত আত্মার মধ্যে গৃহীত হয়। যাহারা সিদ্ধির জন্য যত্ন করিতেছেন, তাহাদের যজ্ঞ স্থূল দ্রব্য সম্পর্কে হইতে পারে, দ্রব্যযজ্ঞ—ভক্ত যখন নৈবেদ্যাদির দ্বারা দেবতার পূজা করে তখন এইরূপ দ্রব্যযজ্ঞই করিয়া থাকে; অথবা আত্মসংযমের কঠোর সাধনা এবং কোন উচ্চ উদ্দেশ্য সাধনে আত্মশক্তি নিয়োগ করাও এক রকম যজ্ঞ হইতে পারে, তপোযজ্ঞ; অথবা রাজযোগী এবং হঠযোগীদের প্রাণায়াম বা অন্য কোনরূপ যোগ যজ্ঞ হইতে পারে। এই সমস্তই আত্ম-শুদ্ধির সহায়ক; সকল যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ পদলাভের পন্থাস্বরূপ।

এই সকল বিভিন্নতার মধ্যে প্রধান জিনিষ যাহা মূল নীতিরূপে সকলগুলিরই ভিতরে রহিয়াছে তাহা এই—নিম্নস্তরের ক্রিয়াগুলিকে দমন করিতে হইবে, বাসনার আধিপত্য কমাইয়া উচ্চস্তরের শক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ত্যাগের দ্বারা, আত্মোৎসর্গের দ্বারা, আত্মজয়ের দ্বারা, নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চতর ও বৃহত্তর আদর্শ গ্রহণের দ্বারা যে দিব্যতর আনন্দ পাওয়া যায় তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।

যাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করেন তাঁহারা সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন। যজ্ঞই সংসারের নীতি। ইহকালে প্রভুত্ব, পরকালে স্বর্গ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ কিছুই যজ্ঞ ব্যতীত পাওয়া যায় না।

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৪।৩১, ৩২

যিনি যজ্ঞ করেন না, তাহার পক্ষে ইহলোকই নাই, পরলোক ত দূরের কথা। অতএব, এই সমস্ত যজ্ঞ এবং অন্যান্য অনেক প্রকার যজ্ঞ "বিততা ব্রহ্মণো মুখে", ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পিত হয় (Extended in the mouth of the Brahman, the mouth of that Fire which receives all offerings). এ সবই হইতেছে কর্ম্মে প্রবৃত্ত অদ্বিতীয় এক মহান সত্তার বিভিন্ন সাধন, বিভিন্ন রূপ, এই সব সাধনের দ্বারা মানুষের কর্ম্ম সেই পরম সত্তাকে অর্পণ করা যায়, মানুষের বাহ্য জীবন সেই সত্তার অংশ এবং তাহার অন্তরতম সত্তায় তাহার সহিত সে এক। এই সমস্ত যজ্ঞই কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন; ঈশ্বরের যে এক বিরাট শক্তি

বিশ্বব্যাপী কর্ম্মে আবির্ভূত—এবং সকল বিশ্বকর্ম্মকে পরমেশ্বরের উদ্দেশে অর্পণ করিতেছে— সকল যজ্ঞই তাহা হইতে উদ্ভূত এবং মানুষের পক্ষে ইহার শেষ পরিণতি হইতেছে আত্মজ্ঞান ও ভাগবত বা ব্রহ্মচৈতন্য প্রতিষ্ঠা। "এই প্রকার জানিয়া তুমি মুক্তিলাভ করিবে।"

কিন্তু এই সকল বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের বিভিন্ন স্তর আছে—দ্রব্য যজ্ঞ সর্ব্বনিম্ন স্তরের, জ্ঞানযজ্ঞ সর্ব্বোচ্চ স্তরের। জ্ঞানেই এই সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি—নিম্নস্তরের জ্ঞানে নহে, উচ্চতম জ্ঞানে, আত্মজ্ঞানে, ব্রহ্মজ্ঞানে। এই জ্ঞান আমরা তাঁহাদের নিকট হইতেই শিক্ষা করিতে পারি যাঁহারা সৃষ্টির মূলতত্ত্বসমূহ অবগত আছেন, তত্ত্বদর্শিনঃ। এই জ্ঞান লাভ করিলে আর আমরা মনের অজ্ঞানের মোহে পতিত হইব না এবং শুধু ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান এবং কামনা ও আবেগের বন্ধনে বদ্ধ হইব না। যে-জ্ঞানে সমস্ত পরিসমাপ্ত হয় সেই জ্ঞানের দ্বারা "তুমি সমস্ত ভূতকেই আত্মার মধ্যে এবং পরে আমার মধ্যে দেখিতে পাইবে।" কারণ আত্মা হইতেছে সেই এক, অক্ষর, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাধার, স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা, আমাদের মানস সত্তার পশ্চাতে লুক্কায়িত ব্রহ্ম, আমাদের চেতনা যখন অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয়, তখন বিস্তৃত হইয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়; আমরা সকলকেই সেই এক সত্তার মধ্যে বিভিন্ন ভূতরূপে দেখিতে পাই।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৪।৩৩
তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৪।৩৪

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৪।৩৫

কিন্তু এই যে আত্মা বা অক্ষর ব্রহ্ম, ইহাও আমাদের মানসিক চেতনার সম্মুখে এক শ্রেষ্ঠ পুরুষেরই আত্ম-অভিব্যক্তি; তিনিই আমাদের অস্তিত্বের মূল এবং যাহা কিছু ক্ষর বা অক্ষর আছে সে সব তাঁহারই অভিব্যক্তি। তিনিই ঈশ্বর, ভগবান, পুরুষোত্তম। তাঁহাকেই আমরা যজ্ঞরূপে সমস্ত অর্পন করি; তাঁহার হস্তেই আমাদের কর্ম্ম সমর্পণ করি; তাঁহারই সত্তায় আমরা জীবন ধারণ করি, চলা ফেরা করি। আমাদের প্রকৃতিতে তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া এবং তাঁহাতে অবস্থিত সর্ব্বভূতের সহিত যুক্ত হইয়া আমরা তাঁহার সহিত এবং সর্ব্বভূতের সহিত আত্মসত্তায় ও শক্তিতে এক হই; তাঁহার পরমতম সত্তার সহিত আমরা আমাদের আত্মসত্তাকে এক করি, যুক্ত করি। বাসনা বর্জ্জন করিয়া, যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিয়া, আমরা জ্ঞানলাভ করি এবং আত্মা নিজেকে ফিরিয়া পায়; আত্মজ্ঞানের সহিত, ভগবদ্ জ্ঞানের সহিত, কর্ম্ম করিয়া আমরা ভাগবত সত্তার ঐক্য, শান্তি ও আনন্দের মধ্যে মুক্তি লাভ করি।

যজ্ঞের অধীশ্বর

আর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে এতদূর পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার মূল তত্ত্বগুলি পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক। গীতার সমগ্র কর্ম্মবাদ যজ্ঞতত্ত্বেরই উপর প্রতিষ্ঠিত; বাস্তবিক, ভগবান জগৎ এবং কর্ম্মের মধ্যে শাশ্বত সম্বন্ধের যে-সত্য, গীতার কর্ম্মবাদের মধ্যে তাহাই গৃহীত হইয়াছে। মানুষের মন সাধারণতঃ জগৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে বহুমুখী সনাতন সত্যের আংশিক ভাবসকল গ্রহণ করিয়া জীবন, ধর্ম্ম এবং নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি করে—কখনও একটি লক্ষণ বা উপলব্ধির উপরে কখনও আর একটির উপরেই বিশেষ ঝোঁক দেয়; কিন্তু যখনই কোন উদার জাগৃতির যুগে ঈশ্বর জগৎ এবং আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানের সমন্বয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে তখনই সত্যের কতকটা সমগ্র অখণ্ড স্বরূপের দিকে মানুষের ঝোঁক হয়। সংসারে যাহা কিছু আছে সবই সেই এক ব্রহ্ম, সমগ্র জগৎ ব্রহ্মেরই চক্র—ভগবান হইতে বাহির হইয়া ভগবানেই ফিরিয়া যাওয়া রূপ ভগবৎ লীলা—এই মূল বৈদান্তিক সত্যের উপরই গীতার শিক্ষার ভিত্তি। সমস্তই প্রকৃতির প্রকটন লীলা এবং প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি—প্রকৃতি তাহার কর্ম্মের প্রভু এবং তাহার রূপ-সকলের অধিবাসী ভাগবত পুরুষের ইচ্ছা সম্পাদন করিতেছে। তাঁহারই তৃপ্তির নিমিত্ত প্রকৃতি নাম রূপের লীলায় এবং প্রাণ ও মনের কর্ম্মে অবতীর্ণ হইতেছে, আবার মন ও আত্মজ্ঞানের ভিতর দিয়া তাহার মধ্যে যে-পুরুষ বাস করিতেছে তাহাকে সজ্ঞানে লাভ করিতে ফিরিয়া

যাইতেছে। প্রথমে আত্মা বদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, প্রকৃতির লীলার বিকাশ হইতেছে, পরে আত্মা আবার স্বরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই যে প্রকৃতির চক্র ইহা কখনও সম্ভব হইত না যদি পুরুষ তাঁহার শাশ্বত তিনটি অবস্থায় একই সময়ে থাকিতে না পারিতেন; সমগ্র ক্রিয়াটির জন্য তিনটিই অপরিহার্য্য। ক্ষর রূপে তাঁহাকে আবির্ভূত হইতেই হয়, এবং এইখানে আমরা তাঁহাকে সসীম, বহু, "সর্ব্বভূতানি" রূপে দেখিতে পাই। সংসারে যে অসংখ্য-বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট অসংখ্য জীব রহিয়াছে, তাহাদের সসীম ব্যক্তিত্বরূপে এবং তাহাদের পশ্চাতে জাগতিক ক্রিয়ার অধিষ্ঠাতা যে সকল দেবতা রহিয়াছেন তাঁহাদেরও ক্রিয়ার আত্মা ও শক্তিরূপে তিনি প্রকট হন। আবার সকল বস্তু ও রূপের অন্তরে ও পশ্চাতে গুপ্তভাবে রহিয়াছে এক অক্ষর, এক অনন্ত, কালাতীত, নির্ব্যক্তিক সত্তা, জগতের এক অপরিবর্ত্তনশীল অখণ্ড আত্মা—সেখানে সকল বহু নিজেদিগকে বস্তুতঃ এক বলিয়াই দেখিতে পায়। অতএব সেইখানে ফিরিয়া জীবের সসীম সক্রিয় সত্তা দেখিতে পায় যে, সে নিজেকে এক বিশ্বব্যাপী নীরবতার মধ্যে, এই অখণ্ড অনন্ত হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হইয়াছে, যাহা কিছু ইহা দ্বারা বিধৃত রহিয়াছে সেই সবের সহিত এক অক্ষর ও অনাসক্ত ঐক্যের শান্তি ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে, নিজেকে মুক্ত করিয়া দিতে পারে। এমন কি ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত সত্তার লয়ও করিয়া দিতে পারে। কিন্তু, শ্রেষ্ঠ রহস্য, উত্তমম্ রহস্যম্ হইতেছে পুরুষোত্তম। ইনিই শ্রেষ্ঠ দেব, ভগবান—তাঁহার ভিতর সান্ত ও অনন্ত দুইই রহিয়াছে, তাঁহাতে ব্যক্তিক এবং নির্ব্যক্তিক, এক আত্মা এবং সর্ব্বভূত, জাগতিক ক্রিয়া এবং বিশ্বাতীত শান্তি, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি

সবই মিলিয়াছে, একত্র হইয়াছে, এক সঙ্গে এবং পরস্পরের মধ্যেই স্থান পাইয়াছে। ভগবানের মধ্যেই সকল বস্তুর নিগূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে এবং তাঁহার মধ্যেই সকলের পূর্ণতম সামঞ্জস্য হইয়াছে।

কর্ম্মের সত্য সত্তার সত্যের উপরেই নির্ভর করে। সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা বস্তুতঃ প্রকৃতির দ্বারা পুরুষের উদ্দেশে কর্ম্মযজ্ঞ। জীবনের যজ্ঞবেদীমূলে প্রকৃতি তাহার সকল কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফল লইয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে চৈতন্য ভগবানের যে-ভাবটিতে উপনীত হইয়াছে তাহারই সম্মুখে সে সব ধরিয়া দিতেছে, জাগ্রত আত্মা নিজের উপস্থিত কল্যাণ বা পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া যে-ফল কামনা করে তাহারই জন্য ঐ সব যজ্ঞরূপে অর্পিত হয়। প্রকৃতিতে আত্মা চৈতন্যের যে-স্তরে উঠিয়াছে তদনুযায়ী দেবতারই সে পূজা করিবে, তদনুযায়ী আনন্দের সন্ধান করিবে এবং তদনুরূপ ফল কামনা করিয়া যজ্ঞ করিবে। আর প্রকৃতিতে ক্ষর পুরুষের যে লীলা তাহা সমস্তই আদান প্রদান; কারণ জগৎ এক এবং ইহার বিভিন্ন বিভাগগুলি পরস্পর পরস্পরের উপরই নির্ভর করিতেছে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাহায্যে বাড়িয়া উঠিতেছে, বাঁচিয়া রহিয়াছে—এই আদানপ্রদানের নীতির উপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত। যেখানে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ নাই, প্রকৃতি সেখানে জোর করিয়া তাহা আদায় করে এবং এইরূপে তাহার জাগতিক নীতি রক্ষা করে। পরস্পর দেওয়া এবং লওয়া ইহাই জীবনের নীতি, ইহা ভিন্ন জীবন এক মুহূর্ত্তও টিকিতে পারে না; এই সত্যই জগতে ভগবৎ ইচ্ছার নিদর্শন—যজ্ঞকে চিরসাথী করিয়া ভগবান যে প্রজা সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহাই সে-বিষয়ে প্রমাণ। বিশ্বব্যাপী এই যে যজ্ঞের নীতি—ইহা

৩

হইতেই বুঝা যায় যে, জগৎ ভগবানেরই এবং সংসার তাঁহারই রাজ্য, তাঁহারই পূজার মন্দির, স্বতন্ত্র অহংয়ের ক্ষেত্র নহে। জীবনের উদ্দেশ্য অহংয়ের তৃপ্তিসাধন নহে, ইহা কেবল স্থূল অজ্ঞান আরম্ভ মাত্র; যজ্ঞকে সর্ব্বদা প্রসারিত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া ভগবানের সন্ধান, অনন্তের পূজা ও উপাসনা, পূর্ণতম আত্ম-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত পূর্ণতম আত্মদান —এই চরম লক্ষ্যের দিকেই জীবনের সকল অভিজ্ঞতা মানুষকে লইয়া যাইতে চায়।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীব অজ্ঞান লইয়াই আরম্ভ করে এবং বহুদিন অজ্ঞানেই থাকে। অহঙ্কারে একান্ত নিবিষ্ট মানুষ মনে করে যে, সংসার অহংয়েরই জন্য, ভগবানের জন্য নহে। সে নিজেকেই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া দেখে, সে বুঝে না যে, সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহার নিজেরও ভিতর ও বাহিরের সকল কর্ম্মই এক বিশ্ব প্রকৃতির ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। সে নিজেকে সকল কর্ম্মের ভোক্তা বলিয়া দেখে এবং ভাবে যে, তাহার জন্যই সব, প্রকৃতির কাজ তাহাকেই তৃপ্ত করা, তাহারই ব্যক্তিগত ইচ্ছা পালন করা। সে দেখিতে পায় না যে, প্রকৃতি তাহাকে তৃপ্ত করিতে, তাহার ইচ্ছা পালন করিতে মোটেই ব্যস্ত নহে, পরন্তু এক উচ্চতর বিশ্বগত ইচ্ছার অনুসরণ করে, যে-ভগবান প্রকৃতির এবং প্রকৃতির কার্য্যের ও সৃষ্টির অতীত সেই ভগবানকেই তৃপ্ত করিতে চায়; ব্যক্তির সসীম সত্তা, তাহার ইচ্ছা এবং তাহার তৃপ্তি—এ সকল তাহার নিজের নহে, এ সকলই প্রকৃতির; প্রকৃতি এই সকলকে প্রতি মুহূর্ত্তে ভগবানের নিকট যজ্ঞরূপে অর্পণ করে এবং অলক্ষ্যে এই সবকে ভগবদিচ্ছা পূরণের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে।

জীব এই সম্বন্ধে অজ্ঞান এবং অহংভাবই এই অজ্ঞানতার চিহ্ন; এই অজ্ঞানের বশে জীব যজ্ঞের নীতি অগ্রাহ্য করে, যতটা পারে নিজেই গ্রহণ করিতে চায়, এবং শুধু ততটুকুই দেয় যতটুকু প্রকৃতি ভিতরে এবং বাহিরে জোর করিয়া আদায় করিয়া লয়। বাস্তবিক প্রকৃতি জীবের প্রাপ্য অংশ, দেবতাদত্ত ভোগ বলিয়া জীবকে যতটুকু লইতে দেয় তাহার অধিক জীব কিছুই লইতে পারে না। এই যজ্ঞের জগতে যে স্বার্থপর ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ দেবশক্তি সমূহের শুধু দান গ্রহণ করে কিন্তু প্রতিদানে কিছু ফিরাইয়া দিতে চাহে না সে চোর ডাকাতেরই অনুরূপ। সে জীবনের প্রকৃত মর্ম্মের সন্ধান পায় নাই, কারণ সে যজ্ঞার্থে জীবন-যাপন ও কর্ম্মের দ্বারা আত্মার প্রসার ও উন্নতি সাধন করে না, তাহার জীবন ব্যর্থ।

মানুষ যেমন নিজের শক্তির এবং নিজের অভাব অভিযোগের কদর করে তেমনই যখন অপরের সন্বন্ধেও করিতে আরম্ভ করে, মানুষ যখন তাহার স্বকর্ম্মের পশ্চাতে বিশ্ব-প্রকৃতিকে উপলব্ধি করিতে এবং বিশ্ব-দেবসমূহের ভিতর দিয়া সেই এক এবং অনন্তের সন্ধান পাইতে আরম্ভ করে—শুধু তখনই সে অহংভাবের বন্ধন অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভের এবং আত্মার সন্ধান লাভের পথে পথিক হয়। সে তখন তাহার বাসনা ও কামনারও উপরে যে নীতি আছে তাহার সন্ধান পাইতে আরম্ভ করে এবং উপলব্ধি করে যে, তাহার সমস্ত বাসনা ও কামনাকে ক্রমশঃ ঐ নীতির বশ ও অধীন করিতে হইবে। সে সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর জীবন ছাড়াইয়া বুদ্ধিমূলক ও নৈতিক জীবনের বিকাশ করে। সে নিজের ব্যক্তিগত দাবি অপেক্ষা অপরের দাবির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়;

সে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার বিরোধ স্বীকার করে এবং তাহার পরার্থপর বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিয়া তাহার নিজের চৈতন্য ও সত্তার প্রসারণের পথ পরিষ্কার করে। সে প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির মধ্যে যে সকল দেবতা রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে, বুঝিতে পারে যে, ইহারা তাহার ভক্তি ও পূজার পাত্র—ইহাদিগকে মান্য করিতে হইবে, ইহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে হইবে, কারণ তাঁহাদের দ্বারা এবং তাঁহাদের নিয়মের দ্বারা মানসিক জগৎ এবং জড়জগৎ উভয়ই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; সে শিখে যে, তাহার চিন্তায় এবং বুদ্ধিতে এবং জীবনে সেই শক্তিসমূহের আবির্ভাব ও মহত্ত্ব যত অধিক হইবে কেবল ততখানিই সে নিজে তাহাদের প্রদত্ত যথাযথ কর্ম্ম ও ভোগ সকলে বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপে সে জীবনকে শুধু জড়বুদ্ধিতে ও অহংবুদ্ধিতে না দেখিয়া ধর্ম্মভাবে, আধ্যাত্মিকভাবে দেখে এবং এইরূপে সসীমের ভিতর দিয়া অসীমের মধ্যে উঠিতে নিজেকে প্রস্তুত করিরা তোলে।

কিন্তু ইহা একটি দীর্ঘ মধ্যবর্ত্তী অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখানেও বাসনাই তাহার কর্ম্মের নীতি, তাহার অহংয়ের প্রয়োজনই কেন্দ্রস্বরূপ এবং প্রকৃতিই তাহার জীবন ও কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে; যদিও এখানে বাসনা সংযত নিয়ন্ত্রিত, অহং শুদ্ধ, এখানে প্রকৃতি উচ্চ সত্ত্বভাবাপন্ন। এই সমস্তই এখনও ক্ষর, সসীম, ব্যক্তিক গণ্ডীর মধ্যে—তবে এই গণ্ডী খুবই প্রসারিত। প্রকৃত আত্মজ্ঞান, অতএব কর্ম্মেরও প্রকৃত নীতি এই অবস্থারও উর্দ্ধে; কারণ জ্ঞানের সহিত যে-যজ্ঞ করা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ এবং তাহাতেই কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। এই

অবস্থা কেবল তখনই আইসে যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, তাহার নিজের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে এবং অপরের মধ্যে যে আত্মা তাহা একই, এই আত্মা অহং অপেক্ষা বড় জিনিষ, ইহা অনন্ত, নির্ব্যক্তিক, বিশ্বব্যাপী সত্তা, ইহার ভিতরেই সর্ব্বভূত বিরাজ করিতেছে; যে সকল বিশ্ব-দেবতাদের উদ্দেশে সে যজ্ঞ করে সে সকল সেই এক অনন্ত ভগবানের বিভিন্ন রূপ বলিয়া সে বুঝিতে পারে এবং সেই এক ভগবান সম্বন্ধে তাহার সমস্ত সঙ্কীর্ণ ধারণা পরিত্যাগ করিয়া উপলব্ধি করে যে, তিনিই শ্রেষ্ঠ অনির্ব্বচনীয় পরমেশ্বর—তিনি একই সঙ্গে সসীম এবং অসীম, এক এবং বহু, প্রকৃতির অতীত হইয়াও প্রকৃতির মধ্যেই ব্যক্ত, গুণাতীত হইয়াও তিনি অনন্ত গুণের ভিতর দিয়া তাঁহার লীলা বিকাশ করেন। ইনিই পুরুষোত্তম, ইহাকেই যজ্ঞ অর্পণ করিতে হইবে—কোন অনিত্য ব্যক্তিগত কর্ম্মফলের জন্য নহে, পরন্তু ভগবানকে লাভ করিবার জন্য, ভগবানের সহিত যোগে ও সামঞ্জস্যে জীবন যাপন করিবার জন্য।

অন্য কথায় বলিতে গেলে ক্রমবর্দ্ধমান নির্ব্যক্তিক ভাবের ভিতর দিয়াই মানুষের মুক্তি ও সিদ্ধির পথ। ইহাই মানুষের প্রাচীন ও নিরন্তর অভিজ্ঞতা যে, নির্ব্যক্তিক ও অনন্ত সত্তার দিকে,—যাহা সকল বস্তু, সকল জীবের মধ্যেই এক এবং সাধারণ, শুদ্ধ ও সমুচ্চ সত্তা, যাহা প্রকৃতির মধ্যে নির্ব্যক্তিক ও অনন্ত, জীবনের মধ্যে নির্ব্যক্তিক ও অনন্ত, তাহার নিজেরই অন্তর্লোকে নির্ব্যক্তিক ও অনন্ত, তাহার দিকে সে নিজেকে যতই উন্মুক্ত করিয়া ধরে, ততই তাহার অহংয়ের বন্ধন, সীমার বন্ধন কমিয়া যায়, ততই সে বিশালতা, শান্তি ও বিশুদ্ধ সুখের

অনুভূতি লাভ করে। শুধু সীমার মধ্যে, "অহং"এর মধ্যে যে-আনন্দ, যে-তৃপ্তি তাহা ক্ষণিক, ক্ষুদ্র এবং অনিশ্চিত। যাহারা সম্পূর্ণভাবে অহংভাবের মধ্যে বাস করে এবং "অহং"এর সসীম ধারণা, শক্তি, তৃপ্তি লইয়াই থাকে তাহাদের পক্ষে এই জগৎ সর্ব্বদা অনিত্যম্ অসুখম্—অস্থায়ী এবং দুঃখময়। সসীম জীবনের চির দুঃখ এই যে সকল সময়েই একটা নিরর্থকতার ভাব থাকিয়া যায় কারণ সসীমই জীবনের সমগ্র বা শ্রেষ্ঠ সত্য নহে। জীবন যতক্ষণ না অসীমের দিকে উন্মুক্ত হইতেছে ততক্ষণ তাহা সম্পূর্ণভাবে সত্য বা বাস্তব নহে। এই জন্যই গীতা কর্ম্মবাদ ব্যাখ্যা করিবার প্রারম্ভেই ব্রহ্মচৈতন্যের উপর, নির্ব্যক্তিক জীবনের উপর এত ঝোঁক দিয়াছে এবং এইটিই ছিল প্রাচীনদের সাধনার মহান লক্ষ্য। কারণ যে নির্ব্যক্তিক অনন্ত একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তায় জগতের সকল স্থায়ী, সচল, বহুমুখী কর্ম্মধারা নিজের উর্দ্ধে স্থায়িত্ব, আশ্রয় ও শান্তির ভিত্তি পায়, সেইটিই হইতেছে অচল আত্মা, অক্ষর, ব্রহ্ম। যদি আমরা ইহা বুঝি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, আমাদের চৈতন্যকে, আমাদের সত্তার প্রতিষ্ঠাকে, সীমাবদ্ধ ব্যক্তিকতা হইতে এই অনন্ত ও নির্ব্যক্তিক ব্রহ্মের মধ্যে তুলিতে হইবে—ইহাই আধ্যাত্মিক জীবনের সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। এই এক আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতকে দেখা, এই জ্ঞানই মানুষকে অহংভাবের অজ্ঞান হইতে এবং ইহার কর্ম্মফল হইতে তুলিয়া লয়; ইহাতে বাস করাই পরম শান্তি এবং আধ্যাত্মিক জীবনের দৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ।

কিরূপে এই মহান্ রূপান্তর সাধিত হয় তাহার দুইটা পথ আছে, জ্ঞানের পথ এবং কর্ম্মের পথ; গীতা এই দুইয়ের সংহত সমন্বয়

করিয়াছে। মন এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ায় বুদ্ধির (intelligent will) যে নিম্নমুখী আসক্তি তাহা হইতে বুদ্ধিকে ফিরাইয়া উর্দ্ধমুখী করিতে হইবে—পুরুষের দিকে, ব্রহ্মের দিকে ফিরাইতে হইবে ; ইহাই জ্ঞানের পথ। মনের বহুমুখী ধারণাসমূহ এবং বাসনার বহুমুখী প্রেরণা সকল পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিকে এক ব্রহ্মের এক ভাবে বাস করাইতে হইবে। শুধু এইটুকু দেখিলে মনে হয় বুঝি সম্পূর্ণ কর্ম্মত্যাগ, নিশ্চল নিষ্ক্রিয়তা এবং পুরুষকে প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করাই এই পথের লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরূপ সম্পূর্ণ ত্যাগ, নিষ্ক্রিয়তা এবং বিচ্ছিন্নতা সম্ভব নহে। পুরুষ ও প্রকৃতি সৃষ্টির যুগল তত্ত্ব—তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, যতক্ষণ আমরা প্রকৃতির মধ্যে আছি, প্রকৃতির মধ্যে আমাদের কর্ম্ম চলিতেই থাকিবে—তবে অজ্ঞানীরা যে ভাবে কর্ম্ম করে, জ্ঞানীদের কর্ম্মের রূপ বা অর্থ তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে। সন্ন্যাস করিতেই হইবে—তবে কর্ম্ম হইতে পলায়ন করা প্রকৃত সন্ন্যাস নহে, অহং ও বাসনাকে বধ করাই প্রকৃত সন্ন্যাস। ইহা কি উপায়ে হইতে পারে ? কর্ম্ম করিবার সময়েও কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে, প্রকৃতিকেই সর্ব্বকর্ম্মের প্রকৃত কর্ত্রী বলিয়া জানিতে হইবে, এবং প্রকৃতিকেই তাহার কর্ম্ম করিতে ছাড়িয়া দিতে হইবে, দ্রষ্টা এবং ভর্ত্তারূপে আত্মাতে বাস করিয়া প্রকৃতিকে দেখিতে হইবে, ধরিয়া থাকিতে হইবে, কিন্তু প্রকৃতির কর্ম্মে বা কর্ম্মফলে আসক্ত হওয়া চলিবে না। তখন সীমাবদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিকতা, অহং, শান্ত হয়, নির্ব্যক্তিক আত্মার চৈতন্যে মগ্ন হয়—অন্যদিকে আমাদের দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতের ভিতর দিয়া প্রকৃতির কর্ম্ম চলিতে থাকে—তখন আমারা এই

সকলকে দেখি যে, ইহারা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সেই এক অনন্ত সত্তার মধ্যেই বাস করিতেছে, চলাফেরা করিতেছে; আমাদের সসীম জীবনকেও ইহাদেরই মধ্যে একটি বলিয়া বুঝিতে পারি এবং উপলব্ধি করি যে, আমাদেরও সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃতিরই—আমাদের প্রকৃত আত্মার নহে; সে আত্মা হইতেছে নিশ্চল নির্ব্যক্তিক ঐক্য। অহং এই সকলকে নিজের বলিয়া দাবী করিত, আমরা তাই সেগুলিকে আমাদেরই মনে করিতাম; কিন্তু অহং যখন মরিল, তখন আর সেগুলি আমাদের নহে, প্রকৃতির। অহংকে বধ করিয়া আমরা আমাদের সত্তায় ও চৈতন্যে নির্ব্যক্তিক হইয়া উঠিয়াছি; বাসনাকে ত্যাগ করিয়া আমাদের প্রকৃতির কর্ম্মেও আমরা নির্ব্যক্তিক হইয়া উঠিয়াছি। এখন শুধু কর্ম্মশূন্যতার মধ্যেই নহে, কর্ম্মের মধ্যেও আমরা মুক্ত; শারীরিক ও প্রাকৃতিক নিশ্চলতা ও শূন্যতার উপর আমাদের মুক্তি নির্ভর করে না, আর যেই আমরা কর্ম্ম করি অমনিই মুক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ি না। এমন কি প্রাকৃতিক কর্ম্মের পূর্ণ স্রোতের মধ্যেও নির্ব্যক্তিক আত্মা আমাদের মধ্যে ধীর, স্থির, মুক্ত থাকে।

এই পূর্ণ নির্ব্যক্তিকতা দ্বারা যে মুক্তিলাভ করা যায় তাহা প্রকৃত, তাহা সম্পূর্ণ, তাহা অপরিহার্য্য, কিন্তু ইহাই কি সব, ইহাই কি এই বিষয়ে শেষ কথা? আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সমস্ত জীবন সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি কর্ত্তৃক পুরুষের নিকট যজ্ঞরূপে অর্পিত; এই পুরুষই প্রকৃতির মধ্যে এক অদ্বিতীয় এবং নিগূঢ় আত্মা, ইহারই মধ্যে প্রকৃতির সকল কর্ম্ম চলিতেছে; কিন্তু ইহার প্রকৃত মর্ম্ম আমাদের নিকট আচ্ছন্ন রহিয়াছে অহং-এর দ্বারা, কামনার দ্বারা, আমাদের সীমাবদ্ধ, সক্রিয়, বহুমুখী ব্যক্তিত্বের দ্বারা।

আমরা অহংভাব ও কামনা ও সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বের মধ্য হইতে উঠিয়াছি, এবং ইহার মহান প্রতিষেধক নির্ব্যক্তিকতার দ্বারা নির্ব্যক্তিক ভাগবত সত্তার সন্ধান পাইয়াছি ; যে এক আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে সর্ব্বভূত রহিয়াছে তাহার সহিত আমাদের একত্ব আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। কর্ম্মের যজ্ঞ চলিতেছে, কিন্তু আমরা চালাইতেছি না—আমাদের মন ইন্দ্রিয় ও শরীরের ভিতর দিয়া প্রকৃতি এই ক্রিয়া চালাইতেছে, কিন্তু এই সমস্ত চলিতেছে আমাদেরই অনন্ত সত্তার মধ্যে। তবে কাহাকে কোন উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ অর্পণ করা হইতেছে? এই নির্ব্যক্তিক সত্তার ত কোন কর্ম্ম নাই, কোন বাসনা নাই, লাভ করিবার কোন বস্তু নাই, কোন কিছুর জন্যই ইহা সংসারের কোন জীবের উপর নির্ভর করে না ; নিজের জন্যই ইহা আছে নিজেরই আত্মানন্দে, নিজের অক্ষর অনন্ত সত্তার মধ্যে ইহা বিরাজিত। এই নির্ব্যক্তিক আত্ম-প্রতিষ্ঠায় পৌঁছিবার উপায় স্বরূপ আমাদিগকে বাসনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইতে পারে কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পন্ন হইয়া যায় ; যজ্ঞের আর প্রয়োজন থাকে না। তখনও কর্ম্ম চলিতে পারে কারণ প্রকৃতির ক্রিয়া চলিতে থাকে ; কিন্তু তখন আর এই সকল কর্ম্মের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তখন কর্ম্ম না করিলে নয়, সেইজন্যই কর্ম্ম করিতে হয় ; আমাদের সসীম শরীর ও মনকে বাধ্য করিয়া প্রকৃতি কর্ম্ম করায়। কিন্তু ইহাই যদি সব হয় তাহা হইলে কর্ম্মকে যতদূর সম্ভব কমাইলেই হইল, প্রকৃতি আমাদের শরীরের দ্বারা যতটুকু নিশ্চয় করাইয়া লইবে কেবলমাত্র ততটুকু কর্ম্ম হইলেই হইল ; দ্বিতীয়তঃ, যদি কর্ম্মকে যতদূর সম্ভব কমান নাই হয়,—কারণ কর্ম্ম করিলে কিছু আসিয়া যায় না, কর্ম্ম না করাও

উদ্দেশ্য নহে—তাহা হইলেও কর্ম্ম কি প্রকারের হইবে তাহাতেও কিছু আসিয়া যায় না। একবার জ্ঞানলাভ করিবার পর অর্জ্জুন তাহার পুরাতন ক্ষত্রিয় স্বভাবের অনুসরণ করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্পন্ন করিতে পারেন অথবা তাঁহার শান্তির দিকে নূতন ঝোঁকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতে পারেন। ইহাদের মধ্যে কোনটি তিনি করিবেন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; বরং দ্বিতীয়টিই উত্তম, কারণ অতীত সংস্কারের জন্য প্রকৃতির যে-সকল প্রবৃত্তি এখনও তাহাকে ধরিয়া আছে সেগুলিকে দমন করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়; যখন তাঁহার শরীর পতিত হইবে তখন তিনি নিশ্চিতভাবে সেই অনন্ত ও নির্ব্যক্তিক সত্তায় প্রয়াণ করিতে পারিবেন; অনিত্যম্ অসুখম্ ইমম্ লোকম্—এই অনিত্য দুঃখময় সংসারের দুঃখ ও উন্মত্ততার মধ্যে আর তাঁহাকে ফিরিতে হইবে না।

যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে গীতার সমস্ত শিক্ষাই অর্থশূন্য হয়; কারণ ইহার যাহা প্রথম ও মূল উদ্দেশ্য তাহাই ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু গীতা বিশেষ করিয়া বলিয়াছে যে, কর্ম্ম কি প্রকারের হইল তাহা প্রয়োজনীয়, এবং কর্ম্ম চালাইবারও স্পষ্ট নির্দ্দেশ গীতাতে আছে, শুধু প্রকৃতির লক্ষ্যহীন তাড়নাতেই যে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা নহে। অহং জয় হইবার পরও যজ্ঞের একজন ভোক্তা ঈশ্বর থাকেন—ভোক্তারম্ যজ্ঞ-তপসাম্, এবং তখনও যজ্ঞের একটা উদ্দেশ্য থাকে। নির্ব্যক্তিক ব্রহ্মই একেবারে শেষ কথা নহে, আমাদের জীবনের একেবারে শ্রেষ্ঠ রহস্যও নহে; কারণ নির্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিক, সসীম ও অসীম, একই ভগবানের দুইটি বিপরীত দিক মাত্র,—দুইটি একই সময়ে ভগবানের

মধ্যে রহিয়াছে এবং ভগবান এই সকল পার্থক্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি একই সময়ে এই দুইই। ভগবান চির অব্যক্ত অনন্ত—সর্ব্বদা তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সান্তের ভিতর নিজেকে ব্যক্ত করিতেছেন; তিনি সেই মহান নির্ব্যক্তিক ব্যক্তি—সকল ব্যক্তি, সকল রূপ যাঁহার আংশিক প্রকাশ মাত্র; তিনি সেই ভগবান যিনি মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনি মানুষের হৃদয়স্থিত ঈশ্বর। এক নির্ব্যক্তিক (impersonal) আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতকে দেখাই জ্ঞানের শিক্ষা, কারণ এই ভাবেই আমরা ভেদাত্মক অহংভাব হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং তাহার পর সেই মুক্তিসাধক নির্ব্যক্তিকতার ভিতর দিয়া সে-সকলকে ভগবানের মধ্যে দেখিতে পারি—আত্মনি অথো ময়ি, "আত্মার মধ্যে, পরে আমার মধ্যে।" ভগবান সকলের মধ্যে রহিয়াছেন এবং সকলেই ভগবানের মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু আমাদের অহং, আমাদের সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব আড়াল করিয়া দাঁড়ায় বলিয়া আমরা ভগবানকে 'চিনিতে পারি না; কারণ আমরা ব্যক্তিক ভাবের বশীভূত বলিয়া বস্তুসমূহের সসীম দৃশ্যের ভিতর দিয়া যতটুকু সম্ভব কেবল ততটুকুই ভগবানের আংশিক ভাবসকল দেখিয়া থাকি। ভগবানকে পাইতে হইলে আমাদের নিম্নতর ব্যক্তিকতার ভিতর দিয়া তাহা সম্ভব নহে; আমাদের সত্তার উচ্চ, অসীম, নির্ব্যক্তিক অংশের ভিতর দিয়াই তাহা সম্ভব এবং তাহার জন্য সকলের ভিতর এই যে এক আত্মা (যাহার মধ্যে বিশ্ব সংসার রহিয়াছে) সেই আত্মার সহিত আমাদিগকে এক হইতে হইবে। এই যে অসীম সত্তা, যাহার ভিতরেই সব সসীম দৃশ্যও রহিয়াছে, এই যে নামরূপের অতীত নির্ব্যক্তিক সত্তা যাহার

ভিতর সকল ব্যক্তি, সকল নামরূপও রহিয়াছে, এই যে অচল সত্তা প্রকৃতির সকল সচল ক্রিয়াকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে-সব হইতে সরিয়া দাঁড়ায় নাই, এই নির্ম্মল দর্পণেই ভগবানের সত্তা প্রতিভাত হইবে। অতএব আমাদিগকে প্রথমে নির্ব্যক্তিক সত্তাকেই লাভ করিতে হইবে ; কেবল বিশ্বদেবগণের ভিতর দিয়া, কেবল সসীমের দিক দিয়া ভগবানের পূর্ণজ্ঞান সমগ্রভাবে লাভ করা যায় না। কিন্তু অন্যপক্ষে নির্ব্যক্তিক আত্মার দ্বারা যাহা কিছু বিধৃত ও ব্যাপ্ত রহিয়াছে সে-সব হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া পরিকল্পিত এই নির্ব্যক্তিক আত্মার যে নীরব নিশ্চলতা সেইটিও ভগবানের সর্ব্ব-প্রকাশক, সর্ব্বসংশয়-নিরসনকারী সমগ্র সত্য নহে। সেই সত্য দর্শন করিতে হইলে ইহার নীরবতার ভিতর দিয়া পুরুষোত্তমকে দেখিতে হইবে ; তিনি তাঁহার দিব্য মহিমায় দুইকেই ধরিয়া রহিয়াছেন, তিনি অক্ষরের অচলতায় প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তিনি বিশ্বপ্রকৃতির সকল গতি, সকল ক্রিয়ার মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করিতেছেন ; তাঁহারই উদ্দেশে মুক্তির পরেও প্রকৃতির কর্ম্ম যজ্ঞরূপে অর্পিত হইতে থাকে।

ভগবান পুরুষোত্তমের সহিত জীবন্ত মিলন এবং তাহার দ্বারা আত্মার পূর্ণ বিকাশ—ইহাই যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য, শুধু নির্ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে আত্ম-নির্ব্বাণ নহে। আমাদের সমস্ত জীবনকে ভগবানের মধ্যে তুলিতে হইবে, তাঁহাতে বাস করিতে হইবে (ময্যেব নিবসিষ্যসি), তাঁহার সহিত এক হইতে হইবে, তাঁহার চৈতন্যের সহিত আমাদের চৈতন্য মিলাইতে হইবে, আমাদের অংশিক প্রকৃতিকে তাঁহার পূর্ণ প্রকৃতির প্রতিবিম্ব স্বরূপ করিতে হইবে, প্রাণে মনে আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে ভাগবত জ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, সঙ্কল্পে ও কর্ম্মে আমাদিগকে

সম্পূর্ণভাবে, নির্দ্দোষভাবে ভাগবত ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইতে হইবে, তাঁহার প্রেমানন্দে বাসনা কামনা ভুলিতে হইবে—ইহাই মানব জীবনের সিদ্ধিলাভ, গীতা ইহাকেই উত্তম রহস্য বলিয়াছে। ইহাই মানবের প্রকৃত লক্ষ্য এবং চরম সার্থকতা—ইহাই আমাদের ক্রমবিকাশমান কর্ম্মযজ্ঞের সর্ব্বোচ্চ সোপান। কারণ শেষ পর্য্যন্ত তিনিই থাকেন কর্ম্মের অধীশ্বর এবং যজ্ঞের প্রাণ স্বরূপ।

দিব্য কর্ম্মের নীতি

অতএব গীতাবর্ণিত যজ্ঞের ইহাই প্রকৃত মর্ম্ম। ইহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে হইলে পুরুষোত্তম তত্ত্ব বুঝা দরকার, গীতায় এ পর্য্যন্ত এ তত্ত্ব বুঝান হয় নাই—গীতার বাকী অধ্যায় সকলের শেষের দিকেই এই তত্ত্ব পরিষ্কার করিয়া বুঝান হইয়াছে, এবং সেই জন্যই গীতার ক্রমশঃ-প্রকাশমান পদ্ধতির বিরুদ্ধাচার করিয়াও আমাদিগকে এখনই সেই মূল শিক্ষার অবতারণা করিতে হইয়াছে। উপস্থিত গুরু কেবল পুরুষোত্তম সম্বন্ধে সঙ্কেত মাত্র করিয়াছেন এবং নিশ্চল আত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নির্দ্দেশ মাত্র করিয়াছেন। আমাদের প্রথম কাজ, আমাদের জরুরী আধ্যাত্মিক প্রয়োজন হইতেছে ব্রাহ্মীস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই নিশ্চল আত্মায় সম্পূর্ণ শান্তি ও সমতার অবস্থা লাভ করা। এখন পর্য্যন্ত তিনি স্পষ্ট ভাষায় পুরুষোত্তমের উল্লেখ করেন নাই; "আমি", কৃষ্ণ, নারায়ণ, অবতার, কুরুক্ষেত্রে দিব্য সারথীরূপে অবতীর্ণ বিশ্বের অধীশ্বর—এই ভাবেই নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সূত্র দিয়াছেন, আত্মনি অথো ময়ি, "আত্মার মধ্যে, তাহার পর আমার মধ্যে", ইহার অর্থ এই যে, ব্যষ্টিগত ব্যক্তিক সত্তাকে নির্ব্যক্তিক স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তাতেই একটি "বিবর্ত্তন" (becoming) বলিয়া দেখিয়া ব্যক্তিক ভাব অতিক্রম করা হইতেছে সেই মহান্

নিগূঢ় নির্ব্যক্তিক ব্যক্তিতে (পুরুষোত্তমে) উপনীত হইবার পন্থা মাত্র, তিনি নির্ব্যক্তিক সত্তায় নীরব, শান্ত, প্রকৃতির ঊর্দ্ধে অবস্থিত আবার প্রকৃতিতে এই লক্ষ লক্ষ ভূতের মধ্যে বর্ত্তমান এবং কর্ম্মশীল। আমাদের নিম্নতন ব্যষ্টিগত ব্যক্তিক সত্তাকে নির্ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে লয় করিয়া শেষকালে আমরা সেই পরম পুরুষের সহিত যুক্ত হইব যিনি স্বতন্ত্র ও ব্যষ্টিগত নহেন, অথচ সকল ব্যষ্টিগত রূপ ধারণ করিয়াছেন। ত্রিগুণাত্মিকা অপরা প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া এবং ত্রিগুণের অতীত নিশ্চল পুরুষে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা অবশেষে অনন্ত ভগবানের পরা প্রকৃতিতে উঠিতে পারি, তিনি প্রকৃতির ভিতর দিয়া কার্য্য করিলেও গুণত্রয়ের দ্বারা বদ্ধ হন না। নীরব নিশ্চল পুরুষের ভিতরের নৈষ্কর্ম্ম্য (inner actionlessness) প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রকৃতিকে তাহার কর্ম্ম করিতে ছাড়িয়া দিয়া আমরা সেই পরম উচ্চ দিব্য প্রভুত্বের পদ লাভ করিতে পারি যখন সকল কর্ম্ম করিয়াও কোন কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হইতে হয় না। অতএব, অবতীর্ণ নারায়ণরূপে, কৃষ্ণরূপে এখানে দৃষ্ট পুরুষোত্তমের তত্ত্বই হইতেছে মূল সূত্র। ইহা ব্যতীত অপরা প্রকৃতি হইতে সরিয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিলে মুক্তপুরুষের নিষ্ক্রিয়তা এবং সংসারের কর্ম্মের প্রতি তাঁহার উদাসীনতা অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু পুরুষোত্তমকে ধরিতে পারিলে ঐরূপ নিবৃত্তি একটি ধাপ স্বরূপ হয়, তাহার দ্বারা সংসারের কর্ম্ম আত্মার মধ্যে গৃহীত হয়, দিব্য প্রকৃতির ভিতর দিয়া দিব্য মুক্তিতে সম্পাদিত হয়। নিশ্চল নীরব ব্রহ্মকেই যদি লক্ষ্য বলিয়া দেখ, তাহা হইলে সংসার এবং সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে; ভগবানকে, পুরুষোত্তমকে যদি লক্ষ্য বলিয়া

দেখ, যদি তাঁহাকে কর্ম্মের উপরে অথচ ইহার আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক কারণ এবং উদ্দেশ্য এবং মূল সঙ্কল্প বলিয়া বুঝ, তাহা হইলে সংসার এবং সংসারের সকল কর্ম্ম বিজিত হইবে, ভগবানের ন্যায়ই সংসারের উর্দ্ধে থাকিয়া সে-সব পরিচালন করা যাইবে। সংসার কারাগার না হইয়া, সমৃদ্ধিশালী রাজ্য, রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্ হইতে পারে; দুর্দ্দান্ত "আমি"র সীমাবদ্ধতাকে ধ্বংস করিয়া, আমাদের বন্ধনের কারণ কামনাসকলকে জয় করিয়া, আমাদের ব্যক্তিগত ভোগ ঐশ্বর্য্যের কারাগার ভগ্ন করিয়া আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এই রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্ জয় করিব। মুক্ত বিশ্বভাবাপন্ন জীব তখন স্বরাট, সম্রাট হইবে।

এইরূপে মুক্তি এবং পূর্ণতম সংসিদ্ধি লাভের উপায় স্বরূপ যজ্ঞার্থে কর্ম্মের সার্থকতা দেখান হইল। এইরূপে সম্পূর্ণভাবে অহংভাব এবং আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কামনা-শূন্য হইয়া, জয় পরাজয় লাভালাভকে সমান জ্ঞান করিয়া যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিয়া জনক প্রভৃতি মহৎ কর্ম্ম-যোগীগণ পুরাকালে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।

এইরূপেই এবং এইরূপ কামনাশূন্যভাবেই, মুক্তি এবং সিদ্ধি লাভের পরও কর্ম্ম করা যায় এবং করিতে হইবে—তখন সে কর্ম্ম করা হইবে উদার ভাগবতভাবে, আধ্যাত্মিক ঐশ্বরিকতার শান্ত উচ্চ প্রকৃতিতে।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥
যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ৩।২০—২২

"লোকসংগ্রহার্থেও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, নিম্নতর শ্রেণীর লোকও তাহাই করিয়া থাকে; শ্রেষ্ঠগণ কর্ম্মের যে আদর্শ সৃষ্টি করেন, জনগণ তাহারই অনুসরণ করে। হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও কর্ত্তব্য নাই, এমন কোন পদার্থ নাই যাহা আমি পাই নাই এবং যাহা আমাকে অতঃপর লাভ করিতে হইবে; তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়াই থাকি।" বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি—এখানে "এব" শব্দের দ্বারা বুঝা যায় যে, ভগবান কর্ম্ম করিয়াই থাকেন এবং সন্ন্যাসীরা যে মনে করেন তাঁহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, তিনি সেরূপ করেন না। কারণ,

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্‌বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন॥ ৩।২৩—২৬

"যদি আমি আলস্যপরিশূন্য হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকি, মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমার পন্থা অনুসরণ করিবে, আমি যদি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই সকল লোক বিনষ্ট হইবে এবং আমি উচ্ছৃঙ্খলতার স্রষ্টা হইব, এইরূপে আমি প্রজাগণকে নষ্ট করিব। অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্ম্মে আসক্তির সহিত যেমন কর্ম্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের লোকসংগ্রহার্থে,

অনাসক্ত হইয়া সেইরূপ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। যে অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্ম্মে আসক্ত, জ্ঞানী তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। তিনি জ্ঞানের সহিত এবং যোগস্থ হইয়া স্বয়ং সকল কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞদিগকে সেই সব কর্ম্ম করাইবেন।" এই সাতটি শ্লোক অপেক্ষা মূল্যবান শ্লোক গীতাতে আর খুব কমই আছে।

কিন্তু আমাদের স্পষ্ট বুঝা দরকার যে, এই শ্লোকগুলিকে আধুনিক কর্ম্মপ্রবণ নীতি অনুসারে ব্যাখ্যা করা চলিবে না; এই নীতি কোন উচ্চ ও দূর আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা অপেক্ষা বর্ত্তমান জাগতিক কার্য্যাবলী লইয়াই অত্যধিক ব্যস্ত। সমাজসেবা, দেশসেবা, মানব জাতির কল্যাণ সাধন এবং যে শত শত সামাজিক পরিকল্পনা ও স্বপ্ন আধুনিক মনকে আকৃষ্ট করিতেছে, এই শ্লোকগুলিকে কেবল মাত্র সেই সকলের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি বলিয়া বুঝিলে চলিবে না। এখানে উদার পরোপকারের কোন যুক্তিযুক্ত নৈতিক নিয়ম কথিত হয় নাই; ভগবানের সহিত এবং যে জাগতিক জীবসমূহ ভগবানের মধ্যে বাস করিতেছে এবং যাহাদের মধ্যে ভগবান বাস করিতেছেন তাহাদের সহিত আধ্যাত্মিক ঐক্যের কথাই এখানে কথিত হইয়াছে। ব্যক্তিকে সমাজের এবং মানব জাতির অধীন করিবার, সমষ্টিগত মানবের বেদিতে অহংভাবকে বলি দিবার উপদেশ এখানে দেওয়া হয় নাই; ভগবানের মধ্যে ব্যক্তিত্বকে সার্থক করিয়া তুলিবার, সর্ব্বব্যাপী ভাগবত সত্তার সত্য বেদীতে অহংকে বলি দিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে সকল ভাব ও অভিজ্ঞতা লইয়া আধুনিক মানব ব্যস্ত, গীতার শিক্ষা তাহা অপেক্ষা উচ্চ স্তরের; মানুষ এখন অহংভাবের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত

হইবার চেষ্টা করিতেছে বটে, তথাপি তাহার দৃষ্টি ঐহিকতার দিকে, তাহার মতিগতি আধ্যাত্মিক নহে পরন্তু যৌক্তিক ও নৈতিক। দেশ-প্রেম, বিশ্বপ্রেম, সমাজ-সেবা, সমষ্টিবাদ, মানব-ধর্ম্ম,—এই সকল আদর্শ যে আমাদের ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত, জাতিগত আদিম স্বার্থপরতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অপরের জীবনের সহিত নিজের জীবনের ঐক্য উপলব্ধি করিবার প্রকৃষ্ট উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ঐক্য উপলব্ধি হইতেছে বুদ্ধি ও চিত্তাবেগের স্তরে, নৈতিক স্তরে—এখানে এই উপলব্ধি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আদিম স্বার্থপরতার পর ইহা দ্বিতীয় অবস্থা। কিন্তু গীতা আমাদের বিকাশমান আত্মচৈতন্যের আরও এক উচ্চতর তৃতীয় অবস্থার কথা বলিয়াছে, দ্বিতীয় অবস্থাটি কেবল সেই উচ্চতর অবস্থায় উঠিবার আংশিক ধাপ মাত্র।

ভারতবর্ষে সমাজনীতি ব্যক্তিকে সমাজের অধীন করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু সকল সময়েই ভারতের ধর্ম্মচিন্তা ও অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিকে বড় করা। গীতার ন্যায় ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র যে ব্যক্তির বিকাশকেই প্রথম স্থান দিবে ইহা অবশ্যম্ভাবী ; ব্যক্তির যাহা উচ্চতম প্রয়োজন, তাহার উদারতম অধ্যাত্ম মুক্তি, মহত্ত্ব, দীপ্তি, রাজশ্রী আবিষ্কার ও ভোগ করিবার অধিকার,—ঋষিত্ব ও রাজশ্রীর যাহা অধ্যাত্ম অর্থ সেই অর্থে ঋষি ও রাজা হইয়া উঠাকেই জীবনের লক্ষ্য করা,—আদর্শ মানবত্বের এই প্রথম মহান সনন্দ প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ কর্ত্তৃকই প্রচারিত হইয়াছিল। ব্যক্তিকে তাহার নিজের উপরে উঠিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহাদের আদর্শ, তবে সঙ্ঘবদ্ধ মানব সমাজের মধ্যে

ব্যক্তিত্বের সকল দাবী হারাইয়া নহে. পরন্তু নিজেকে বড় করিয়া, উচ্চ করিয়া, বিস্তৃত করিয়া ভাগবত চৈতন্য লাভই তাঁহাদের আদর্শ ছিল। গীতা এখানে যে অতিমানব, শ্রেষ্ঠমানব, দিব্যভাবাপন্ন মানবের কথা বলিয়াছে তাহা নীট্‌শে কথিত অতিমানবের ধারণা হইতে বিভিন্ন। কোন এক বিশেষ গুণের, বিশেষ শক্তির আত্যন্তিক বিকাশ, মানুষের কোন আংশিক ভাবের আতিশয্য লাভই গীতার লক্ষ্য নহে, গীতার অতিমানব অসুর বা দানব নহে। এক সর্ব্বাতীত বিশ্বগত ভাগবত পুরুষের সত্তা প্রকৃতি ও চৈতন্যের মধ্যে মানবের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে সমর্পণ করিয়া ক্ষুদ্র "আমিকে" হারাইয়া বৃহত্তর "আমিকে" পাইয়া যে ভাগবত অবস্থা লাভ করা যায় গীতায় তাহারই নীতি বর্ণিত হইয়াছে।

নীচের অপূর্ণ প্রকৃতি হইতে, ত্রিগুণময়ী মায়া হইতে নিজেকে তুলিয়া ভগবানের সাযুজ্য, সালোক্য এবং সাদৃশ্য (বা সাধর্ম্ম্য)* লাভ করা, মদ্ভাবমাগতাঃ, ইহাই যোগের উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, যখন মানব ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়া নিজেকে ও জগৎকে আর মিথ্যা অহং ভাবের দৃষ্টি লইয়া দেখে না পরন্তু সর্ব্বভূতকে আত্মার মধ্যে, ভগবানের মধ্যে দেখে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মাকে, ভগবানকে দেখে, তখনও যে কর্ম্ম হয়, সে কর্ম্মের স্বরূপ কি এবং সে কর্ম্ম কি বিশ্বগত বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য লইয়া করা হয়? অর্জ্জুন এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন—

কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্। স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তি কিরূপ কহেন? কিরূপ থাকেন? কিরূপে চলেন? —ভগবান এই

---

* জীবনের ও কর্ম্মের নীতিতে ভগবানের সহিত এক হওয়াই সাধর্ম্ম্য।

প্রশ্নের উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু অর্জ্জুন যে দিক হইতে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন উত্তরটা ঠিক সেই দিক দিয়া হইল না। মানসিক বুদ্ধি, হৃদয় আবেগ ও নৈতিকতার স্তরে যে ব্যক্তিগত কামনা বা বাসনা তাহা কখনও এরূপ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইতে পারে না; কারণ সে বাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছে—এমন কি নৈতিক প্রেরণাও পরিত্যক্ত হইবে কারণ যিনি মুক্ত ব্যক্তি তিনি পাপ পুণ্যের নিম্নতর ভেদ অতিক্রম করেন এবং শুভ ও অশুভের উপরে দিব্য পবিত্রতার মধ্যে বাস করেন। পূর্ণ আত্মবিকাশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করিবার যে আধ্যাত্মিক আহ্বান তাহার বশেও এ অবস্থায় কর্ম্ম হইবে না, কারণ সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া হইয়া গিয়াছে, আত্মবিকাশ সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। শুধু লোক-সংগ্রহের জন্যই এ অবস্থায় কর্ম্ম হইতে পারে, চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্। মানব মণ্ডলী দূর ভাগবত আদর্শের দিকে যে মহান্ যাত্রা করিয়াছে তাহা অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে, বুদ্ধির সংশয় ও গোলমাল হইতে সকলকে রক্ষা করিতে হইবে। অজ্ঞান আঁধারের ভিতর দিয়া মানুষকে চলিতে হইতেছে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরণের আদর্শ তাহাদের সম্মুখে না থাকিলে সহজেই তাহারা ধ্বংসমুখে পতিত হইতে পারে। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, যে সকল ব্যক্তি সাধারণ অপেক্ষা অগ্রগামী এবং সাধারণের স্তরের উপরে তাঁহারা স্বভাবতঃই মানুষের নেতা, কারণ তাঁহারাই মানুষকে দেখাইতে পারেন যে, কোন আদর্শ মানব জাতিকে অনুসরণ করিতে হইবে, কোন পথে তাহাদিগকে চলিতে হইবে। কিন্তু ভাগবতভাবাপন্ন ব্যক্তি সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ নহেন, তাঁহার প্রভাবের,

তাঁহার দৃষ্টান্তের এমন শক্তি থাকিবেই যাহা সাধারণ শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের থাকিতে পারে না। তাহা হইলে তিনি কি দৃষ্টান্ত দেখাইবেন? তিনি কোন নীতি বা আদর্শ সকলের সম্মুখে ধরিবেন?

তাঁহার বক্তব্য আরও সম্পূর্ণভবে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত দিব্য গুরু, অবতার, নিজের দৃষ্টান্ত, নিজের আদর্শ অর্জ্জুনের সম্মুখে ধরিলেন। তিনি যেন বলিলেন—"আমি কর্ম্মপথে রহিয়াছি, এই পথ সকল মনুষ্যই অনুসরণ করে; তোমাকেও কর্ম্ম করিতে হইবে। আমি যেরূপে কর্ম্ম করি, তোমাকেও সেইরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে। আমি কর্ম্মের আবশ্যকতার ঊর্দ্ধে, কারণ কর্ম্মের দ্বারা আমার লাভ করিবার কিছুই নাই; আমি ভগবান, সংসারের সকল বস্তু, সকল জীবই আমার, আমি নিজে সংসারের অতীতও বটি, সংসারের মধ্যেও বটি, কোন কিছুর জন্য ত্রিভুবনে আমি কাহারও নিকট কোন ভরসা করি না; তথাপি আমি কর্ম্ম করি। এই ভাবেই, এই আদর্শেই তোমাকেও কর্ম্ম করিতে হইবে। আমি ভগবান, আমিই বিধি, আমিই আদর্শ; মানুষ যে পথে চলে তাহা আমিই প্রস্তুত করি; আমিই পথ, আমিই লক্ষ্যস্থল। কিন্তু আমি এই সকল বিশালভাবে, উদারভাবে করি—আংশিকভাবে দৃশ্যতঃ করি, কিন্তু বেশীর ভাগ অদৃশ্য ভাবেই করি; মানুষ আমার কর্ম্মধারা বাস্তবিকই বুঝে না। তুমি যখন সব জানিবে, দেখিবে, তুমি যখন দিব্য মানব হইবে—তখন তুমি ভগবানের ব্যষ্টিগত শক্তি হইবে, মানুষ হইয়াও ভাগবত আদর্শ,—যেমন অবতাররূপে আমি। বেশীর ভাগ লোকই অজ্ঞানের মধ্যে বাস করে, ভগবৎদ্রষ্টা জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন; কিন্তু তিনি যেন বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোকের মধ্যে সংশয় আনয়ন না করেন, উপরে উঠিয়াছেন

বলিয়া সংসারের কর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তিনি যেন অকালে কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করিয়া না দেন, ক্রমোন্নতির আমি যে সকল স্তর ও ধাপ নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তিনি যেন তাহা গোলমাল করিয়া না দেন। মানুষ কেমন করিয়া অপরা প্রকৃতি হইতে পরা প্রকৃতিতে উঠিতে পারিবে, ভাগবত চৈতন্য লাভ করিতে পারিবে, তাহার হিসাব করিয়াই আমি সমস্ত মানবীয় কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছি। ভাগবত-জ্ঞানীকে সমস্ত মানবীয় কর্ম্মের মধ্যেই থাকিতে হইবে। সমস্ত ব্যক্তিগত কার্য্য, সামাজিক কার্য্য, বুদ্ধি, হৃদয়, দেহের সমস্ত কার্য্যই তাঁহার থাকিবে—তবে, তাহা আর স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার নিজের জন্য নহে, পরন্তু যে ভগবান জগতের মধ্যে রহিয়াছেন, সর্ব্বভূতের মধ্যে রহিয়াছেন তাঁহারই জন্য—তিনি যেমন কর্ম্মের পথ অনুসরণ করিয়া নিজের মধ্যে ভগবানকে পাইয়াছেন, সেইমত সকলেই যাহাতে পায় সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে সকল কর্ম্ম করিতে হইবে। বাহ্যতঃ তাঁহার কর্ম্মের সহিত অপরের কর্ম্মের হয়ত বিশেষ কোন তফাৎই থাকিবে না; যেমন শিক্ষা দান ও জ্ঞান চর্চ্চা তেমনই যুদ্ধ ও রাজ্যশাসন, মানুষের সহিত মানুষের যত বিচিত্র আদান-প্রদান সবই তাঁহাকে করিতে হইতে পারে; কিন্তু যে মনোভাবের সহিত তিনি এই সকল করিবেন তাহা হইবে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাঁহার ভিতরের এই ভাবই মানবগণকে তাঁহার নিজের উচ্চতর স্তরে টানিয়া লইবার মহতী শক্তি হইবে, জনমণ্ডলীকে তাহাদের ঊর্দ্ধমুখী পথে তুলিয়া দিবার মহান উত্তোলন-দণ্ড স্বরূপ হইবে।

ভগবান এখানে মুক্ত পুরুষকে যে নিজের দৃষ্টান্ত দিলেন ইহার অর্থ অতি গভীর, কারণ ইহার দ্বারা গীতার দিব্য কর্ম্মবাদের সমগ্র ভিত্তিটি

প্রকাশিত হইয়াছে। যিনি নিজেকে দিব্য প্রকৃতির মধ্যে উন্নীত করিয়াছেন তিনিই মুক্ত; এতাদৃশ মানবের কর্ম্ম সেই দিব্য প্রকৃতি অনুসারেই হইবে, কিন্তু, দিব্য প্রকৃতি কি? ইহা কেবল নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্যক্তিক আত্মার, অক্ষরের প্রকৃতিই নহে; কারণ তাহা হইলে মুক্ত মানবকে নিশ্চল নিষ্ক্রিয় হইতে হইত। অন্যদিকে আবার ক্ষর, বহু, ব্যক্তিক যে-পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির অধীন করিয়া দিয়াছে স্বরূপতঃ তাহার প্রকৃতিও নহে, কারণ শুধু এইরূপ প্রকৃতি মানুষকে নামরূপের অধীনে, অপরা প্রকৃতি এবং তাহার গুণত্রয়ের অধীনে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। পুরুষোত্তমের প্রকৃতিই দিব্য প্রকৃতি, তিনি দুইটিকেই এক সঙ্গে ধরিয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহার পরম ভাগবত সত্তায় তাহাদের দিব্য সমন্বয় করিয়াছেন, ইহাই হইতেছে তাঁহার সত্তার শ্রেষ্ঠ রহস্য, রহস্যম হ্যেতদ্ উত্তমম্। প্রকৃতিতে বদ্ধ আমরা যেরূপ ব্যক্তিগত ভাবে কর্ম্ম করি তিনি সেরূপভাবে কর্ম্ম করেন না; কারণ ভগবান তাঁহার শক্তি, মায়া, প্রকৃতির ভিতর দিয়া কার্য্য করেন, কিন্তু তথাপি তিনি ইহার উর্দ্ধেই থাকেন, ইহার দ্বারা বদ্ধ নহেন, ইহার অধীন নহেন; এই প্রকৃতি কর্ম্মের যে নিয়ম ধারা এবং সংস্কারের সৃষ্টি করে তিনি নিজেকে তাহাদের উপরে তুলিতে অক্ষম নহেন, তাহাদের দ্বারা বিচলিত বা বদ্ধ নহেন, আমরা যেরূপ প্রাণ মন দেহের কর্ম্ম হইতে নিজেদিগকে পৃথক করিতে অক্ষম, তিনি সেরূপ অক্ষম নহেন। তিনি কর্ত্তা হইয়াও কর্ম্ম করেন না, কর্ত্তারম্ অকর্ত্তারম্।

তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্। ৪।১৩

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা। ৪।১৪

"আমাকে ইহার (চাতুর্ব্বর্ণ্যের) কর্ত্তা বলিয়া অথচ অব্যয় অকর্ত্তা বলিয়াই জানিও। কর্ম্মসকল আমাতে লিপ্ত হয় না; কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই।" কিন্তু আবার তিনি নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল, অক্ষম সাক্ষী মাত্রও নহেন; কারণ তাঁহার শক্তির ক্রিয়ায় তিনিই কর্ম্ম করেন; ইহার প্রত্যেক গতি, এই শক্তি কর্ত্তৃক সৃষ্ট জীব জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণু তাঁহারই সত্তায় অনুপ্রাণিত, তাঁহারই চৈতন্যে পূর্ণ, তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত, তাঁহারই জ্ঞানে গঠিত।

তা ছাড়া তিনি সেই পরমপুরুষ যিনি গুণশূন্য হইয়াও সকল গুণের অধিকারী, নির্গুণো গুণী।* প্রকৃতির কোন গুণ বা কর্ম্মের দ্বারা তিনি বদ্ধ নহেন, আমাদের ব্যক্তিত্বের মত তিনি প্রকৃতির গুণ সমূহের সমষ্টি মাত্র নহেন, দেহ, প্রাণ, মন, হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়াসমূহের সমষ্টি মাত্র নহেন, কিন্তু তিনিই সকল গুণ কর্ম্মের মূল, যেটিকে যেমনভাবে হউক তাঁহার ইচ্ছামত বিকাশ করিতে তিনি সক্ষম; তিনি অনন্ত সত্তা, উহারা তাঁহার বিবর্ত্তনের বিভিন্ন ধারা, তিনি অপরিমেয়, অনন্ত, অনির্ব্বচনীয় বস্তু,— উহারা তাঁহার সান্ত রূপ, বিশ্বের ছন্দে ও সংখ্যায় তাঁহাকেই প্রকাশ করিতেছে। অথচ তিনি শুধুই একটি নির্ব্যক্তিক অনির্দ্দেশ্য সত্তা নহেন, কেবল চৈতন্যময় জীবনের এমন উপাদান মাত্র নহেন যাহা হইতে সকল নাম ও রূপ নিজেদিগকে গড়িয়া তোলে পরন্তু তিনি পরমপুরুষ, একমাত্র আদি স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যময় সত্তা, তিনি পূর্ণতম ব্যক্তি—সকল সম্বন্ধ, মনুষ্যোচিত নিবিড় স্থূল ব্যক্তিগত সম্বন্ধও তাঁহাতে সম্ভব; তিনি বন্ধু, সখা, প্রণয়ী, খেলার সাথী, পথ-প্রদর্শক গুরু, প্রভু, জ্ঞানদাতা, আনন্দদাতা, অথচ সকল

* উপনিষদ্

সম্বন্ধের মধ্যেও মুক্ত, স্বাধীন, কৈবল্যাত্মক সত্তা। মানুষ ভাগবত প্রকৃতি লাভে যতখানি সক্ষম হয়, ততখানি সেও এইরূপ হয়—ব্যক্তি হইয়াও ব্যক্তিত্বের উপর উঠিতে পারে, মানুষের সহিত নিবিড়তম ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রাখিয়াও গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না, এ ধর্ম্ম বা ও ধর্ম্ম অনুসরণ করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক কোন ধর্ম্মের দ্বারাই বদ্ধ থাকে না। কর্ম্মপ্রবণ মনুষ্যের কর্ম্মচাঞ্চল্য অথবা শান্ত সন্ন্যাসীর নিষ্ক্রিয় জ্ঞান, কর্ম্মহীনতা, কর্ম্মীর উদ্দাম ব্যক্তিত্ব অথবা দার্শনিক পণ্ডিতের উদাসীন নির্ব্যক্তিকতা—কোনটাই সম্পূর্ণ ভাগবত আদর্শ নহে। সংসারী মানব এবং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বা শান্ত দার্শনিক এই দুইটি বিরোধী আদর্শ ; একজন ক্ষরের কর্ম্মে মগ্ন, আর একজন অক্ষরের শান্তির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বাস করিবার জন্য যত্নবান ; কিন্তু পূর্ণ ভাগবত আদর্শ আইসে পুরুষোত্তমের প্রকৃতি হইতে, তাহা এই বিরোধের উর্দ্ধে এবং তাঁহার মধ্যে সকল দিব্য সম্ভাবনারই সমন্বয় হইয়াছে।

বিশ্ব প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ, সেই প্রকৃতির তিনগুণের এই খেলা, মন, হৃদয় ও দেহের এই মানবীয় ক্রিয়া, এই সকলের উপর যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত নহে সাধারণ কর্ম্মশীল মানব সেরূপ আদর্শে তৃপ্তি পায় না। সে বলে যে, ঐ ক্রিয়ার চরম পরিণতিতেই আমার মানবত্বের পূর্ণ বিকাশ ; মানুষের দিব্য সম্ভাবনা বলিতে আমি ইহাই বুঝি, মানুষ শুধু সেই আদর্শেই সন্তুষ্ট যে আদর্শ আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের হৃদয়কে, আমাদের নৈতিক বোধকে তৃপ্ত করিতে পারে, আমাদের মানবীয় প্রকৃতিকে কর্ম্মে ব্রতী করিতে পারে ; দেহ, মন, প্রাণের কর্ম্মের মধ্যে যাহা পাওয়া যাইতে পারে মানুষ তাহাই চায়। কারণ তাহাই তাহার

প্রকৃতি, তাহার ধর্ম্ম,—তাহার প্রকৃতির বাহিরের কিছুতে কেমন করিয়া সে সার্থকতা লাভ করিবে? কারণ প্রত্যেক জীব তাহার প্রকৃতিতে বদ্ধ এবং তাহারই মধ্যে তাহাকে পূর্ণতা খুঁজিতে হইবে। আমাদের মানবীয় প্রকৃতি যেমন, আমাদের মানবীয় পূর্ণতাও তদনুরূপই হইবে; প্রত্যেক মনুষ্য নিজের ব্যক্তিত্ব অনুসারে, স্বধর্ম্মানুসারেই ইহার জন্য চেষ্টা করিবে—কিন্তু জীবন এবং কর্ম্মের মধ্যে, তাহাদের বাহিরে নহে। গীতা বলে হাঁ, এই কথার মধ্যেও সত্য রহিয়াছে; মানুষের মধ্যে ভগবানের স্ফুরণ, জীবনের মধ্যে ভাগবত লীলা, ইহা আদর্শ পূর্ণতারই অংশ। কিন্তু যদি শুধুই বাহিরে, জীবনের মধ্যে, কর্ম্মের নীতির মধ্যে ইহার সন্ধান কর তাহা হইলে ইহাকে কখনই পাইবে না; কারণ তখন তুমি যে নিজের প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম করিবে (এটা পূর্ণতারই নীতি) শুধু তাহাই নহে, কিন্তু তুমি চিরকাল প্রকৃতির গুণের অধীন, রাগদ্বেষের দ্বন্দের অধীন, সুখ দুঃখের অধীন, বিশেষতঃ কামনাময় ক্রোধশোকসঙ্কুল রজোগুণের অধীন হইবে (ইহা অপূর্ণতার নীতি), এই সর্ব্বগ্রাসী চির-অতৃপ্ত কামনা তোমার সাংসারিক কর্ম্মকে ঘিরিয়া ধরিবে।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩।৩৭—৩৯

এই কাম জ্ঞানের চিরশত্রু, ইহার দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। ধূম যেমন অগ্নিকে এবং মল যেমন দর্পণকে আচ্ছাদিত করে, আর জরায়ু যেমন গর্ভকে আবৃত করিয়া রাখে, তেমনি কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। যদি তুমি আত্মার শান্ত, নির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময় সত্যের মধ্যে বাস করিতে চাও তাহা হইলে এই কামকে বধ করিতেই হইবে। ইন্দ্রিয়গণ মন ও বুদ্ধি সিদ্ধির এই চির শত্রু কামের অধিষ্ঠান ভূমি, আশ্রয়, অথচ শুধু এই ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির মধ্যে, অপরা প্রকৃতির খেলার মধ্যেই সিদ্ধির সন্ধান করিবে? এ চেষ্টা বৃথা। তোমার কর্ম্মপ্রবণ প্রকৃতিকে প্রথমে শান্তির সন্ধান করিতে হইবে; এই নীচের প্রকৃতি হইতে উঠিয়া ত্রিগুণের উপরে যে পরা অধ্যাত্ম প্রকৃতি তাহাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যখন তুমি আত্মার শান্তি লাভ করিবে কেবল তখনই তুমি মুক্ত দিব্য কর্ম্মের অধিকারী হইবে।

অন্যদিকে শান্তিপ্রবণ সন্ন্যাসীগণ সিদ্ধাবস্থায় সংসার ও কর্ম্মের কোন স্থান দেখিতে পান না। এইগুলিই কি বন্ধন এবং অসিদ্ধির মূল নহে? ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই কি দোষযুক্ত নহে? কর্ম্মের নীতিই কি রাজসিক নহে? এই রজোগুণ হইতেই কামের উদ্ভব, কাম জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, জয় পরাজয়, সুখদুঃখ, পাপপুণ্যের দ্বন্দ্বে মানুষকে অস্থির করিয়া তুলে। সংসারের মধ্যে ভগবান থাকিতে পারেন, কিন্তু তিনি সংসারের নহেন, তিনি ত্যাগের ভগবান, আমাদের কর্ম্মের অধীশ্বর বা কারণ নহেন; বাসনা বা কামই আমাদের কর্ম্মের অধীশ্বর এবং অজ্ঞানই আমাদের কর্ম্মের কারণ। ক্ষরকে, জগতকে যদিও এক ভাবে

ভগবানের প্রকাশ বা লীলা বলা যায়, ইহা প্রকৃতির অজ্ঞানের সহিত অপূর্ণ লীলা, ইহা ভগবানকে প্রকাশ করা অপেক্ষা তাঁহাকে ঢাকিয়াই রাখে। জগতের স্বরূপের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় এবং জগতের সহিত সম্পূর্ণভাবে পরিচিত হইলেও আমরা কি এই শিক্ষাই পাই না? যতদিন কামনা ও কর্ম্মের প্রবৃত্তি ভোগের দ্বারা ক্ষীণ বা পরিত্যক্ত না হয় ততদিন এই অজ্ঞানচক্র সংসার কি জীবকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করায় না? শুধু কাম নহে, কর্ম্ম পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতেই হইবে; তখন জীব নীরব আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গতিহীন, কর্ম্মহীন, অবিচল, কৈবল্যাত্মক ব্রহ্মের মধ্যে চলিয়া যাইবে। অব্যক্তে আসক্তচিত্ত শান্তি-প্রবণ সন্ন্যাসীর এই আপত্তির উত্তর গীতা যেরূপ যত্নের সহিত দিয়াছে, সংসারী কর্ম্মপ্রবণ মানুষের আপত্তির উত্তর দিতে গীতা তত যত্ন করে নাই। কারণ শান্ত সন্ন্যাসীর যে আপত্তি তাহাতে আরও উচ্চ এবং শক্তিশালী সত্য নিহিত রহিয়াছে অথচ ইহা সম্পূর্ণ বা শ্রেষ্ঠ সত্য নহে—ইহার প্রচারে মানবজাতির লক্ষ্যের দিকে প্রগতিতে যে গোলমাল ও অনিষ্ট হইতে পারে একদেশদর্শী কর্ম্মবাদের ভ্রান্তির দ্বারা তত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কোন তীব্র আংশিক সত্যকে যখন সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রচার করা যায়—তখন যেমন তীব্র আলোকের সৃষ্টি হয় তেমনি গভীর গোলমালেরও সৃষ্টি হয়; কারণ ইহার ভিতরে যে সত্যটুকু রহিয়াছে—তাহার শক্তি ইহার মিথ্যা বা ভুলের অংশটুকুকে খুব তীব্র করিয়া তুলে। কর্ম্মবাদের আদর্শে যে ভুল তাহাতে শুধু অজ্ঞানকে স্থায়ী করিয়া রাখে, এবং যেখানে সিদ্ধি পাওয়া যায় না সেখানে সিদ্ধির সন্ধান করায় মানবের উন্নতিতে বাধা পড়িতে পারে; কিন্তু সন্ন্যাসীর নিষ্কর্ম্মতার আদর্শে যে ভুল

তাহাতে সংসার-ধ্বংসের বীজ নিহিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি যদি এই আদর্শ অনুসারে কর্ম্মত্যাগ করি তাহা হইলে আমি লোক-সকলকে নষ্ট করিব এবং বিষম বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিব ; এবং যদিও কোন বিশিষ্ট মানব (যদিও তিনি প্রায় ভাগবত জীবন লাভ করিয়া থাকেন) তাঁহার ভুলের দ্বারা সমগ্র জাতিকে ধ্বংস করিতে না পারেন তথাপি তাঁহার ভুলের ফলে বিস্তৃত ভাবে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহা মানবজীবনের মূলনীতির সংহারক হইতে পারে এবং ইহার ক্রমবিকাশের নির্দ্দিষ্ট পন্থাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে।

অতএব, মানুষের মধ্যে কর্ম্মশূন্য শান্তির দিকে যে ঝোঁক রহিয়াছে তাহার অসম্পূর্ণতা বুঝিতে হইবে এবং ইহার মধ্যে যেমন সত্য রহিয়াছে অন্যদিকে কর্ম্মপ্রবণতার মধ্যেও যে তেমনই সত্য সমানভাবে রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে,—স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের মধ্যে ভগবান প্রকটিত হইতেছেন, এবং মানব জাতির সকল কর্ম্মের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন। ভগবান শুধু নীরবতার মধ্যেই নাই, তিনি কর্ম্মের মধ্যেও রহিয়াছেন ; প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত নিষ্ক্রিয় জীবের যে শান্তি-প্রবণতা এবং প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত জীবের যে কর্ম্মপ্রবণতায় জগৎ-যজ্ঞ, পুরুষ-যজ্ঞ সম্পন্ন হইতেছে এই দুইটি পরস্পর বিরোধী সত্য নহে, একটি সত্য অপরটি মিথ্যা এরূপ ভাবেও তাহাদের মধ্যে চিরবিরোধ নাই, একটি উচ্চ অপরটি নীচ তাহাও নহে, একটির দ্বারা অপরটির নাশ হইতে পারে সেরূপ সম্ভাবনাও নাই। এই দুইটি ভাগবত লীলার দুইটি দিক (double term)। শুধু অক্ষরই তাহাদের সংসিদ্ধির সমগ্র

তত্ত্ব নহে, উচ্চতম রহস্য নহে। এখানে কৃষ্ণ যাঁহার প্রতিনিধি সেই পুরুষোত্তমের মধ্যেই উভয়ের সিদ্ধি ও সমন্বয়ের সন্ধান করিতে হইবে, তিনি একই সঙ্গে পরমতম সত্তা, জগৎ-সমূহের অধীশ্বর এবং অবতার। যে ভাগবত-ভাবাপন্ন মানব তাঁহার ভাগবত প্রকৃতিতে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মতই তিনিও কর্ম্ম করিবেন; তিনি নিজেকে নৈষ্কর্ম্মের মধ্যে ছাড়িয়া দিবেন না। অজ্ঞানী মানুষের মধ্যে ভগবান কর্ম্ম করিতেছেন, জ্ঞানী মানুষের মধ্যেও তিনি কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহাকে জানাই আমাদের আত্মার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ এবং সিদ্ধিলাভের উপায়, কিন্তু তাঁহাকে শুধু বিশ্বের অতীত নীরব ও শান্তিময় বলিয়া জানিলে ও বুঝিলেই সব হইল না। অজাত ভগবানের রহস্য যেমন জানিতে হইবে, তেমনই তাঁহার দিব্য জন্ম ও কর্ম্মের রহস্যও জানিতে হইবে, জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্। এই জ্ঞান হইতে যে কর্ম্ম উৎসারিত হয় তাহা সকল বন্ধন হইতে মুক্ত। ভগবান বলিয়াছেন, "এইরূপে যে আমাকে জানে সে কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না।" যদি কর্ম্ম ও বাসনার বাধ্যতা এবং জন্মান্তের চক্র হইতে মুক্তিলাভ আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ হয় তাহা হইলে এই জ্ঞানকেই মুক্তির প্রকৃত প্রশস্ত উপায় বলিয়া ধরিতে হইবে, কারণ গীতায় বলা হইয়াছে—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ ৪।৯

"হে অর্জ্জুন, যিনি আমার এইরূপ দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম যথার্থরূপে

জানেন, তিনি দেহত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না; কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন।" দিব্য জন্মের জ্ঞান ও দিব্য জন্মের ভিতর দিয়া তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা অজ অব্যয় ভগবানকে লাভ করেন; দিব্য কর্ম্মের জ্ঞান ও সাধনের ভিতর দিয়া তিনি সর্ব্বভূতের অধীশ্বরকে লাভ করেন। তিনি সেই অজাত সত্তার মধ্যে বাস করেন; তাঁহার কর্ম্ম হয় সেই বিশ্বের অধীশ্বরের কর্ম্ম।

অবতারের সম্ভাবনা ও প্রয়োজন

যে-যোগে কর্ম্ম ও জ্ঞান এক হয়, জ্ঞানের সহিত কর্ম্মকে যজ্ঞরূপে অর্পণ করা হয়, যে-যোগে সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় জ্ঞানে, জ্ঞান কর্ম্মকে সমর্থন করে, পরিবর্ত্তিত করে, আলোকিত করে এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই সেই পরম ভগবান পুরুষোত্তমের উদ্দেশে অর্পিত হয় যিনি আমাদের মধ্যে নারায়ণরূপে আবির্ভূত হন, আমাদের সকল সত্তা ও কর্ম্মের অধীশ্বররূপে আমাদের হৃদয়ে চির-বিরাজিত, যিনি মানব শরীরেই অবতাররূপে আবির্ভূত হন, দিব্য জন্ম আমাদের মানবীয়তাকে অধিকার করে,—সেই যোগের কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ কথাচ্ছলে বলিলেন,—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ৪।১

আমি সূর্য্যকে এই আদি প্রাচীন যোগ বলিয়াছিলাম, সূর্য্য মানবপিতা মনুকে এবং মনু সূর্য্যবংশের আদিরাজ ইক্ষ্বাকুকে এই যোগ কহিয়াছিলেন।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ ৪।২,৩

"রাজর্ষিগণ এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ জানিয়াছিলেন। হে পরন্তপ, ইহলোকে তাহা কালবশে নষ্ট হইয়াছে। তুমি ভক্ত ও সখা, এ জন্য আমি সেই পুরাতন যোগ অদ্য তোমাকে কহিলাম; কারণ ইহাই উত্তম রহস্য।" ইহাকে উত্তম রহস্য বলা হইল, অতএব বলা হইল যে, ইহা অন্যান্য প্রকারের যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ অন্যান্য প্রকারের যোগ নির্ব্যক্তিক ব্রহ্মে বা কোন সাকার দেবতার নিকট লইয়া যায়, হয় কর্ম্মশূন্য জ্ঞানে যে মুক্তি নতুবা ভক্তিতে মগ্ন থাকায় যে মুক্তি তাহা লাভ হয়। কিন্তু, এখানে যে যোগের কথা বলা হইল তাহাতে শ্রেষ্ঠ রহস্য, এবং সমগ্র রহস্য লাভ হয়। ইহার দ্বারা আমরা ভাগবত শান্তি এবং ভাগবত কর্ম্ম লাভ করি, পূর্ণতম মুক্তিতে সম্মিলিত ভাগবত জ্ঞান, ভাগবত কর্ম্ম, ভাগবত আনন্দের অধিকারী হই; যেমন ভগবানের শ্রেষ্ঠ সত্তার মধ্যে তাঁহার বিভিন্ন, এমন কি বিরোধী শক্তি ও তত্ত্বসকলের সমন্বয় হইয়াছে, তেমনি ইহার মধ্যে অন্যান্য সমস্ত যোগের পথই সম্মিলিত হইয়াছে। অতএব গীতার এই যোগ কেবল কর্ম্মযোগ,—তিনটি পথের একটি পথ এবং নিম্নতম পথ এ কথা কেহ কেহ বলিলেও বাস্তবিক পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ যোগ, ইহা সমগ্র ও পূর্ণ, ইহাতে সকল পন্থার সমন্বয় হইয়াছে, ইহার দ্বারা আমাদের সমস্ত শক্তিকে ভগবদ্‌মুখী করা যায়।

ভগবান যে পরের পর যোগ শিক্ষা দানের কথা বলিলেন, অর্জ্জুন ইহার সাধারণ বাহ্যিক অর্থটি-ই ধরিলেন (ইহার অন্যরকম অর্থও করা যাইতে পারে) এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্‌বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪।৪

"তোমার জন্ম পরবর্ত্তী এবং সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব তুমি যে প্রথমে সূর্য্যকে এই যোগ বলিয়াছ, ইহা আমি কিরূপে বুঝিব?" শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া জবাব দিতে পারিতেন যে, তিনি ভগবান, সমস্ত জ্ঞানের তিনিই উৎস,—তাঁহারই জ্ঞানময় রূপ ও সকল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য জ্যোতির প্রদাতা সূর্য্যদেবকে তিনি তাঁহার বাণী দিয়াছিলেন,—ভর্গো সবিতুর্ দেবস্য যো নঃ ধীয়ঃ প্রচোদয়াৎ। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি এই সুযোগে অর্জ্জুনকে তাঁহার গুপ্ত ঈশ্বরত্বের কথা বলিলেন; ইহার জন্য তিনি ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনকে তখন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন যখন তিনি নিজেকে সকল বন্ধন-মুক্ত কর্ম্মীর ভাগবত আদর্শ বলিয়া উল্লেখ করেন—কিন্তু তখন কথাটা বেশ পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। এখন তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবান, অবতার।

গীতার গুরুর কথা বলিবার সময় আমরা সংক্ষেপে অবতারবাদের কথা বলিয়াছি; বেদান্তশিক্ষার আলোকে অবতারবাদ যেরূপ বুঝা যায় গীতা সেই ভাবে উহা আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছে। এখন এই অবতারবাদ আমাদিগকে আর একটু গভীর ভাবে দেখিতে হইবে এবং যে দিব্য জন্মের ইহা বাহ্যিক নিদর্শন তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে; কারণ, গীতার পূর্ণ শিক্ষায় ইহা সমধিক প্রয়োজনীয়। প্রথমে, গীতার গুরু নিজে যে ভাষায় অবতারের স্বরূপ ও প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন আমরা তাহার উল্লেখ করিব এবং এই বিষয়ে অন্যান্য স্থানেও যাহা বলা হইয়াছে বা সঙ্কেত করা হইয়াছে তাহাও স্মরণ করিব। ভগবান বলিলেন,—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ৪।৫—১১

"হে অর্জ্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; আমি সে সমুদায় জানি কিন্তু, তুমি তাহা জান না, হে পরন্তপ! অমি জন্ম-রহিত, নিজ স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তায় অবিনশ্বর এবং প্রাণীগণের ঈশ্বর হইলেও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়াবশতঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। হে ভারত, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের প্রাতুর্ভাব হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্কর্ম্মকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে

অবতীর্ণ হই। হে অর্জ্জুন, যিনি আমার এইরূপ জন্ম এবং কর্ম্ম যথার্থরূপে জানেন তিনি দেহত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন। আসক্তি ভয় ও ক্রোধশূন্য, মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞান তপস্যায় পবিত্র অনেক মহাত্মাই আমার ভাব (পুরুষোত্তমের ভাব) পাইয়াছেন। যাহারা আমাকে যে-ভাবে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি আমার প্রেমে সেই ভাবেই গ্রহণ করি ; হে পার্থ, মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমার পথের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।"

কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই কর্ম্মের সিদ্ধি কামনা করিয়া দেবগণের উদ্দেশে, একই ভগবানের বিভিন্ন রূপ ও ব্যক্তিত্বের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকে, কারণ মনুষ্যলোকে কর্ম্মজ সিদ্ধি, জ্ঞান-বিরহিত কর্ম্মের ফল, খুব শীঘ্রই এবং সহজেই লব্ধ হয় ; বাস্তবিক ইহা শুধু এই জগতেরই। কিন্তু পরমেশ্বরের উদ্দেশে জ্ঞানের সহিত যজ্ঞ করিয়া মানুষের মধ্যে যে ভাগবত জীবনের বিকাশ তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক কঠিন ; ইহার ফল উচ্চস্তরের এবং তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অতএব, মানুষকে গুণ-কর্ম্মের বিভাগ অনুযায়ী চাতুর্ব্বর্ণ্য নীতির অনুসরণ করিতে হয় এবং এই সাংসারিক কর্ম্মের স্তরে তাহারা ভগবানের বিভিন্ন গুণের ভিতর দিয়াই তাঁহার উপাসনা করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, যদিও আমি চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্ম করি এবং আমি এই চাতুর্ব্বর্ণ্য নীতির স্রষ্টিকর্ত্তা তথাপি আমাকে অকর্ত্তা বলিয়াও, অবিনশ্বর অক্ষর আত্মা বলিয়াও জানিও। কর্ম্মসকল আমাকে আসক্ত করে না, কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই,

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।

কারণ, ভগবান নির্ব্যক্তিক সত্তারূপে এই অহংমূলক ব্যক্তিকতার এবং প্রকৃতিজাত গুণের এই দ্বন্দ্বের অতীত, আবার পুরুষোত্তমরূপে, নির্ব্যক্তিক পুরুষরূপে, তিনি কর্ম্মের মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। অতএব দিব্য কর্ম্মের কর্ম্মিগণকে চাতুর্ব্বর্ণ্য নীতি অনুসারে কর্ম্ম করিবার সময়েও ঊর্দ্ধে যাহা রহিয়াছে তাহা জানিতে হইবে, নির্ব্যক্তিক আত্মার মধ্যে এবং পরম ভগবানের মধ্যে বাস করিতে হইবে,

ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ৪।১৪

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।

কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ৪।১৫

"এইরূপে যিনি আমাকে জানেন, তিনি তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হন না। এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বতন (জনকাদি) মুমুক্ষুরাও কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব তুমিও পূর্ব্বতন সাধুগণের কৃত প্রাচীনতর কর্ম্মই কর।"

গীতার এই যে কথাগুলি এখানে উত্থিত হইল, এগুলি দিব্য কর্ম্মের, ভাগবত কর্ম্মের স্বরূপের পরিচায়ক—পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহার নীতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই কথাগুলির পূর্ব্বেই গীতা হইতে যে শ্লোকগুলি তুলিয়া আমরা অনুবাদ করিয়াছি—তাহাতে দিব্য জন্মের, অবতারের, স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ভাল করিয়া বলিতে চাই যে, শুধু জগতের ধর্ম্ম রক্ষা, ধর্ম্মসংস্থাপনই অবতারের, মানবীয়তার মধ্যে ভগবদ্ আবির্ভাবরূপ মহান্ রহস্যের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; কারণ শুধু ধর্ম্মসংস্থাপনই যথেষ্ট নহে, একজন খৃষ্ট, কৃষ্ণ বা বুদ্ধের অবতারের উচ্চতম সম্ভব লক্ষ্য নহে, উহা এক উচ্চতর প্রয়োজন ও

লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য সাধারণ প্রয়োজনীয় একটি বিধান মাত্র। কারণ দিব্য জন্মের দুইটি দিক্ আছে, একটি হইতেছে অবতরণ, মানবীয়তার মধ্যে ভগবানের জন্ম, মানব শরীর ও প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের আত্ম-প্রকাশ, চিরন্তন অবতার ; অপরটি হইতেছে আরোহণ, ভাগবত ভাবে মানবের জন্ম, ভাগবত প্রকৃতি ও চৈতন্যর মধ্যে মানবের উত্থান, মদ্ভাবমাগতাঃ ; ইহা আত্মার নূতন জন্মে পুনর্জন্ম লাভ। এই নব জন্ম সাধনের জন্যই অবতার এবং ধর্ম্মসংস্থাপন। গীতার অবতারবাদের এই যে দুইটি দিক রহিয়াছে তাহা অসতর্ক পাঠকের চক্ষুতে পড়ে না, কারণ সাধারণ পাঠকেরা গীতার অর্থ তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করে না, দেখিবামাত্র সহজে যে অর্থ মনে আসে তাহাতেই সন্তুষ্ট হয় ; গীতার গোঁড়া টীকাকারেরাও ইহা ধরিতে পারে না, কারণ কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক মতবাদের সঙ্কীর্ণতাতে তাহারা প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করিয়া দেখে। অথচ অবতারবাদের সম্যক অর্থ বুঝিবার জন্য এই দুইটি দিকই প্রয়োজন। নতুবা এই অবতারবাদ শুধু একটা গোঁড়া মত, একটা লৌকিক কুসংস্কার বা কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক মহাপুরুষকে কল্পনার বলে ভগবান বলিয়া বর্ণনা করা ভিন্ন আর কিছুই হয় না ; কিন্তু গীতার শিক্ষা এইরূপ নহে, গীতার সমস্ত শিক্ষার ন্যায় এই অবতারবাদও গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং উত্তমম্ রহস্যম্, শ্রেষ্ঠ রহস্যের অন্তর্গত।

এইরূপে মানুষকে তুলিয়া ভাগবত জীবনের মধ্যে লইয়া যাইতে সাহায্য করিবার জন্যই মানব শরীরে ভগবানের অবতরণ। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে শুধু ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভগবানের অবতারের

কোন প্রয়োজন নাই; কারণ ধর্ম্ম, ন্যায়, পাপ-পূণ্যের বিধান—এ সকলের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর সকল সময়েই সাধারণ উপায়ের দ্বারা সংসাধন করিতে পারেন—মহাপুরুষ বা মহৎ আন্দোলনের ভিতর দিয়া, সাধু, রাজা এবং ধর্ম্মোপদেষ্টাদের জীবন ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া এই সকল সংসাধিত হইতে পারে, বস্তুতঃ স্বয়ং ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হয় না। মানবীয় প্রকৃতির মধ্যে ভাগবত প্রকৃতির প্রকাশই অবতার, এইরূপেই হইয়াছে খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ, বুদ্ধের আবির্ভাব—ইহার উদ্দেশ্য এই যে, মানবীয় প্রকৃতি খ্রীষ্টত্ব, কৃষ্ণত্ব, বুদ্ধত্বের অনুসরণ করিয়া নিজের নীতি, চিন্তা, ভাব, কর্ম্ম গড়িয়া তুলিবে এবং এইরূপেই তাহা ভাগবত প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হইবে। অবতার যে-নীতি, যে-ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন ইহাই তাহার মূখ্য উদ্দেশ্য; খ্রীষ্ট বা কৃষ্ণ বা বুদ্ধ কেন্দ্র-স্থানে দ্বারের মত দাঁড়াইয়া থাকেন—তাঁহার নিজের ভিতর দিয়াই মানুষের অগ্রসর হইবার পথ করিয়া দেন। এই জন্যই প্রত্যেক অবতার মনুষ্যের সম্মুখে নিজের দৃষ্টান্ত ধরিয়া থাকেন এবং প্রচার করেন যে, তিনিই পথ, তিনিই প্রবেশের দ্বার; আরও তিনি প্রচার করেন তাঁহার মানবীয়তার সহিত ভাগবত সত্তার একত্ব। যীশু বলিয়াছেন, মানবপুত্র তিনি এবং যে স্বর্গীয় পিতা হইতে তিনি অবতীর্ণ উভয়েই এক; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, মানুষশরীরে তিনি, মানুষীম্ তনুমাশ্রিতম্, এবং সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ পরম ঈশ্বর উভয়েই এক ভগবান পুরুষোত্তমেরই প্রকাশ, সেখানে নিজ স্বরূপে প্রকাশ, এখানে মানব মূর্ত্তিতে প্রকাশ।

অবতারের এই দ্বিতীয় এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যই যে গীতাশিক্ষার সার

তাহা গীতার কেবল এই অংশের যথার্থ আলোচনা করিলেই বুঝা যায়; কিন্তু, শুধু এই অংশটি না ধরিয়া অন্যান্য অংশও যদি বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে ইহা আরও স্পষ্ট হয়। বাস্তবিক গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে—কোন বিশেষ শ্লোক বা অংশকে স্বতন্ত্র ভাবে ধরা ঠিক নহে—অন্যান্য শ্লোক বা অংশের সহিত মিলাইয়া, এবং সমগ্র শিক্ষার সহিত মিলাইয়া তাহার অর্থ করা সমীচীন। গীতা যে বলিয়াছে, একই আত্মা সর্ব্বভূতে বিরাজমান, ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে অবস্থিত—আমাদিগকে গীতার সেই শিক্ষা এখানে স্মরণ করিতে হইবে; ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্টির পরস্পরের সম্বন্ধের কথা মনে করিতে হইবে; বিভূতির কথা গীতায় যেরূপ জোরের সহিত বলা হইয়াছে তাহাও মনে করিতে হইবে। গীতার গুরু যে ভাষায় নিজের নিঃস্বার্থ কর্ম্মের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে—এই বর্ণনা মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণ এবং জগতের ঈশ্বর উভয়েরই পক্ষে সমানভাবে খাটে; নবম অধ্যায়ের নিম্ন শ্লোকটির মত শ্লোকগুলির মর্ম্মও গ্রহণ করিতে হইবে,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯।১১

"ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে কারণ তাহারা সর্ব্বভূতের মহান ঈশ্বররূপ আমার পরম তত্ত্ব জানে না।" এই সকল তথ্যের আলোকে আমাদিগকে গীতার নিম্নলিখিত ঘোষণাটি বুঝিতে হইবে,—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৪।৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্‌ভাবমাগতাঃ ॥ ৪।১০

"হে অর্জ্জুন যিনি আমার এইরূপ জন্ম ও কর্ম্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহত্যাগান্তে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন। আসক্তি ভয় ও ক্রোধশূন্য হইয়া, মদেকচিত্ত হইয়া, আমাকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞান তপস্যার দ্বারা পবিত্র অনেক মহাত্মাই আমার ভাব পাইয়াছেন।" এইরূপ আলোচনা করিলে আমরা দিব্য জন্মের প্রকৃত স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব; বুঝিব যে, এই অবতার বা দিব্য জন্ম একটা বিচ্ছিন্ন অলৌকিক ঘটনা নহে—জগত-বিকাশরূপ সমগ্র ব্যাপারের মধ্যে ইহারও নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে; নতুবা আমরা ইহার দিব্য রহস্য বুঝিতে পারিব না, হয়ত আমরা একেবারেই এই অবতার তত্ত্বকে উড়াইয়া দিব অথবা অন্ধভাবে কিছু না বুঝিয়াই হয়ত বা কুসংস্কারপূর্ণভাবেই ইহাকে মানিয়া লইব, অথবা অবতার সম্বন্ধে আধুনিক মনের সেই সব ক্ষুদ্র ও অগভীর ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িব যাহাদের দ্বারা ইহার সকল নিগূঢ় ও সাহায্যপ্রদ অর্থ নষ্ট হইয়া যায়।

প্রাচ্য হইতে যে সকল ভাব মানুষের যৌক্তিক বুদ্ধির সম্মুখে আসিতেছে তাহাদের মধ্যে এই অবতার তত্ত্ব আধুনিক মনের পক্ষে বুঝা বড়ই কঠিন। আধুনিক মন অবতারবাদকে অন্ধ কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেয় নতুবা ইহাকে রূপক মাত্র বলিয়া গ্রহণ করে—তাহাদের মতে যে সকল মনুষ্য বিশেষ শক্তি, প্রতিভা বা কর্ম্ম দেখান তেমন

লোককেই সাধারণে অবতার বলিয়া থাকে। জড়বাদীগণ ত অবতার তত্ত্বকে আমলই দিতে পারে না, কারণ তাহারা ভগবানের অস্তিত্বই স্বীকার করে না; যাহারা ঈশ্বরকে জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে দেখেন (Deists) তাঁহারা ভগবান যে মানুষ হন একথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। পূর্ণ দ্বৈতবাদী (Dualists), যাঁহারা মানবীয় প্রকৃতি এবং ভাগবৎ প্রকৃতির মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান দেখিতে পান, তাঁহাদের নিকট অবতারবাদ হইতেছে পাষণ্ডীয়। যুক্তিবাদী বলেন ভগবান যদি থাকেন তাহা হইলে তিনি বিশ্বের উপরে অথবা বাহিরে আছেন এবং তিনি সংসারের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না, বাঁধা নিয়মকানুনের বশে জগতের কার্য্যাবলী যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয়, —বস্তুতঃ তিনি একজন দূরবর্ত্তী নিয়মতান্ত্রিক রাজার মত, বড় জোর তিনি প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতার পশ্চাতে উদাসীন, নিষ্ক্রিয়, আত্মামাত্র, সাংখ্যের সাক্ষীর মত; তিনি পবিত্র আত্মা, তাঁহার পক্ষে শরীর ধারণ সম্ভব নহে, তিনি অনন্ত, মানুষ যেমন সান্ত তিনি তেমন সান্ত হইতে পারেন না, তিনি চির-অজাত সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি কখনও সৃষ্ট জীবরূপে জগতে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন না; তিনি সর্ব্বশক্তিমান হইলেও এ সব তাঁহার পক্ষেও সম্ভব নহে। পূর্ণ দ্বৈতবাদীরা আরও আপত্তি তুলেন যে, ভগবান তাঁহর স্বরূপ ও ব্যবহার ও প্রকৃতিতে মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন স্বতন্ত্র; যিনি পূর্ণ, মনুষ্যের অপূর্ণতা গ্রহণ করা তাঁহাতে সম্ভব নহে; অজাত ভাগবত পুরুষ কখনও মানবীয় ব্যক্তিরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন না, যিনি জগৎসমূহের নিয়ন্তা তিনি কখনও প্রকৃতির অধীন মানবীয় কর্ম্মের মধ্যে, ধ্বংসশীল মানব শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে

পারেন না। এই যে সকল আপত্তি শুনিবামাত্রই বুদ্ধির কাছে খুব বড় বলিয়া মনে হয়, গীতার গুরুর মনেও যে এই আপত্তিগুলি উঠিয়াছিল তাঁহার নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪।৬
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৯।১১
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ৪।১৩

"আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং প্রাণীগণের ঈশ্বর; তাহা হইলেও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়ায় আবির্ভূত হইয়া থাকি। মূঢ়গণ সর্ব্বভূতের মহান্ ঈশ্বররূপ আমার পরমতত্ত্ব না জানায় মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে। আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি; আমাকে তাহার কর্ত্তা বলিয়া জানিও, অব্যয় অকর্ত্তা বলিয়াও জানিও"—ভাগবত চৈতন্যের ক্রিয়ায় তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সংসারের সকল কর্ম্মের কর্ত্তা, আবার ভাগবত চৈতন্যের নীরবতার মধ্যে তিনি তাঁহার নিজেরই প্রকৃতির কর্ম্মের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা—কারণ তিনি সকল সময়ে নীরবতা ও কর্ম্ম উভয়ের উর্দ্ধে, তিনি পরম পুরুষোত্তম। গীতা এই সমস্ত আপত্তিরই খণ্ডন করিতে এবং এই সকল বিরোধের মীমাংসা করিতে পারিয়াছে, কারণ গীতা জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বেদান্তের মত গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

কারণ বেদান্তের মতে এই সকল দারুণ আপত্তি ও বিরোধের কোন ভিত্তিই নাই। বেদান্তের মতে অবতারবাদ অপরিহার্য্য নহে বটে তথাপি ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত ধারণারূপে বেদান্ত মতের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া পড়ে। কারণ এখানে সমস্তই ভগবান, আত্মা, স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা, ব্রহ্ম, একমেবাদ্বিতীয়ম্—ইহা ছাড়া ইহা হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র আর কিছুই নাই, থাকিতে পারে না, প্রকৃতি ভাগবৎ চৈতন্যেরই শক্তি এবং ইহা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না ; সকল জীবই ভগবানের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শারীররূপ ও আত্মরূপ—ভাগবত চৈতন্যের শক্তি হইতেই তাহারা উৎপন্ন অথবা তাহার মধ্যে অবস্থিত। অনন্তের পক্ষে সান্তভাব গ্রহণ করা অসম্ভব ত নহেই, সমস্ত বিশ্ব ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে ; আমরা যে-ভাবেই দেখি না কেন, যে-জগতে আমরা বাস করি তাহার কোথাও ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। আত্মার পক্ষে আকার গ্রহণ করা, অথবা দেহ ও মনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া, সীমাবদ্ধ প্রকৃতি বা দেহ গ্রহণ করা অসম্ভব ত নহেই, পরন্তু এইরূপ সম্বন্ধের দ্বারাই জগৎ টিকিয়া আছে। এই জগৎ শুধু চৈতন্যহীন অন্ধ নিয়মের খেলা নহে, জগতের বাহিরে কোন চৈতন্য বা আত্মা শুধু উদাসীন সাক্ষীভাবে বসিয়া নাই, সমগ্র জগৎ এবং জগতের প্রতি অণু পরমাণু ভাগবত শক্তির ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং সেই শক্তি জগতের প্রত্যেক গতি ও ক্রিয়া পরিচালন করে, জগতের প্রত্যেক রূপের মধ্যে বাস করে, প্রত্যেক আত্মা ও মনকে অধিকার করে ; সকলেই :ভগবানের মধ্যে আছে, সকলেই তাঁহার মধ্যে চলাফেরা করে, তাঁহারই মধ্যে জীবন যাপন করে ; তিনি সকলের মধ্যে

আছেন, সকলের ভিতর দিয়া কর্ম্ম করেন এবং নিজের সত্তা প্রকট করেন; প্রত্যেক জীবই ছদ্মবেশী নারায়ণ।

অজাত ভগবানের পক্ষে জন্মগ্রহণ অসম্ভব হওয়া দূরের কথা, সমস্ত জীব ব্যক্তিগত ভাবেই অজ আত্মা, সকলেই আদি-অন্তহীন সনাতন, তাহাদের গূঢ় সত্তায় সকলেই সেই এক আত্মা যাহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু বাহ্যিক আকার পরিগ্রহ এবং পরিবর্ত্তনের লক্ষণমাত্র। যিনি পূর্ণ (Perfect) তিনি কেমন করিয়া অপূর্ণতা (imperfection) পরিগ্রহ করিতে পারেন ইহাই বিশ্বপ্রপঞ্চের পরম রহস্যময় ব্যাপার; কিন্তু যে মন ও শরীর পরিগৃহীত হয় তাহার রূপ ও কর্ম্মেই অপূর্ণতা দোষ দৃষ্ট হয়,—যিনি এই সব পরিগ্রহ করেন তাঁহাতে কোন অপূর্ণতা নাই, যেমন সূর্য্য যে আলো দেয় তাহাতে কোন দোষ নাই, যাহার যেমন চক্ষু সে তেমনই আলো দেখিয়া থাকে, বিভিন্ন ব্যক্তির চক্ষুতে অপূর্ণতা বা দোষ থাকে। ভগবান কোনও দূর স্বর্গ হইতে যে এই বিশ্ব জগৎ পরিচালন করেন তাহাও নহে, সর্ব্বত্র নিবিড়ভাবে বিরাজিত থাকিয়াই তিনি জগৎ পরিচালন করেন; শক্তির যে সব সসীম ক্রিয়া সে সব এক অনন্ত শক্তিরই ক্রিয়া, সে সব কোন সীমাবদ্ধ স্বতন্ত্র স্ব-প্রতিষ্ঠ ক্রিয়া নহে, সবই সেই এক অনন্ত শক্তি হইতে উদ্ভূত; ইচ্ছা ও জ্ঞানের প্রত্যেক সসীম ক্রিয়াতেই দেখিতে পাওয়া যায় সেইটিকে ধরিয়া রহিয়াছে এক অনন্ত সর্ব্ব-ইচ্ছা এবং সর্ব্ব-জ্ঞানের ক্রিয়া। ভগবান কোন দূরদেশে জগতের বাহিরে থাকিয়া জগৎ পরিচালন করেন না; তিনি সকলের অতীত বলিয়াই সকলকে পরিচালনা করেন, কিন্তু আবার তিনি সকল ক্রিয়ার মধ্যে তাহাদের পরমাত্মারূপে আছেন বলিয়াও সকলকে পরিচালনা করেন।

অতএব আমাদের বুদ্ধি অবতারের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি তুলিয়া থাকে সে সকল ভিত্তিহীন। কারণ আমাদের বুদ্ধি যে (অনন্ত ও সান্তের, পূর্ণ ও অপূর্ণের) মিথ্যা বিভাগ করিয়া থাকে তাহা জগতের সমগ্র ঘটনার, সমগ্র সত্যের বিরোধী।

কিন্তু সম্ভাবনার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই প্রশ্ন উঠে যে, বাস্তবিকই কি এইরূপ ঘটিয়া থাকে? বাস্তবিকই কি ভাগবত চৈতন্য আবরণের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া সাক্ষাৎভাবে বাহ্যজগতে, মানসিক ও জড় জগতে, সসীমের মধ্যে, অসম্পূর্ণের মধ্যে কার্য্য করিয়া থাকে? প্রকৃতপক্ষে সসীম আর কিছুই নহে, নিজের চৈতন্যের বিচিত্রতার সম্মুখে অনন্তের আত্মপ্রকাশের এক একটি রূপই হইতেছে সসীম; কার্য্যতঃ সসীম যেভাবেই প্রতীয়মান হউক, বস্তুতঃ প্রত্যেক সসীমই নিজ স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তায় অসীম অনন্ত। মানুষকে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, মানুষ একেবারে স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন স্ব-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি নহে, কিন্তু বিশেষ শরীর ও মনের ভিতর মানব জাতিরই প্রকাশ; তেমনই মানব জাতিও কোন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি নহে, ইহা বিশ্বসত্তার, বিশ্বেশ্বরেরই মানবজাতিরূপে আত্মপ্রকাশ। সেখানে তিনি কতকগুলি বিশিষ্ট সম্ভাবনার বিকাশ করিতেছেন। তাঁহার অভিব্যক্তির কতকগুলি বিশিষ্ট শক্তি বিবর্ত্তিত করিতেছেন। আর তিনি বিবর্ত্তিত করিতেছেন, প্রকট করিতেছেন নিজেকেই, আত্মাকেই।

কারণ আত্মা (Spirit) বলিতে আমরা বুঝি স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা, তাহার আছে চৈতন্যের অনন্ত শক্তি এবং নিজ সত্তায় অনাপেক্ষিক আনন্দ।

আছেন, সকলের ভিতর দিয়া কর্ম্ম করেন এবং নিজের সত্তা প্রকট করেন; প্রত্যেক জীবই ছদ্মবেশী নারায়ণ।

অজাত ভগবানের পক্ষে জন্মগ্রহণ অসম্ভব হওয়া দূরের কথা, সমস্ত জীব ব্যক্তিগত ভাবেই অজ আত্মা, সকলেই আদি-অন্তহীন সনাতন, তাহাদের গূঢ় সত্তায় সকলেই সেই এক আত্মা যাহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু বাহ্যিক আকার পরিগ্রহ এবং পরিবর্ত্তনের লক্ষণমাত্র। যিনি পূর্ণ (Perfect) তিনি কেমন করিয়া অপূর্ণতা (imperfection) পরিগ্রহ করিতে পারেন ইহাই বিশ্বপ্রপঞ্চের পরম রহস্যময় ব্যাপার; কিন্তু যে মন ও শরীর পরিগৃহীত হয় তাহার রূপ ও কর্ম্মেই অপূর্ণতা দোষ দৃষ্ট হয়,— যিনি এই সব পরিগ্রহ করেন তাঁহাতে কোন অপূর্ণতা নাই, যেমন সূর্য্য যে আলো দেয় তাহাতে কোন দোষ নাই, যাহার যেমন চক্ষু সে তেমনই আলো দেখিয়া থাকে, বিভিন্ন ব্যক্তির চক্ষুতে অপূর্ণতা বা দোষ থাকে। ভগবান কোনও দূর স্বর্গ হইতে যে এই বিশ্ব জগৎ পরিচালন করেন তাহাও নহে, সর্ব্বত্র নিবিড়ভাবে বিরাজিত থাকিয়াই তিনি জগৎ পরিচালন করেন; শক্তির যে সব সসীম ক্রিয়া সে সব এক অনন্ত শক্তিরই ক্রিয়া, সে সব কোন সীমাবদ্ধ স্বতন্ত্র স্ব-প্রতিষ্ঠ ক্রিয়া নহে, সবই সেই এক অনন্ত শক্তি হইতে উদ্ভূত; ইচ্ছা ও জ্ঞানের প্রত্যেক সসীম ক্রিয়াতেই দেখিতে পাওয়া যায় সেইটিকে ধরিয়া রহিয়াছে এক অনন্ত সর্ব্ব-ইচ্ছা এবং সর্ব্ব-জ্ঞানের ক্রিয়া। ভগবান কোন দূরদেশে জগতের বাহিরে থাকিয়া জগৎ পরিচালন করেন না; তিনি সকলের অতীত বলিয়াই সকলকে পরিচালনা করেন, কিন্তু আবার তিনি সকল ক্রিয়ার মধ্যে তাহাদের পরমাত্মারূপে আছেন বলিয়াও সকলকে পরিচালনা করেন।

অতএব আমাদের বুদ্ধি অবতারের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি তুলিয়া থাকে সে সকল ভিত্তিহীন। কারণ আমাদের বুদ্ধি যে (অনন্ত ও সান্তের, পূর্ণ ও অপূর্ণের) মিথ্যা বিভাগ করিয়া থাকে তাহা জগতের সমগ্র ঘটনার, সমগ্র সত্যের বিরোধী।

কিন্তু সম্ভাবনার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই প্রশ্ন উঠে যে, বাস্তবিকই কি এইরূপ ঘটিয়া থাকে ? বাস্তবিকই কি ভাগবত চৈতন্য আবরণের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া সাক্ষাৎভাবে বাহ্যজগতে, মানসিক ও জড় জগতে, সসীমের মধ্যে, অসম্পূর্ণের মধ্যে কার্য্য করিয়া থাকে ? প্রকৃতপক্ষে সসীম আর কিছুই নহে, নিজের চৈতন্যের বিচিত্রতার সম্মুখে অনন্তের আত্মপ্রকাশের এক একটি রূপই হইতেছে সসীম ; কার্য্যতঃ সসীম যেভাবেই প্রতীয়মান হউক, বস্তুতঃ প্রত্যেক সসীমই নিজ স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তায় অসীম অনন্ত। মানুষকে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, মানুষ একেবারে স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন স্ব-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি নহে, কিন্তু বিশেষ শরীর ও মনের ভিতর মানব জাতিরই প্রকাশ ; তেমনই মানব জাতিও কোন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি নহে, ইহা বিশ্বসত্তার, বিশ্বেশ্বরেরই মানবজাতিরূপে আত্মপ্রকাশ। সেখানে তিনি কতকগুলি বিশিষ্ট সম্ভাবনার বিকাশ করিতেছেন। তাঁহার অভিব্যক্তির কতকগুলি বিশিষ্ট শক্তি বিবর্ত্তিত করিতেছেন। আর তিনি বিবর্ত্তিত করিতেছেন, প্রকট করিতেছেন নিজেকেই, আত্মাকেই।

কারণ আত্মা (Spirit) বলিতে আমরা বুঝি স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা, তাহার আছে চৈতন্যের অনন্ত শক্তি এবং নিজ সত্তায় অনাপেক্ষিক আনন্দ।

হয় ইহা এরূপ নতুবা ইহা কিছুই নয়, অন্ততঃ মানুষ ও জগতের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই। জড়, শরীর হইতেছে কেবল চৈতন্যময় সত্তার একটা পুঞ্জীভূত গতি, চৈতন্য নিজের ইন্দ্রিয়শক্তির ভিতর দিয়া বিচিত্র সম্বন্ধ বিকাশের জন্য জড়কে, দেহকে প্রাথমিক উপলক্ষ্যরূপে ব্যবহার করে; জড়ও প্রকৃতপক্ষে কোথাও চৈতন্যশূন্য নহে, কারণ বর্ত্তমান বিজ্ঞানই স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, প্রত্যেক অণুতে (atom), প্রত্যেক কোষে (cell) একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা বুদ্ধি ক্রিয়া করিতেছে; কিন্তু সেই শক্তি অন্তর্নিহিত আত্মারই, ভাগবতেরই সঙ্কল্প ও বুদ্ধির শক্তি; কোষে ও অণুতে যে চেতনাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, তাহা জড় অণু বা কোষের নিজস্ব, স্বতন্ত্র সঙ্কল্প বা বুদ্ধি নহে। এই যে বিশ্বব্যাপী ইচ্ছাশক্তি, বোধশক্তি, সর্ব্বত্র নিহিত রহিয়াছে ইহা বিভিন্ন রূপের ভিতর দিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং অন্ততঃ পৃথিবীতে ইহা মানুষের মধ্যেই পূর্ণ ভাগবতের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং প্রথমে সেখানেই বাহ্যচৈতন্যের মধ্যেও অস্পষ্টভাবে নিজের ভাগবত সত্তা উপলব্ধি করিয়াছে। কিন্তু এখানেও একটা সীমা আছে, এখানেও অভিব্যক্তির সেই অসম্পূর্ণতা আছে যাহার জন্য নিম্নস্তরের আধারে ভগবানের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি হয় না। কারণ প্রত্যেক সসীম সত্তাতেই তাহার বাহিরের কর্ম্মে যেমন অসম্পূর্ণতা আছে তেমনই তাহার বাহিরের চৈতন্যেও অসম্পূর্ণতা আছে এবং ইহা হইতেই জীবের স্বরূপ নিরূপিত হয় ও এইরূপেই জীবের সহিত জীবের বিভিন্নতা হয়। অবশ্য ভগবান পশ্চাৎ হইতে কর্ম্ম করেন এবং এই বাহ্যিক ও অসম্পূর্ণ চেতনা ও সঙ্কল্পের ভিতর দিয়া নিজের অভিব্যক্তি

নিয়ন্ত্রিত করেন, কিন্তু তিনি নিজে গূহায়াম্ (বেদ), গুহার ভিতর লুক্কায়িত ; অথবা গীতায় যেমন বলা হইয়াছে—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

"ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া মায়া দ্বারা সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় পরিভ্রমণ করাইতেছেন।" ভগবান এই যে জীবের হৃদয়ে গুপ্ত থাকিয়া অলক্ষ্যে তাহার অহংমূলক প্রাকৃত চৈতন্যের ভিতর দিয়া কর্ম্ম করেন, জীবের সহিত ভগবানের সর্ব্বত্রই এইরূপ ব্যবহার। তবে কেন আমরা ধরিতে যাইব যে, কোন বিশেষ আধারে তিনি অন্তরাল হইতে সম্মুখে আসেন, বাহ্য চৈতন্যের মধ্যে আসেন এবং অধিকতর সাক্ষাৎভাবে ও সজ্ঞানে দিব্য কর্ম্ম সম্পাদিত হয়? ভগবান ও মানুষের মধ্যে যে অন্তরাল রহিয়াছে—এবং নিজের প্রকৃতিতে সীমাবদ্ধ মানুষ যাহা নিজে কখনই সরাইতে পারিত না, তাহা লুপ্ত করাই যে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

গীতা বলে, জীব সাধারণতঃ যে অপূর্ণভাবে কর্ম্ম করে, তাহার কারণ জীব প্রকৃতির প্রক্রিয়ার বশ এবং মায়া তাহার আত্মজ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। প্রকৃতি ও মায়া, ভাগবত চৈতন্যের একই কার্য্যকরী শক্তির দুইটি অনুপূরক ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। মূলতঃ মায়া ভ্রম (illusion) নহে (ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতির অজ্ঞান হইতেই মায়ার ভ্রম উৎপন্ন হয়), ভাগবত চৈতন্য যে-শক্তিতে বিভিন্নভাবে নিজেকে নিজের সম্মুখে ধরিতেছে, আত্মপ্রকাশ করিতেছে—ইহাই মায়া ; এই সকল বিভিন্ন আত্মপ্রকাশকে

প্রত্যেকের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম অনুসারে প্রকট করা যাহার কাজ, ভাগবত চৈতন্যের সেই কার্য্যকরী শক্তিই প্রকৃতি।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৯।৮

"আমি আমার নিজের প্রকৃতির উপর চাপিয়া প্রকৃতির শাসনে অবশ এই সকল ভূতগণকে বারংবার সৃষ্টি করি।" মানব শরীরে অবস্থিত ভগবানকে যাহারা জানে না তাহাদের এই অজ্ঞানের কারণ এই যে তাহারা প্রকৃতির এই যন্ত্রবৎ ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অধীন, অবশ-ভাবে ইহার মানসিক অজ্ঞান ও অপূর্ণতাসকলে সায় দেয় এবং আসুরিক প্রকৃতির মধ্যে বাস করে; এই আসুরিক প্রকৃতি বাসনা ও অহংভাবের দ্বারা তাহাদের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে, মোহিনীং প্রকৃতিং আশ্রিতাঃ। কারণ হৃদিস্থিত পুরুষোত্তমকে সকলেই সহজে দেখিতে পায় না; তিনি নিজেকে গভীর অন্ধকার মেঘের অন্তরালে অথবা উজ্জ্বল আলোক মেঘের অন্তরালে লুকাইয়া রাখেন, যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া রাখেন।*

গীতায় বলা হইয়াছে—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ৭।১৩
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭।১৪

---

* নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ৭।১৫

"এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব দ্বারা মোহিত হওয়ায় এই সমস্ত জগৎ আমাকে জানিতে পারে না। কারণ, আমার এই গুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম করা বড়ই দুঃসাধ্য; যাঁহারা আমার শরণাপন্ন হন, তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম করেন। কিন্তু কুকর্ম্মান্বিত মোহগ্রস্ত নরাধমগণ আমার ভজন করে না, আসুরিক ভাবের মধ্যে বাস করে, তাহাদের জ্ঞান মায়া কর্ত্তৃক অপহৃত হয়।" অর্থাৎ ভাগবতের জ্ঞান সকলের মধ্যেই ওতঃপ্রোত ভাবে রহিয়াছে, কারণ সকলের মধ্যেই ভগবান বাস করিতেছেন; কিন্তু তিনি সেখানে নিজ মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং মায়ার ক্রিয়ার দ্বারা, প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়ার দ্বারা এই মূল আত্মজ্ঞান অপহৃত হয়, অহংয়ের ভ্রমে পরিণত হয়। তথাপি মানুষ প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়া হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গুপ্ত অধীশ্বরের দিকে ফিরিলে অন্তর্য্যামী ভগবানকে জানিতে পারে।

এখানে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গীতা সাধারণ জীবের জন্ম যে ভাষায় বর্ণনা করিয়াছে তাহারই বিশেষ প্রয়োজনীয় স্বল্প একটু পরিবর্ত্তন করিয়া ভগবানের অবতারের কথাও বর্ণনা করিয়াছে। ভগবান কেমন করিয়া সাধারণ জীবের জন্ম দেন সে সম্বন্ধে পরে বলা হইবে—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৯।৮

এখানে বলা হইয়াছে—

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।

"স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়ার দ্বারা আমি আবির্ভূত হইয়া থাকি।" আত্মানম্ সৃজামি (I loose forth myself) আমি, আপনাকে সৃষ্টি করি। পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যবহৃত "অবষ্টভ্য" কথার দ্বারা বোঝায়, উপর হইতে নীচের দিকে এমন সজোরে চাপ দেওয়া যাহাতে অধিকৃত বস্তুটি নির্জ্জিত, নিপীড়িত, তাহার সমস্ত গতিক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ হয়, সম্পূর্ণভাবে উপরের বস্তুর বশ হইয়া পড়ে, অবশম্ বশাৎ; প্রকৃতি এই প্রক্রিয়ায় কলের (mechanism) মত কাজ করে এবং তাহার জীব সকলের নিজেদের কোন প্রভুত্ব থাকে না; তাহারা এই কলে অবশ ভাবে বদ্ধ থাকে। অন্যদিকে, "অধিষ্ঠায়" শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহার অর্থ প্রকৃতিতে বাস করা, অথচ, প্রকৃতির উপর দাঁড়াইয়া থাকিয়া সজ্ঞানে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে প্রকৃতির কার্য্য পরিচালনা করা—ইহাতে পুরুষ অজ্ঞানের বশে অবশভাবে প্রকৃতি কর্ত্তৃক চালিত হয় না, বরং প্রকৃতিই পুরুষের জ্ঞান ও ইচ্ছায় পূর্ণ হয়। অতএব, সাধারণ জন্মে যাহা সৃষ্ট হয় তাহা ভূতগ্রামম্, ভূত সকল; দিব্যজন্মে যাহা আবির্ভূত হয় তাহা স্বয়ম্ভু, আত্মচেতন, স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা, আত্মানম্; কারণ, বেদান্ত আত্মা ও ভূতানি এই দুয়ের যে প্রভেদ করিয়াছে, পাশ্চাত্য দর্শনও সেই প্রভেদ করিয়াছে, Being এবং তাহার becomings। উভয় ক্ষেত্রে মায়াই সৃষ্টি বা অভিব্যক্তির উপায় স্বরূপ (means), কিন্তু, দিব্য জন্মে ইহা হইতেছে আত্ম-

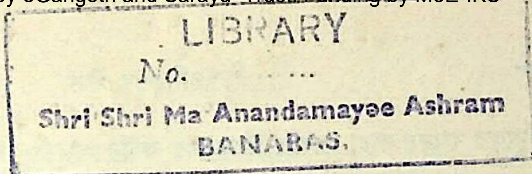
মায়য়া, স্বীয় মায়া দ্বারা; নিম্নতন অবিদ্যা মায়ার মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়া নহে, পরন্তু ইহা হইতেছে স্বপ্রতিষ্ঠ ভগবানের সজ্ঞানে জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ, এই মায়ার ক্রিয়া ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে তাঁহার বিদিত। গীতা অন্যত্র ইহাকেই যোগমায়া বলিয়াছে। সাধারণ জন্মে ভগবান এই যোগমায়া দ্বারা নিজেকে নিম্নতন চৈতন্য (Lower consciousness) হইতে লুকাইয়া রাখেন এবং এইরূপে ইহা আমাদের পক্ষে অজ্ঞানের যন্ত্রস্বরূপ হয়, অবিদ্যামায়া; কিন্তু এই একই যোগমায়া আবার আমাদিগকে আত্মজ্ঞান লাভ করায়, আমরা ভাগবতজ্ঞানে ফিরিয়া আসি, ইহা জ্ঞানের যন্ত্রস্বরূপ হয়, বিদ্যামায়া; দিব্যজন্মে ইহা এইরূপেই কার্য্য করে—সাধারণতঃ যে সব কার্য্য অজ্ঞানের বশে করা হয় ইহা সেই সকল কার্য্যকে জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত ও পরিচালিত করে।

গীতার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে, দিব্য জন্ম হইতেছে ভগবানের সজ্ঞানে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করা এবং ইহা মূলতঃ সাধারণ জন্মের বিপরীত (যদিও একই উপায়ের দ্বারা দুইটিই সংঘটিত হইয়া থাকে), কারণ ইহা অজ্ঞানের মধ্যে জন্মগ্রহণ নহে, পরন্তু জ্ঞানেরই জন্মগ্রহণ, ইহা শারীরিক ব্যাপার নহে পরন্তু অধ্যাত্ম জন্ম (a soul birth)। আত্মা স্ব-প্রতিষ্ঠ পুরুষরূপে নিজের বিবর্ত্তন সজ্ঞানে নিয়মিত করিয়া, অজ্ঞান মেঘে আত্মজ্ঞান না হারাইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এখানে আত্মা প্রকৃতির অধীশ্বররূপেই শরীরে জন্মগ্রহণ করেন, প্রকৃতির উপর দাঁড়াইয়া তাহার ভিতর স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছার দ্বারা কর্ম্ম করেন, প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ হইয়া অবশভাবে চক্রে ঘূর্ণীয়মান হন না; কারণ এখানে তিনি জ্ঞানের

সহিত কর্ম্ম করেন, অধিকাংশের ন্যায় অজ্ঞানের বশে কর্ম্ম করেন না। সকলের মধ্যে যে অধ্যাত্ম পুরুষ গুপ্তভাবে রহিয়াছেন এবং গোপন স্থান হইতে সমস্ত পরিচালনা করিতেছেন, দিব্যজন্মে তিনি সম্মুখে আসিয়া, মানবরূপকে ভগবদ্ভাবেই সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেন; সাধারণ জন্মে ইনি অন্তরালেই ঈশ্বররূপে থাকেন, অন্তরালের সম্মুখে যে বাহ্য চৈতন্য তাহা পরাধীন, স্বাধীন নহে, কারণ সেখানে উহা আংশিক চেতন সত্তা, আত্ম-বিস্মৃত জীব, প্রকৃতির বাহ্য অধীনতায় আপন কর্ম্মে বদ্ধ। অতএব, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মানবত্বের ভিতর ভাগবতভাবের সাক্ষাৎ প্রকাশই অবতার *; মানবত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিভূতি অর্জ্জুনকে গুরু এই ভাগবত জীবনের মধ্যে উঠিবার জন্যই আহ্বান করিলেন; তাঁহার সাধারণ মানবোচিত ক্ষুদ্রত্ব ও অজ্ঞান অতিক্রম করিতে না পারিলে এ অবস্থায় উঠা সম্ভব নহে। আমাদিগকে নীচে হইতে যাহার বিকাশ করিতে হইবে উপর হইতে তাহার অভিব্যক্তিই অবতার; মানবের যে দিব্য জন্মে আমাদের মত মরজগতের জীবগণকে উঠিতে হইবে, তাহার মধ্যে ভগবানের অবতরণই অবতার; সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানবত্বের ভিতর প্রকটিত এই মনোহর দিব্য আদর্শ ভগবান মানুষের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

---

* অবতার শব্দের অর্থ নামিয়া আসা, যে-রেখা ভাগবতকে মানবীয় স্তর হইতে পৃথক করিতেছে সেই রেখার নীচে নামিয়া আসাই অবতার।



অবতরণের প্রণালী

মানুষের জন্ম গূঢ় রহস্যময়। আমরা দেখিলাম গীতার মতে ভগবানের মানবরূপে অবতরণ এই রহস্যেরই আর একটা দিক,—অবতারে ভগবান মানবরূপ গ্রহণ করেন, মনুষ্যজন্মও মূলতঃ ভগবানের মানবরূপ গ্রহণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রত্যেক মানবেরই সনাতন সর্ব্বগত আত্মা ভগবান; এমন কি মানুষের ব্যষ্টিগত আত্মাও ভগবানের অংশ, মমৈবাংশ,—অবশ্য এই অংশ ভগবানের খণ্ড বা ভগ্নাংশ নহে, কারণ আমরা ভগবানকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভক্ত বলিয়া ভাবিতে পারি না; ইহা সেই এক চৈতন্যের আংশিক চৈতন্য, সেই এক শক্তির আংশিক শক্তি, এক বিরাট আনন্দের বিশ্বলীলায় আংশিক আনন্দ, অতএব বিশ্বলীলার মধ্যে সেই অনন্ত অসীম সত্তারই সসীম ও খণ্ড সত্তা। এই সসীমতার চিহ্ন হইতেছে অজ্ঞান, এই অজ্ঞানের বশে মানুষ ভুলিয়া যায় যে, সে ভগবান হইতে আসিয়াছে, এমন কি তাহারই হৃদয়ের মধ্যে গুপ্তভাবে যে ভগবান রহিয়াছেন, তাহারই মানবচৈতন্যের মন্দিরে আচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় জ্বলিতেছেন তাঁহাকেও সে ভুলিয়া যায়।

মানুষ অজ্ঞান কারণ যে প্রকৃতি বা মায়ার দ্বারা ভগবানের অনন্ত সত্তা হইতে সে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই মায়ার ছাপ তাহার অন্তরাত্মার দৃষ্টিতে, তাহার ইন্দ্রিয়সকলের উপরে রহিয়াছে; মায়া তাহাকে ভাগবত সত্তার মূল্যবান ধাতু হইতে মুদ্রার ন্যায় খোদিত করিয়াছে, কিন্তু প্রাকৃত গুণ

সমূহের খাদের দ্বারা তাহার উপর এক কঠিন আবরণ লাগাইয়া দিয়াছে, নিজের ছাপ এবং পাশবিক মনুষ্যত্বের চিহ্ন বসাইয়া দিয়াছে; যদিও সেখানে ভগবানের গুপ্ত চিহ্ন রহিয়াছে, তথাপি তাহা প্রথমে বুঝা যায় না— অনেক কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয়, আমাদের নিজেদের জীবনের গূঢ় রহস্যে সেই দীক্ষা লাভ না করিলে উহা দেখিতে পাওয়া যায় না যাহা দ্বারা ভগবদ্‌মুখী মানবের সহিত মর্ত্ত্যমুখী মানবের পার্থক্য হয়। অবতারে, ভাগবতভাবে জাত মানবে, প্রকৃত ধাতুটি আবরণের ভিতর দিয়া দীপ্তিমান হয়। সেখানে প্রকৃতির ছাপ কেবল বাহ্য রূপে, কিন্তু দৃষ্টি অন্তরস্থিত ভগবানের, শক্তি অন্তরস্থিত ভগবানের এবং তাহা গৃহীত মানবীয় প্রকৃতির আবরণকে ভেদ করিয়া বাহির হয়। সেখানে ভগবানের চিহ্ন (শারীরিক বাহ্যিক চিহ্ন নহে, আধ্যাত্মিক চিহ্ন) স্পষ্ট—যে দেখিতে চায় বা দেখিতে পারে সেই দেখিতে পায়। আসুরিক প্রকৃতির লোকেরা এই সকল ব্যাপারে সর্ব্বদা অন্ধ, তাহারা শরীরকে দেখে, আত্মাকে দেখে না, বাহিরের সত্তাকে দেখে, ভিতরের সত্তাকে দেখে না, তাহারা শুধু মুখোসটিকে দেখে, ভিতরের পুরুষটিকে দেখিতে পায় না। সাধারণ মনুষ্যজন্মে বিশ্বগত ভগবানের প্রকৃতি ভাবটাই প্রবল, অবতারের মনুষ্যজন্মে ভাগবত ভাবই প্রবল। একটিতে ভগবানের আংশিক সত্তাকে মানবীয় প্রকৃতি অধিকার করে, পরিচালিত করে (অবশ্য ভগবান এইরূপ করিতে দেন বলিয়াই করে); অপরটিতে ভগবানই নিজের অংশ সত্তা ও ইহার প্রকৃতিকে অধিকার করেন, ভাগবতভাবে পরিচালিত করেন। গীতার মতে সাধারণ মানুষ ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে উর্দ্ধে উঠিয়া যে ভাগবতভাব লাভ করে তাহা অবতার

নহে, ভগবান যখন মানবীয়তার মধ্যে সাক্ষাৎভাবে নামিয়া আসেন, মানবীয় আকার গ্রহণ করেন, তাহাই অবতার।

তবে, মানুষের এই উর্দ্ধ গতিকে, ক্রমবিবর্ত্তনকে, সাহায্য করিবার নিমিত্তই ভগবান অবতাররূপে নামিয়া আসেন; এইটি গীতা খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছে। মানুষের মধ্যে ভাগবত সত্তার প্রকাশ সম্ভব ইহা দেখাইবার জন্যই অবতার, যেন মানুষ দেখিতে পায় যে, উহা কিরূপ এবং নিজদিগকে ঐ সত্তায় পরিণত করিবার ভরসা করিতে পারে। অবতারের আরও উদ্দেশ্য হইতেছে, ভগবানের এইরূপ আবির্ভাবের প্রভাব পৃথিবীতে স্পন্দমান রাখিয়া যাওয়া এবং পার্থিব প্রকৃতির উর্দ্ধমুখী প্রয়াসকে পরিচালন করিবে এমন অধ্যাত্ম শক্তি রাখিয়া যাওয়া। দিব্য মানব কিরূপ তাহার একটা আধ্যাত্মিক ছাঁচ দেখান অবতারের উদ্দেশ্য, যেন দিব্যজীবনকামী মানব সেই ছাঁচে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারে। অবতারের উদ্দেশ্য একটি ধর্ম্ম দেওয়া, শুধু কোন এক মতবাদ নহে, কিন্তু অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন যাপনের একটা প্রণালী দেওয়া, এমন এক সাধনা দেওয়া যাহার দ্বারা মানুষ দেবত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। আবার মানুষের এই উর্দ্ধগতি, এই দেবজন্ম লাভ একটা বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টিগত ব্যাপার নহে, কিন্তু জগতে ভগবানের অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় ইহা সমষ্টিগত ব্যাপার, সমগ্র মানব জাতির উন্নতি ও কল্যাণ ইহার লক্ষ্য, অতএব অবতারের উদ্দেশ্য মানব জাতির অগ্রগমনে সাহায্য করা, সকল মহা সন্ধিক্ষণে ইহাকে রক্ষা করা, যখন নিম্নমুখী শক্তিগুলি খুব প্রবল হইয়া উঠে তখন তাহাদের ধ্বংস সাধন করা, মানুষের প্রকৃতিতে ভগবানের দিকে উঠিবার যে প্রবৃত্তি

রহিয়াছে সেই মহান ধর্ম্মকে রক্ষা করা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, জগতে যত দূরভবিষ্যতেই হউক স্বর্গরাজ্য (The Kingdom of God) স্থাপনের পথ পরিষ্কার করা, যাঁহারা আলোক ও সিদ্ধি চান (সাধূনাম্) তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করা, যাঁহারা অন্ধকার ও পাপের রাজ্যকেই অটুট রাখিতে যুদ্ধ করিতেছে তাহাদিগকে পরাজিত করা। অবতারের আগমনের এই সকল উদ্দেশ্য লোকবিদিত। অবতারের কার্য্য দেখিয়াই সাধারণ লোকে তাঁহাকে চিনিতে চায়, তাহার জন্যই তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। কেবল যাঁহারা আধ্যাত্মিক তাঁহারাই দেখিতে পান, চির-অন্তর্য্যামী ভগবান যে তাঁহাদেরই মানবীয় দেহ ও মনে নিজেকে প্রকট করিতেছেন, মানবরূপে এই বাহ্য অবতার তাহারই নিদর্শন, যেন তাঁহারা সেই ভগবানের সহিত ঐক্য লাভ করিতে পারেন এবং ভাগবত-ভাবের দ্বারা অধিকৃত হইতে পারেন। বাহ্য মানবরূপে খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ ও বুদ্ধের আবির্ভাব এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে ভগবানের চিরন্তন অবতারের আবির্ভাব মূলে একই গূঢ় সত্য। পৃথিবীতে বাহ্য মানবজীবনে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, সকল মনুষ্যের ভিতরের জীবনে তাহা পুনরায় সংঘটিত হইতে পারে।

অবতারের উদ্দেশ্য ইহাই, কিন্তু অবতরণের প্রণালী কি ? কেবল সাধারণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া অবতার সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র ধারণা করা হয়, প্রথমে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। এই মতানুসারে, কোন মনুষ্যে দেবোচিত চরিত্র, বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তির অসাধারণ প্রকাশ হইলে তাহাকেই অবতার বলা হয়। এইরূপ ধারণায় কতকটা সত্য আছে। যিনি অবতার তিনি বিভূতিও বটেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরতম ভাগবত

সত্তায় মানবরূপী ভগবান, আবার তাঁহার বাহ্য মানবীয় সত্তায় তিনি সেই যুগের নেতা, বৃষ্ণিবংশের মহাপুরুষ। ইহা প্রকৃতির দিক হইতে, কিন্তু আত্মার দিক হইতে নহে। ভগবান তাঁহার প্রকৃতির অনন্ত গুণের (qualities) ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকাশ করেন, এবং এই সকল গুণের শক্তি ও কার্য্য দেখিয়া ভগবানের প্রকাশের তারতম্য বুঝা যায়। অতএব নির্ব্যক্তিকভাবে ভগবানের বিভূতি হইতেছে তাঁহার গুণের প্রকট শক্তি ; উহা জ্ঞান, তেজ, প্রেম, বল ইত্যাদি যে-কোন রূপে ভগবানের বহিঃ প্রকাশ ; আর ব্যক্তিকভাবে, যে প্রাণ-মনোময় আধারের ভিতর দিয়া ভগবানের এই শক্তি প্রকাশিত হয় এবং মহৎ কার্য্য সম্পাদন করে তাহাই বিভূতি। ভিতরে এইরূপ অসাধারণ ভাগবত গুণের শক্তি এবং বাহিরে তাহার মহান কার্য্য—ইহাই বিভূতির চিহ্ন। ভাগবত সিদ্ধিলাভের দিকে মানব জাতির প্রচেষ্টায় যিনি নেতাস্বরূপ তিনিই মানব-বিভূতি, পাশ্চাত্য পণ্ডিত কার্লাইলের ভাষায় তিনি বীর (hero), তিনি মানুষের মধ্যে ভগবানের একটা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ১০।৩৭

"আমি বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয় (অর্জ্জুন), আমি মুনিগণের মধ্যে ব্যাস এবং ঋষি-কবিগণের মধ্যে উশনা কবি"—প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম, প্রত্যেক দলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রত্যেক শ্রেণীর বিশিষ্ট গুণ ও কর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এইরূপে শক্তির উৎকর্ষ সাধন ভাগবত প্রকাশের প্রগতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

যে-কোন মহাপুরুষ সাধারণ মানবের উপরে উঠেন, তিনি তাহার দ্বারাই মানব সাধারণকে উন্নত করেন ; আমাদের ভিতরে যে ভাগবতের সম্ভাবনা রহিয়াছে, আমাদের যে ভাগবতভাব লাভের আশা রহিয়াছে সে বিষয়ে তিনি জীবন্ত দৃষ্টান্ত, তিনি ভাগবত জ্যোতিরই একটা কিরণ, ভাগবত শক্তিরই একটী উচ্ছ্বাস।

এইজন্যই মহা মনীষী ও বীর পুরুষগণকে দেবতা বলিয়া ভাবিবার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক মানুষের মধ্যে আছে ; ভারতবাসীর মনে এরূপ ধারণা সংস্কারগত ; তাহারা মহৎ সাধু, গুরু ও ধর্ম্মপ্রচারককে সহজেই ভগবানের অংশ-অবতার বলিয়া মনে করে ; দক্ষিণ দেশীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই ভাবটি আরও পরিস্ফুট, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের কোন কোন সাধু মহাপুরুষ বিষ্ণুর প্রতীকাত্মক জীবন্ত অস্ত্র শস্ত্রের অবতার,—ইহার গভীর মর্ম্মার্থ রহিয়াছে, কারণ সকল মহাপুরুষই মানব জাতিকে উর্দ্ধদিকে লইয়া যাইবার সংগ্রামে জীবন্ত যন্ত্র ও শক্তি। যে সকল আধ্যাত্মিক মতানুসারে ভাগবত সত্তা ও প্রকৃতি এবং মানবীয় সত্তা ও প্রকৃতি এই দুইএর মধ্যে কোন অলঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই, সেই সকল মতে উল্লিখিত ভাব স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য। ইহা মানবতার মধ্যে ভাগবতের উপলব্ধি। তথাপি কিন্তু বিভূতি ও অবতার এক নহে ; নতুবা অর্জ্জুন, ব্যাস, উশনা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মত অবতার হইতেন, কেবল তাঁহাদের অবতারের ক্ষমতাই কিছু কম হইত। কেবল ভাগবত গুণ থাকিলেই হয় না ; ভগবান স্বয়ং বর্ত্তমান থাকিয়া মানবীয় প্রকৃতিকে পরিচালনা করিতেছেন, ভিতরে এই জ্ঞান থাকা চাই। গুণসকলের উৎকর্ষ সাধন ভূতগ্রামেরই অংশ, সাধারণ অভিব্যক্তিতেই এইরূপ

উর্দ্ধগতি হইয়া থাকে। কিন্তু অবতারে বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, উপর হইতে দিব্য জন্ম হয়, সনাতন সর্ব্বগত ভগবান কোন বিশেষ মানবীয় রূপের মধ্যে নামিয়া আসেন, আত্মানম্ সৃজামি, এবং তখন কেবল যবনিকার অন্তরালেই যে ভগবৎ চৈতন্য থাকে তাহা নহে, বহিঃপ্রকৃতিও সেই চৈতন্যে পূর্ণ থাকে।

অবতার সম্বন্ধে মাঝামাঝি একটা মতবাদ আছে, ইহা অধিকতর আধ্যাত্মিক; এই মতানুসারে কোন মানবীয় আত্মা নিজের মধ্যে ভগবানকে অবতীর্ণ করান এবং হয় ভগবৎ চৈতন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হ'ন অথবা ভাগবত চৈতন্যের সুযোগ্য আধার বা প্রতিচ্ছায়া হন। কতকগুলি আধ্যাত্মিক অনুভূতিলব্ধ সত্যের উপর এই মত প্রতিষ্ঠিত। মানবচৈতন্য বিকশিত ও রূপান্তরিত হইতে হইতে যখন ভাগবত চৈতন্যে পরিণত হয়, তখনই হয় মানুষে দিব্য জন্ম, ইহাই মানুষের উর্দ্ধগতি—ইহার চরমাবস্থায় ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে স্বতন্ত্র সত্তার লয় হয়। জীব নিজের ব্যষ্টিগত সত্তাকে এক অনন্ত বিশ্বব্যাপী সত্তায় ডুবাইয়া দেয়, অথবা এক বিশ্বাতীত সত্তার উচ্চতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে; পরমাত্মার সহিত, ব্রহ্মের সহিত, ভগবানের সহিত সে এক হয়, অথবা যেমন কেহ কেহ আরও চূড়ান্ত করিয়া বলেন যে, জীব অদ্বিতীয় ব্রহ্মই হইয়া যায়, ভগবান হইয়া যায়। গীতা বলিয়াছে বটে যে, জীব ব্রহ্ম হয়, ব্রহ্মভূতঃ, এবং এইরূপে পরমেশ্বরের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বাস করে। কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, গীতা কোথাও বলে নাই, জীব ভগবান বা পুরুষোত্তম হয়, যদিও গীতা বলিয়াছে যে, জীব স্বয়ং নিত্যই ঈশ্বর, ভগবানের অংশ-সত্তা, মমৈবাংশ। কারণ, এই শ্রেষ্ঠ মিলন, এই পরম পরিণতি উর্দ্ধগতিরই

একটি অংশ মাত্র ; সত্য বটে যে, প্রত্যেক জীব দিব্য জন্ম লাভ করিতে পারে, কিন্তু ইহা ভগবানের অবতরণ নহে, অবতার নহে—ইহা বড় জোর বৌদ্ধমতানুযায়ী বুদ্ধত্ব লাভ, জীবের পক্ষে বর্ত্তমান জাগতিক ব্যক্তিত্ব হইতে উঠিয়া এক অনন্ত পরাচৈতন্যে জাগ্রত হওয়া। ইহাতে অবতারের ন্যায় আভ্যন্তরীণ চৈতন্য অথবা অবতারোচিত কর্ম্ম যে থাকিবেই এমন কোন কথা নাই।

তবে এইরূপে ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়ারূপে ভগবানও আমাদের সত্তার মানবীয় অংশে প্রবিষ্ট বা আবির্ভূত হইতে পারেন, নিজেকে মানুষের প্রকৃতি, কর্ম্ম, মন, এমন কি দেহের মধ্যেও ঢালিয়া দিতে পারেন ; এবং ইহাকে অন্ততঃ আংশিক অবতার বেশই বলা যাইতে পারে। গীতা বলিয়াছে যে, ঈশ্বর হৃদ্দেশে* বাস করেন, কিন্তু তথায় তিনি থাকেন যবনিকার অন্তারালে, যোগ-মায়াসমাবৃত। কিন্তু ইহার উপরে আরও এক স্থান আছে, তাহা আমাদের মধ্যেই অবস্থিত কিন্তু তাহা আমাদের সাধারণ চেতনার অতীত—প্রাচীনেরা হইাকে স্বর্গ বলিতেন, সেখানে ঈশ্বর ও জীব উভয়ে মূলতঃ একই সত্তারূপে প্রকাশিত, কোথাও কোথাও রূপকচ্ছলে তাহাদিগকে পিতা ও পুত্র বলা হইয়াছে, ভগবান এবং তাঁহা হইতে আবির্ভূত দিব্য মানব,—উর্দ্ধের ভাগবত প্রকৃতি (The

---

* এই হৃদ্দেশ বলিতে অবশ্য সূক্ষ্ম দেহের হৃদয়ই বুঝায়, তাহা সমস্ত চিত্তাবেগ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও মানসিক চৈতন্যের গ্রন্থিস্থান (nodus), সেইখানে জীবপুরুষও অবস্থিত।

† বৌদ্ধ আখ্যায়িকায় বুদ্ধের মাতার যে-নাম তাহাতে এই রূপকটি বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

Virgin Mother),* পরা প্রকৃতি, পরা মায়া হইতে নিম্নতন বা মানবীয় প্রকৃতিতে জাত। ইহাই খৃষ্টান অবতারবাদের ভিতরের তত্ত্ব বলিয়া মনে হয়; খৃষ্টানদের ত্রিসত্তাবাদে (Trinity) পিতা এই আভ্যন্তরীণ স্বর্গবাসী; পুত্র অথবা পরাপ্রকৃতি গীতার মতানুযায়ী জীব হইয়া ভূতলে নরদেহে দিব্য মানবরূপে অবতীর্ণ; The Holy Sprit হইতেছে শুদ্ধ আত্মা, ব্রহ্মচৈতন্য, এই আত্মা বা চৈতন্যের দ্বারা পিতা ও পুত্র, ঈশ্বর ও জীব এক হন, এবং এই চৈতন্যের ভিতর দিয়া উভয়ের মধ্যে যোগ হয়; কারণ আমরা শুনি যে, শুদ্ধ আত্মা যীশুর মধে নামিয়া আসিলেন এবং এইরূপ অবতরণের ফলেই যীশুর শিষ্যগণের মধ্যেও উৰ্দ্ধের চৈতন্যের ক্ষমতাসকল নামিয়া আসিল।

কিন্তু পুরুষোত্তমের যে উর্দ্ধতন দিব্য চৈতন্য সেইটিও মানবের মধ্যে নামিয়া আসিতে পারে এবং জীবের চৈতন্য তাহাতে লয় হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে, মাঝে মাঝে তাঁহার এইরূপ রূপান্তর হইত। তাঁহার সাধারণ জীবনে তিনি কেবল ঈশ্বরের প্রেমিক ও ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মান্য করিতে দিতেন না; কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার দিব্য ভাবান্তর হইত, তিনি স্বয়ং ভগবান হইতেন এবং ভগবানের মত কথা কহিতেন, কৰ্ম্ম করিতেন, তখন তাঁহার মধ্যে ভাগবত জ্যোতি, ভাগবত প্রেম, ভাগবত শক্তি উছলিয়া পড়িত। এইরূপ অবস্থা যদি কাহারও সাধারণ অবস্থা হয়, মানবীয় আধারটি যদি কেবল সর্ব্বদা ভগবানের আবির্ভাব ও ভাগবত চৈতন্যের আধার মাত্র হয়, তাহা হইলে এই

মাঝামাঝি মতানুসারে এই অবস্থাকেই অবতার বলা যাইতে পারে ; এরূপ অবতার সম্ভব বলিয়া সহজেই মানুষের ধারণা হইতে পারে, কারণ মানুষ যদি তাহার প্রকৃতিকে এমনভাবে উন্নত করিতে পারে যে, ভগবানের সত্তার সহিত নিজের সত্তার ঐক্য অনুভব করে, নিজেকে ভগবানের চৈতন্য জ্যোতি, শক্তি, প্রেমের আধার বলিয়া অনুভব করে, নিজের ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বকে ভগবানের ইচ্ছা ও সত্তার মধ্যে হারাইয়া ফেলিতে পারে (এরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্ভব বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া থাকে)—তাহা হইলে ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সেই ভাগবত ইচ্ছা, সত্তা, শক্তি, প্রেম, জ্যোতি, চৈতন্য যে মানব জীবের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে অধিকার করিবে ইহা একান্ত অসম্ভব কিছুই নহে। আর ইহা শুধু মানুষের দিব্যজন্মে ও দিব্য প্রকৃতিতে উঠা হইবে না, ইহা মানুষের মধ্যে ভাগবত পুরুষের নামিয়া আসা হইবে, অবতার হইবে।

যাহা হউক কিন্তু গীতা আরও অনেক দূরে গিয়াছে। গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে, ভগবান স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন ; শ্রীকৃষ্ণ নিজের বহু অতীত জন্মের কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার ভাষা হইতে বুঝা যায় যে, ভগবানকে ধারণ করিবার উপযুক্ত আধারসম্পন্ন মানবের কথাই তিনি বলেন নাই, কিন্তু, ভগবানেরই বহু জন্মের কথা বলিয়াছেন, কারণ তিনি এখানে ঠিক সৃষ্টিকর্ত্তার ভাষাই প্রয়োগ করিয়াছেন, পরে যখন জগৎ সৃষ্টির কথা বলিবেন তখন তিনি এই ভাষারই প্রয়োগ করিবেন,

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ৪।৬

"আমি অজাত, অবিনশ্বর এবং সর্ব্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতির কার্য্য অধ্যক্ষরূপে পরিচালনা করিয়া স্বীয় মায়ার দ্বারা নিজেকে সৃষ্টি করি।" এখানে ঈশ্বর ও মানব জীবের কোন কথা নাই, স্বর্গীয় পিতা ও তাঁহার পুত্রের, দিব্য মানবের কোন কথা নাই, কিন্তু কেবল ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রকৃতির কথা আছে। ভগবান তাঁহার প্রকৃতির দ্বারা মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন, মানব দেহ প্রাণ মনের মধ্যে নামিয়া আইসেন, এবং এই মানবরূপের মধ্যে ভাগবত চৈতন্য ও ভাগবত শক্তি লইয়া আইসেন, তবে তিনি মানবরূপ, মানব দেহ প্রাণ মনের ভিতর দিয়াই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন; তিনি অন্তরাত্মারূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই দেহের মধ্যে সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করেন। অবশ্য সকল সময়ই তিনি উপর হইতে পরিচালনা করিয়া থাকেন, এইরূপে উপর হইতে সমগ্র প্রকৃতিকে এবং তাহার মধ্যে মানুষকেও পরিচালনা করিয়া থাকেন; ভিতর হইতেও তিনি সর্ব্বদা গুপ্ত থাকিয়া সমগ্র প্রকৃতিকে ও মানুষকে পরিচালনা করিয়া থাকেন; এখানে (অর্থাৎ, অবতারে) প্রভেদ হইতেছে এই যে, তিনি গুপ্ত নহেন, প্রকৃতি এখানে সচেতন যে, তাহার প্রভু স্বয়ং অধিবাসীরূপে উপস্থিত, এবং এখানে ভগবান উর্দ্ধ হইতে তাঁহার গোপন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা, "স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছার দ্বারা", প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন না কিন্তু সাক্ষাৎ ও সুস্পষ্ট ইচ্ছার দ্বারা প্রকৃতিকে পরিচালনা করেন। আর এখানে মধ্যস্থরূপে একজন মানুষ থাকিবার কোন স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ এখানে জীবের প্রকৃতি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া নহে পরন্তু নিজের প্রকৃতিকে, স্বাম্ প্রকৃতিম্,

অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বভূতেশ পরমেশ্বর মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মানুষের সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে এরূপ মতে বিশ্বাস করা কঠিন ব্যাপার; এবং ইহার কারণও স্পষ্ট, কারণ অবতারের মানবীয়তা, অবতার যে মানুষ তাহা স্পষ্ট ভাবেই লোকের চক্ষুতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অবতার সকল সময়েই ভাগবতভাব ও মানুষভাব, এই দুইভাব সমন্বিত; ভগবান যখন মানবরূপে অবতীর্ণ হয়েন তখন তিনি মানবীয় প্রকৃতির সমস্ত বাহ্যিক অপূর্ণতা এবং অক্ষমতাও গ্রহণ করেন এবং ইহাদিগকেই ভাগবত চৈতন্য এবং ভাগবত শক্তির উপলক্ষ্য, যন্ত্র, সহায় করিয়া তোলেন, দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের আধার করিয়া তোলেন। কিন্তু এইরূপ হওয়াই অবশ্যম্ভাবী, নতুবা অবতারের আগমনের যে উদ্দেশ্য তাহা সম্পন্ন হয় না; কারণ ঐ উদ্দেশ্য ঠিক ইহাই দেখান যে, মানব জন্ম ইহার সকল অপূর্ণতা সত্ত্বেও দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের সহায় ও যন্ত্র হইতে পারে, মানব চৈতন্য ভাগবত চৈতন্য প্রকাশের মূলতঃ বিরোধী নহে, মানব চৈতন্যকে ভাগবত চৈতন্যের প্রকাশের আধার করা যাইতে পারে, মানব চৈতন্যের ছাঁচের রূপান্তর সাধন করিয়া এবং ইহার জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ও বিশুদ্ধতার উন্নতি করিয়া ইহাকে ভাগবত চৈতন্যের অনুবর্ত্তী করিয়া তোলা যাইতে পারে; কেমন করিয়া ইহা সম্পাদন করা যাইতে পারে তাহাও দেখান অবতারের উদ্দেশ্য। অবতার যদি কেবল অলৌকিক ভাবেই কার্য্য করেন, তাহা হইলে অবতারের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। কেবল অলৌকিক বা অতি-প্রাকৃত অবতার একটা অর্থহীন অসঙ্গত ব্যাপার।

একেবারেই যে কোনরূপ অলৌকিক ক্রিয়া থাকিতে পাইবে না এমন কোন কথা নাই (যীশুখ্রীষ্টের রোগ আরোগ্য করিবার এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলিয়া শুনা যায়), কারণ এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা মানুষেরই পক্ষে অসম্ভব কিছুই নহে। ইহা অবতারের অপরিহার্য্য ব্যাপার নহে ; আবার, অবতারের জীবন কেবল আলৌকিক আতস বাজি প্রদর্শন হইলেও চলিবে না। অবতার একজন আশ্চর্য্যকর্ম্মা বাজীকরের মত আসেন না, তিনি আসেন মানব জাতির দিব্য নেতা স্বরূপ, তিনি আসেন দিব্য মানবতার আদর্শ স্বরূপ। এমন কি তাঁহাকে মানবোচিত দুঃখ এবং শারীরিক যন্ত্রণাও গ্রহণ করিতে হইবে এবং দেখাইতে হইবে, প্রথমতঃ, কেমন করিয়া এই দুঃখ যন্ত্রণাকেই মুক্তির সহায় করা যাইতে পারে (যীশুখৃষ্ট এইরূপ করিয়াছিলেন) ; দ্বিতীয়তঃ, দেখাইতে হইবে যে, কেমন করিয়া ভাগবত সত্তা মানবীয় প্রকৃতিতে এই দুঃখ যন্ত্রণা স্বীকার করিয়াও মানবীয় প্রকৃতিতেই তাহা জয় করিতে পারে, বুদ্ধ এইরূপ করিয়াছিলেন। যে সকল তার্কিক খ্রীষ্টকে বলিতে পারে—"যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তাহা হইলে ক্রশ হইতে নামিয়া আইস," অথবা, যাহারা বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া দেখাইয়া দেয় যে, অবতারেরা কখনও ভগবান হইতে পারে না কারণ তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং সে মরণ আবার রোগের দ্বারা হইয়াছে, যেমন কুকুর বিড়াল মরে—তাহারা অবতারের মূল উদ্দেশ্য কিছুই বুঝে নাই। দিব্য আনন্দের অবতার হইবার পূর্ব্বে, দুঃখ ও যন্ত্রণারও অবতার হইতেই হইবে। মানুষের অপূর্ণতা গ্রহণ করিয়াই দেখাইতে হইবে কেমন করিয়া তাহা অতিক্রম করা যায় ; এবং এই অতিক্রম কতখানি

হইবে এবং কি উপায়ে হইবে, কেবল আন্তরিক হইবে, না, বাহ্যিকও হইবে তাহা মানব জাতির ক্রমোন্নতির অবস্থার উপরে নির্ভর করে; ইহা কোনও অমানুষিক অদ্ভূত ঘটনার দ্বারা সম্পাদন করা চলিতে পারে না।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, ভগবান কিরূপে মানব দেহ ও মন গ্রহণ করেন? এই প্রশ্নটিই বাস্তবিক কঠিন, মানুষের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ইহার কোন কিনারা করিতে পারে না। কারণ, এই দেহ ও মন সহসা পূর্ণভাবে সৃষ্ট হয় নাই, এগুলি কোন প্রকার শারীরিক বা আধ্যাত্মিক বা উভয়বিধ বিবর্ত্তনের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। অবশ্য এটা সত্য যে, অবতারের আবির্ভাব (অন্যদিক হইতে দিব্য জন্মের ন্যায়ই) মূলতঃ একটা অধ্যোত্মিক ব্যাপার—গীতার ভাষা হইতেই বুঝা যায় যে, ইহা আত্মার জন্ম, আত্মানম্ সৃজামি; তথাপি ইহার সঙ্গে এখানে শারীরিক জন্মও রহিয়াছে। তাহা হইলে অবতারের এই মানবীয় দেহ ও মন কেমন করিয়া সৃষ্ট হইল? যদি আমরা ধরিয়া লই যে, অচেতন প্রকৃতি এবং তাহাতে অনুস্যূত প্রাণ-শক্তির দ্বারা বংশানুক্রম বিবর্ত্তনের ফলেই শরীর সকল সময়ে সৃষ্ট হয়, জীবাত্মা ইহাতে কিছু করে না, তাহা হইলে ব্যাপারটা খুব সহজ হইয়া পড়ে। ভগবানের অবতারের যোগ্য শারীরিক ও মানসিক দেহ কোন উচ্চ বা পবিত্র বংশে উদ্ভূত হয়; অবতরণকালে ভগবান সেই দেহ অধিকার করেন। কিন্তু গীতা যেখানে অবতারের কথা বলিয়াছে (৪র্থ অধ্যায়, ৫-৮ শ্লোক) সেখানে অকুণ্ঠিত ভাবে অবতারেরও জন্মান্তরের কথা বলিয়াছে (৪।৫), আর সাধারণ জন্মান্তর-বাদ অনুসারে জীব জন্মান্তর গ্রহণ কালে তাহার অতীত আধ্যাত্মিক

ও মানসিক বিবর্ত্তনের দ্বারা নিজেই নিজের শরীর ও মন ঠিক করিয়া লয়, এক রকম প্রস্তুত করিয়াই লয়। জীবই নিজের দেহ তৈয়ারী করিয়া লয়; জীবের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়া তাহার দেহ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয় না। তাহা হইলে কি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, নিত্য ও নিরন্তর এক অবতার নিজেই ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারা পুনঃ পুনঃ নিজের উপযুক্ত মানসিক ও শারীরিক দেহের বিকাশ করিয়া লয়েন, এই দেহ কোন যুগে কিরূপ হইবে তাহা সেই যুগের মানব-জাতির প্রয়োজন ও ক্রমোন্নতির অবস্থা অনুসারে নির্ণয় করেন এবং এইরূপেই তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন? এইরূপ কোন এক ভাবেই কেহ কেহ বিষ্ণুর দশাবতারের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—প্রথমে নানা পশুমূর্ত্তি, তাহার পর নরসিংহ মূর্ত্তি, তাহার পর বামন মূর্ত্তি, তাহার পর দুর্দ্ধর্ষ আসুরিক মানব পরশুরাম, তাহার পর দেব-প্রকৃতি মানব মহত্তর রাম, তাহার পর প্রবুদ্ধ আধ্যাত্মিক মানব বুদ্ধ, কাল হিসাবে বুদ্ধের পূর্ব্বে কিন্তু স্থান হিসাবে সর্ব্বোচ্চ হইতেছেন পূর্ণ দেবভাবাপন্ন মানব শ্রীকৃষ্ণ। কল্কি শ্রীকৃষ্ণের পরে হইলেও, তিনি শুধু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আরব্ধ কর্ম্মই সম্পন্ন করেন,—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারেরা যে মহৎ প্রয়াসের সম্ভাবনা সকল প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, কল্কি তাহাই শক্তিতে সিদ্ধ করেন। বর্ত্তমান যুগের যেরূপ মনোভাব তাহাতে এই সকল বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন, কিন্তু গীতার ভাষা এইরূপই বুঝায় বলিয়া মনে হয়। তবে গীতা যখন স্পষ্টভাবে এই সমস্যার সমাধান করে নাই, তখন আমরা আমাদের মনের মতন যেমন হয় সমাধান করিতে পারি; যথা, আমরা বলিতে পারি যে, জীবই (জীবাত্মাই) শরীর প্রস্তুত করে কিন্তু জন্ম হইতেই

ভগবান ঐ শরীর গ্রহণ করেন, অথবা গীতায় যে চারি মনুর (চত্বারঃ মনবঃ) কথা বলা হইয়াছে (ইহারা প্রত্যেক মানব ও শরীরের আধ্যাত্মিক পিতা) তাহাদের এক জনই অবতারের যোগ্য শরীর প্রস্তুত করিয়া দেন। কিন্তু এ সকল অধ্যাত্ম রহস্যের (mystic) কথা বর্ত্তমান বুদ্ধিপন্থী লোক এখনও শুনিতে চায় না; কিন্তু যখনই আমরা অবতারবাদ স্বীকার করিয়াছি তখনই আমরা অধ্যাত্ম জগতের কথাই তুলিয়াছি এবং একবার যখন এই কথা তোলা হইয়াছে তখন দৃঢ়তার সহিত ইহার আলোচনা করাই বাঞ্ছনীয়।

অবতার সম্বন্ধে গীতার মত কি তাহা বলা হইল। আমরা অবতারের সম্ভাবনা যেরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি, অবতরণের প্রণালীও সেইরূপভাবে আলোচনা করিলাম, কারণ মানুষের তর্কবুদ্ধি এ সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি তুলিতে পারে তাহার হিসাব লওয়া এবং তাহার জবাব দেওয়া প্রয়োজন। সত্য বটে যে, গীতাতে বাহ্যিক অবতারের (physical avatarhood) স্থান খুব বেশী নহে, তথাপি গীতাশিক্ষার ক্রম পরম্পরায় বাহ্যিক অবতারবাদের এক বিশিষ্ট স্থান আছে, গীতাশিক্ষার কাঠামোই এই—অবতার বিভূতিকে, মানবতার উচ্চতম স্তরে উঠিয়াছে এমন একজন মানবকে দিব্যজন্ম ও দিব্যকর্ম্মের অভিমুখে লইয়া যাইতেছেন। আর ইহাও সত্য যে, মানবাত্মাকে নিজের মধ্যে তুলিয়া লইবার নিমিত্ত ভগবানের আভ্যন্তরীণ অবতরণই প্রধান ব্যাপার—অন্তরের, ভিতরের খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ বা বুদ্ধ লইয়াই কথা। কিন্তু যেমন আভ্যন্তরীণ জীবন বিকাশের নিমিত্ত বাহ্যিক জীবনের সহায়তা সমধিক প্রয়োজনীয়, তেমনই ভিতরে এই মহান্ আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির

নিমিত্ত বাহ্যিক অবতারও কম প্রয়োজনীয় নহে। মানসিক ও শারীরিক প্রতীকের পূর্ণ বিকাশের দ্বারা আভ্যন্তরীণ সত্য বস্তুর বিকাশে সহায়তা হয়; পরে এই আভ্যন্তরীণ বস্তু আরও শক্তির সহিত, নিজের আরও উৎকৃষ্ট রূপে বাহ্যজীবনের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপে মানসিক ও শারীরিক রূপ আধ্যাত্মিক সত্তার উপর ক্রিয়া করে, আবার আধ্যাত্মিক সত্তা মানসিক ও শারীরিক রূপের উপর ক্রিয়া করে—এই দুইয়ের পরস্পরের উপর সতত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া ভগবান কখনও নিজেকে গোপন করিয়া কখনও প্রকট হইয়া মানবতার মধ্যে ভাগবতের বিকাশ সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন।

দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম

অবতারের জন্মের ন্যায় অবতারের কর্ম্মেরও দুই অর্থ এবং দুই রূপ আছে। ক্রমান্বয়ে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার, উত্থান পতনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম, এই নিয়ম সত্ত্বেও যে দিব্য ধর্ম্ম মানব জাতির ভগবদ্মুখী প্রয়াসের নিশ্চিত অবনতি প্রতিরোধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নিশ্চিত ভাবে তাহাকে অগ্রসর করাইয়া দেয়, ভাগবত শক্তি বাহ্য জগতের উপর ক্রিয়া করিয়া সেই ধর্ম্মকে রক্ষা করে, নূতন করিয়া গঠন করিয়া দেয়,—ইহাই অবতারের কর্ম্মের বাহিরের দিক। অবতারের কর্ম্মের একটা ভিতরের দিক আছে; ভাগবতমুখী চৈতন্যের দিব্যশক্তি ব্যক্তির আত্মার উপর ও জাতির আত্মার উপর ক্রিয়া করে, যেন তাহা মানুষের মধ্যে ভাগবতের নব নব প্রকাশ গ্রহণ করিতে পারে এবং নিজের বিকাশের শক্তিতে বিধৃত, পুনরুজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। সাধারণ কর্ম্মপ্রবণ মানুষ স্বভাবতঃই মনে করে যে কেবল বাহ্যজগতে একটা মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্তই অবতারের আবির্ভাব হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরূপ ধারণা ঠিক নহে। বাহ্যিক কর্ম্ম এবং ঘটনার নিজস্ব কোন মূল্য নাই, তাহাদের পশ্চাতে যে শক্তি ও ভাব থাকে তাহা হইতেই তাহাদের মুল্য।

যে-সন্ধিক্ষণে অবতারের আবির্ভাব হয়, তাহা বাহ্য ঘটনার এবং জড় জগতে মহাপরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণ বলিয়াই বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যখন মানব জাতির চৈতন্যের কোন মহাপরিবর্ত্তন

সংসাধন করিতে হয় এবং কোন নূতন বিকাশ সম্পন্ন করিতে হয়, মূলতঃ সেই সন্ধিক্ষণেই অবতারের আবির্ভাব হয়। এই পরিবর্ত্তন সাধনের নিমিত্ত একটা দিব্য শক্তির প্রয়োজন; কিন্তু সকল সময়েই এই শক্তি হয় ইহার অন্তর্নিহিত চৈতন্যের অনুযায়ী; এই জন্যই মানবীয় মন ও আত্মার মধ্যে ভাগবত চৈতন্যের আবির্ভাব আবশ্যক। তবে, যখন প্রধানতঃ কেবল মানসিক ও ব্যবহারিক জগতের পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে হয় তখন অবতারের হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন হয় না; তখন চৈতন্যের মহান অভ্যুত্থান হয়, সমুচ্চ শক্তির প্রকাশ হয়, মানুষ তৎকালের নিমিত্ত তাহাদের সাধারণ স্তর হইতে উর্দ্ধে উঠে; এবং চৈতন্য ও শক্তির এই অভ্যুদয় কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিতে উচ্চসীমায় উঠে; ইহারাই বিভূতি, এবং ইঁহাদের নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত সাধারণ কর্ম্মধারাই অভিপ্রেত পরিবর্ত্তনটি সাধনের পক্ষে যথেষ্ট। ইউরোপে রিফর্মেশন (Reformation) এবং ফরাসী বিপ্লব (French Revolution) ছিল এইরূপই পরিবর্ত্তন; এগুলি মহান আধ্যাত্মিক ঘটনা নহে, এগুলি কেবল বুদ্ধি ও কর্ম্মজগতের পরিবর্ত্তন—একটি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, অপরটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাব ও রূপ ও আদর্শের পরিবর্ত্তন; ইহাদের ফলে সাধারণ চৈতন্যে যে-পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা মানসিক ও ব্যবহারিক পরিবর্ত্তন কিন্তু আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন নহে। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া যুগান্তর আনয়ন করা উদ্দেশ্য হয় তখন ইহার উদ্ভাবক বা নেতারূপে মানবীয় মন ও আত্মার মধ্যে ঐশ্বরিক চৈতন্যের পূর্ণ বা আংশিক আবির্ভাব হয়। ইহাই অবতার।

গীতায় অবতারের বাহ্যিক কর্ম্ম বলা হইয়াছে, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় : যুগে যুগে যখন ধর্ম্ম মলিন হয়, অবসন্ন হয়, হীনবল হয়, অধর্ম্ম সবল ও অত্যাচারী হইয়া মাথা তুলিয়া উঠে তখন অবতার আবির্ভূত হন এবং ধর্ম্মকে পুনরায় প্রবল ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ; এবং যেহেতু তখন ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মের ভিতর দিয়া, মানুষের ভিতর দিয়াই প্রকট হয়, তজ্জন্য অবতারের লৌকিক ও বাহ্যিক উদ্দেশ্য হয় অধর্ম্মের পীড়নে অভিভূত সাধুগণকে পরিত্রাণ করা এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সহায়ক দুষ্কর্ম্মকারী-দিগকে বিনাশ করা,

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৪।৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪।৮

কিন্তু এখানে গীতা যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছে সহজেই তাহার এমন সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যাহাতে অবতারত্বের গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে। ধর্ম্ম শব্দটির একটি নৈতিক অর্থ আছে, একটি দার্শনিক অর্থ আছে এবং একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে—এই সকল অর্থের যে কোন একটি লইয়া এবং অপরগুলি অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্ম শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে, ধর্ম্ম কেবল নৈতিক (ethical) অর্থে অথবা কেবল দার্শনিক (philosophical) অর্থে অথবা কেবল আধ্যাত্মিক (religious) অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। ধর্ম্ম শব্দের নৈতিক অর্থ হইতেছে সৎকর্ম্মের নীতি, ন্যায্য আচরণের বিধান, অথবা আরও বাহ্যিক ও ব্যবহারিক অর্থে ধর্ম্মের নৈতিক অর্থ হইতেছে সামাজিক এবং রাজ-

নৈতিক ন্যায়ের বিধান; অথবা আরও সংক্ষেপে এই অর্থে ধর্ম্ম হইতেছে কেবল সমাজের অনুশাসন পালন। ধর্ম্মের এই অর্থ গ্রহণ করিলে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, যখন অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সজ্জনগণকে রক্ষা করিতে এবং অসজ্জনগণকে বিনাশ করিতে, অন্যায় অত্যাচার ধ্বংস করিয়া মানব সমাজে ন্যায় ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠা করিতে অবতার আবির্ভূত হন।

এইরূপে পুরাণে কৃষ্ণাবতারের প্রয়োজন বর্ণনা করা হইয়াছে—কুরুদের অসৎকর্ম্মের ভার পৃথিবীর পক্ষে এত দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িয়াছিল যে পৃথিবী তাহার ভারের লাঘব করিতে ভগবানের অবতার প্রার্থনা করিয়াছিল, তাই বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, অত্যাচারিত পাণ্ডবগণকে উদ্ধার করেন এবং দুষ্কর্ম্মী কৌরবগণকে বিনাশ করেন। বিষ্ণুর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের প্রয়োজনও এই ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে—রাবণের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে রাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়-গণের অন্যায় উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে পরশুরাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দৈত্য বলীর শাসন ধ্বংস করিতে বামন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপে কেবল নৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধিই অবতারের উদ্দেশ্য বলিয়া পুরাণাদিতে যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে অবতার ব্যাপারের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় নাই, ইহা সহজেই বুঝা যায়। এরূপ বর্ণনায় অবতারের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের কথা ধরা হয় নাই, এবং এইরূপ বাহ্য প্রয়োজনই যদি সব হইত তাহা হইলে খৃষ্ট ও বুদ্ধকে অবতারের পর্য্যায় হইতে বাদ দিতে হইত, কারণ সাধুগণের পরিত্রাণ ও অসাধুগণের বিনাশ মোটেই তাহাদের লক্ষ্য ছিল না, তাঁহারা

আনিয়াছিলেন সকল মানবের জন্য এক নূতন আধ্যাত্মিক বাণী, দিব্য বিকাশ ও অধ্যাত্ম সিদ্ধির এক অভিনব নীতি। আবার অন্যপক্ষে যদি আমরা ধর্ম্ম শব্দের শুধু আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করি, ধর্ম্ম বলিতে, কেবল আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্ম জীবনের নীতি মাত্র বুঝি, তাহা হইলে আমরা অবতার ব্যাপারের মূল সত্যটি ধরি বটে, কিন্তু অবতারের কর্ম্মের একটা বিশেষ আবশ্যকীয় দিক বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। ভগবানের অবতারের ইতিহাসে সকল সময়েই আমরা দুই প্রকারের কর্ম্ম দেখিতে পাই এবং এইরূপই হইবার কথা কারণ অবতার জগতের মধ্যে ভগবানের কার্য্যেরই ভার গ্রহণ করেন, জগতে ভগবানের ইচ্ছা ও জ্ঞানেরই অনুসরণ করেন, এবং এই কার্য্যের সর্ব্বদাই দুইটা দিক, একটি হইতেছে অন্তর্জগতে আত্মার উন্নতি সাধন, অপরটি হইতেছে মানব সমাজের, মানব জীবনের বাহ্য পরিবর্ত্তন সাধন।

কোন মহান্ আধ্যাত্মিক গুরু ও ত্রাণ-কর্ত্তারূপে, খৃষ্ট বা বুদ্ধরূপে অবতার আবির্ভূত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পার্থিব প্রকাশ কাল শেষ হইবার পরে তাঁহার কর্ম্মের ফলে মানব জাতির কেবল নৈতিক জীবন নহে, কিন্তু সামাজিক ও বাহ্যিক জীবন ও আদর্শেরও গভীর ও শক্তিশালী পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। আবার অন্যপক্ষে তিনি দিব্য জীবন, দিব্য ব্যক্তিত্ব, দিব্য শক্তি লইয়া রাম বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বাহ্যতঃ সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন; কিন্তু এরূপ অবতারের ফল সকল সময়েই মানবজাতির আভ্যন্তরীণ জীবন গঠন ও দিব্যজন্মলাভে চিরস্থায়ীভাবে সহায়তা করিয়া থাকে। বড়ই রহস্যের কথা যে, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের

স্থায়ী, জীবন্ত, ব্যাপক ফল হইয়াছে নৈতিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, এমন কি যে সকল যুগ ও জাতি এই দুই ধর্ম্মের তত্ত্বকথা, সাধনা ও অনুষ্ঠান বর্জ্জন করিয়াছে তাহারও ইহাদের সামাজিক ও নৈতিক ও ব্যবহারিক আদর্শে প্রভাবিত হইয়াছে। বুদ্ধ, বুদ্ধের সঙ্ঘ এবং ধর্ম্ম পরবর্ত্তী হিন্দু ধর্ম্ম কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বটে কিন্তু হিন্দুর জীবনে, হিন্দুর ধ্যান ধারণায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের প্রভাব যে ছাপ মারিয়া দিয়াছে তাহা কখনও মুছিবার নহে; আর বর্ত্তমান ইউরোপ নামে খৃষ্টান হইলেও বাস্তবিক পক্ষে খৃষ্ট ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান ইউরোপের মানব ধর্ম্ম (humanitarianism) হইতেছে নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে খৃষ্ট ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকলের প্রয়োগ, আর তাহাদের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ হইতেছে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐ সকল অধ্যাত্ম সত্যের প্রয়োগ ; বিশষতঃ যাহারা তীব্রভাবে খৃষ্ট ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং যে যুক্তিপন্থী যুগ মুক্তিলাভের প্রয়াসে খ্রীষ্ট ধর্ম্মমতকে প্রত্যাখ্যান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের দ্বারাই ঐ সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ গৃহীত হইয়াছে। অন্যদিকে রাম ও কৃষ্ণের যুগের কোন ইতিহাস নাই, কেবল কাব্য ও পুরাণের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাদের কার্য্যাবলীর পরিচয় পাই এবং এই সকলকে আমরা কাল্পনিক বলিয়াও ধরিতে পারি ; কিন্তু তাঁহাদের জীবনকে আমরা কাল্পনিক বলিয়াই ধরি অথবা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই গ্রহণ করি তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, কারণ ব্যক্তির ও জাতির আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁহাদের দিব্য আদর্শের প্রভাব চিরস্থায়ী হইয়াই রহিয়াছে। অবতার দিব্য জীবন ও চৈতন্যের ব্যাপার, কোন

বাহ্য কর্ম্ম সম্পাদনেই ইহা প্রকট হইতে পারে, কিন্তু এই কর্ম্ম শেষ হইবার পরও ইহার আধ্যাত্মিক প্রভাব বরাবর থাকিবেই; অথবা ইহা প্রকট হইতে পারে কোন ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া, আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করিয়া; কিন্তু এই নূতন ধর্ম্ম বা সাধনার উপযোগিতা যখন শেষ হইয়া যাইবে তখনও মানব জাতির চিন্তা, প্রকৃতি ও বাহ্য জীবনে ইহার চিরস্থায়ী প্রভাব থাকিবেই।

অতএব অবতারের কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতার মত বুঝিতে হইলে ধর্ম্ম শব্দের সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণ, গভীর এবং ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, যে বাহ্য এবং অভ্যন্তরীণ নিয়মের দ্বারা ভাগবত ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন করে, জাতির জীবনে ইহার পরিবেষ্টন ও পরিমাণ সম্পাদন করিয়া দেয় তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভারতে ধর্ম্ম বলিতে কেবল সদসৎ কর্ম্মের নীতি, ন্যায় অন্যায়ের বিধান, নৈতিক অনুশাসন বুঝায় না; বাহ্য ও অন্তর্জগতে নানা রূপ, নানা কর্ম্ম, নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া এক ভাগবত তত্ত্ব নিজেকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, সেই দিক দিয়া মানুষের সহিত ভগবানের, প্রকৃতির ও অন্যান্য জীবের সকল প্রকার সম্বন্ধ যে নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় সেই সমগ্র অনুশাসনই ধর্ম্ম। আমরা যাহাকে ধরিয়া থাকি এবং যাহা আমাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কার্য্যাবলীকে ধরিয়া রাখে—এই দুইই ধর্ম্ম*। ধর্ম্ম শব্দের প্রাথমিক অর্থ আমাদের প্রকৃতির মূল নীতিকে বুঝায়, ইহা অলক্ষ্যে আমাদের সমস্ত কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে, এবং এই অর্থে প্রত্যেক জীব, শ্রেণী, জাতি, ব্যক্তি বা সঙ্ঘের স্ব স্ব ধর্ম্ম আছে।

* ধৃ ধাতু হইতে "ধর্ম্ম" শব্দের উৎপত্তি এবং ইহার অর্থ "ধরা"।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের মধ্যে ভাগবত প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইবে, যে সকল অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার দ্বারা সেই ভাগবত প্রকৃতি আমাদের সত্তায় বিকশিত হইয়া উঠে তাহাদের নীতিকে ধর্ম্ম বলা যায় এবং ইহাই ধর্ম্ম শব্দের দ্বিতীয় অর্থ। আবার, আমাদের বহির্ম্মুখী চিন্তা ও কর্ম্ম এবং আমাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ যে বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া ভাগবত আদর্শের দিকে আমদের নিজেদের এবং সমগ্র মানবজাতির বিকাশকে সর্ব্বোত্তমভাবে সাহায্য করা হয়, তাহাকেও ধর্ম্ম বলা যায়, ইহাই ধর্ম্ম শব্দের তৃতীয় অর্থ।

ধর্ম্মকে সাধারণতঃ সনাতন ও অপরিবর্ত্তনশীল বলা হয়; ধর্ম্মের মূল নীতি, আদর্শ এইরূপই বটে, কিন্তু ইহার রূপের পরিবর্ত্তন ও বিকাশ সকল সময়েই চলিতেছে, কারণ মানুষ এখনও সেই আদর্শে পৌছিতে পারে নাই বা এখনও তাহার মধ্যে বাস করে নাই, কিন্তু সেই আদর্শকে কোন রকমে লক্ষ্য করিয়াই চলিয়াছে, তাহাকে জানিবার জন্যএবং জীবনে তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য ক্রমশঃ তৈয়ারী হইয়া উঠিতেছে। এই বিকাশে যাহা কিছু আমাদিগকে দিব্য শুচিতা, উদারতা, জ্যোতি, স্বাধীনতা, তেজ, শক্তি, আনন্দ, প্রেম, শুভ, ঐক্য ও সৌন্দর্য্যে বাড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে সেই সবই ধর্ম্ম, এবং যাহা কিছু ইহার বিরুদ্ধ, ইহার প্রতিবন্ধক তাহাই অধর্ম্ম, তাহা লইয়া আইসে বিকৃতি ও বিরোধ, অশুচিতা, সঙ্কীর্ণতা, বন্ধন, অন্ধকার, দুর্ব্বলতা, নীচতা, দ্বন্দ্ব, দুঃখ ও অনৈক্য; উন্নতির পথে মানুষকে এই সবই ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এই অধর্ম্ম ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, ধর্ম্মকে পরাভূত করিতে চায়, আমাদিগকে পিছনের দিকে, নীচের দিকে টানে,—

অশুভ, অজ্ঞান ও অন্ধকারের দিকে লইয়া যাইতে চায়। এই দুইয়ের মধ্যে অনবরত দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চলিতেছে, কখনও ধর্ম্মের শক্তির জয় হইতেছে কখনও অধর্ম্মের শক্তির জয় হইতেছে। বেদে ইহা দেবাসুর সংগ্রামের রূপকের ভিতর দিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই জোরোয়াষ্ট্রীয়ান (Zoroastrianism) ধর্ম্মে আহুরমাজ্‌দা ও অহিমানের সংগ্রামরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই পরবর্ত্তী ধর্ম্মসমূহে মানবজীবন ও মানবাত্মাকে অধিকার করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর ও সয়তান বা ইব্‌লিসের সংগ্রামরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই সবের দ্বারাই অবতারের কর্ম্ম নির্ণীত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিধান মত সাধক তাহার মুক্তিপথের বিরোধী ব্যাপার সমূহ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ধর্ম্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধ এই তিন শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। সেইরূপ খৃষ্ট ধর্ম্মেও আমরা খৃষ্টানুযায়ী জীবন যাপনের ধর্ম্ম, চার্চ্চ এবং খৃষ্ট এই তিনটি দেখিতে পাই। এই তিনটি সকল অবতারেরই কর্ম্মের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তিনি একটি ধর্ম্ম দেন, সাধনার এক ধারা দেন—তাহার সাহায্যে নীচের জীবন হইতে উচ্চ জীবন লাভ করা যায়; কর্ম্ম সম্বন্ধে বিধি এবং অন্যান্য মনুষ্য ও জীবের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ এই ধর্ম্মেরই অঙ্গ—অষ্টাঙ্গমার্গ, অথবা শুদ্ধ প্রেম ও শুচিতার ধর্ম্ম অথবা এইরূপ অন্য কোন ভাবে জীবনে ভাগবত ভাবের প্রকাশ। তাহার পর তিনি সঙ্ঘের স্থাপনা করেন, তাঁহাকে কেন্দ্ররূপে আশ্রয় করিয়া ও তাঁহার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যাহারা একত্রিত হয় তাহাদের মধ্যে সখ্য ও একতা স্থাপন করেন, কারণ মানুষের সকল চেষ্টারই যেমন একটা ব্যষ্টির দিক আছে তেমনই একটা সমষ্টির দিকও আছে এবং যাহারা

একই পথের অনুসরণ করে তাহারা স্বাভাবতঃই পরস্পরের সহিত আধ্যাত্মিক সাহচর্য্য ও একতায় বদ্ধ হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব ধর্ম্মেও এই তিন আছে, ভাগবত, ভক্ত, ভগবান,—বৈষ্ণব মতানুযায়ী ভক্তি ও প্রেমের ধর্ম্মই ভাগবত, যাহাদের মধ্যে এই ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের সঙ্ঘই ভক্ত, যাঁহার সত্তা ও প্রকৃতিতে এই ভাগবত প্রেমের প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ পরিণতি সেই পরম প্রেমাস্পদই ভগবান। অবতার এই তৃতীয়টির প্রতিনিধি, অবতারই সেই দিব্যপুরুষ ও সত্তা যিনি সঙ্ঘ ও ধর্ম্মের প্রাণ, তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বারা সঙ্ঘ ও ধর্ম্মকে অনুপ্রাণিত করেন, জীবিত রাখেন এবং মনুষ্যগণকে আনন্দ ও মুক্তির দিকে আকৃষ্ট করেন।

গীতায় এই তিনটিই আরও উদার* অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। কারণ গীতায় যে ঐক্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা বেদান্তমতানুযায়ী সর্ব্বগত ঐক্য—তাহার দ্বারা আত্মা নিজকে সর্ব্বভূতে এবং নিজের মধ্যেই সর্ব্বভূতকে দেখে এবং সকলের সহিত নিজেকে এক করিয়া লয়। অতএব, মানুষের সকল প্রকার সম্বন্ধকে লইয়া উচ্চ ভাগবতভাবের মধ্যে উত্তোলন করাই এখানে ধর্ম্ম; ঐ ধর্ম্ম সমষ্টিজীবনের ভিত্তি-স্বরূপ প্রচলিত নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধান লইয়া আরম্ভ করে এবং উহাকে ব্রাহ্মী চৈতন্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উন্নীত করে; গীতার নীতি হইতেছে ঐক্য, সাম্য, ঈশ্বর-প্রণোদিত মুক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম, ভগবৎ জ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের দ্বারা সকল প্রকৃতি, সকল

---

* বাস্তবিক পক্ষে গীতার শিক্ষা অন্যান্য বিশিষ্ট সাধনা ও শিক্ষা অপেক্ষা উদার ও বহুমুখী।

৮

কর্ম্মকে অনুপ্রাণিত করা, উহাকে দিব্য জীবন, দিব্য চৈতন্যের দিকে লইয়া যাওয়া, এবং ঐ জ্ঞান ও কর্ম্মের পরম শক্তি ও পরিণতিস্বরূপ ভগবদ্ প্রেম। প্রেম ও ভক্তির দ্বারা ভগবান লাভের সাধনার কথা গীতা যেখানে বলিয়াছে, সেইখানেই ভাগবত ভক্তদের সখ্যতা ও পরস্পরকে ভগবান লাভে সহায়তা করার ভাবও আসিয়াছে এবং ইহাই সঙ্ঘের ভিত্তি; কিন্তু গীতার শিক্ষা অনুসারে প্রকৃত সঙ্ঘ হইতেছে সমগ্র মানব জাতি। সমগ্র জগত এই ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতেছে, যাহার যেমন ক্ষমতা সে সেই ভাবেই চলিতেছে—

"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"

সাধক সকলের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিতে, তাহাদের সুখ দুঃখ, তাহাদের সমগ্র জীবন নিজের করিয়া লইতে সাধনা করেন; আর যে মুক্ত সিদ্ধ পুরুষ সর্ব্বভূতের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি সকল মানবজাতির জীবনের মধ্যে বাস করেন, মানবজাতির এক অদ্বিতীয় আত্মার জন্য, সর্ব্বভূতে যে ঈশ্বর রহিয়াছেন তাঁহার জন্য জীবন ধারণ করেন, লোক-সংগ্রহের নিমিত্ত, সকলকে স্বধর্ম্মে ও ভাগবত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার নিমিত্ত, সকলকে সকল পথ এবং সকল অবস্থার ভিতর দিয়া ভগবানের অভিমুখে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কর্ম্ম করেন। গীতায় অবতার শ্রীকৃষ্ণের নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি এই অবতারের উপরই সব ঝোঁক দেন নাই, কিন্তু এই অবতার যাঁহার প্রতিনিধি সেই পুরুষোত্তমের উপরেই ঝোঁক দিয়াছেন, সকল অবতার এই পুরুষোত্তমেরই নর জন্ম, মানুষ যে সকল নাম ও রূপে ভগবানের

পূজা করিয়া থাকে সে সব এই পুরুষোত্তমেরই প্রতিমা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে পন্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার দ্বারাই মানুষ প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত মুক্তি লাভ করিতে পারে, এই কথা বলা হইয়াছে বটে কিন্তু এই পন্থা অন্যান্য পন্থা হইতে স্বতন্ত্র নহে, অন্যান্য সকল পন্থাই ইহার অন্তর্গত। কারণ ভগবানের সর্ব্বব্যাপী সত্তার মধ্যেই সকল অবতার, সকল শিক্ষা, সকল ধর্ম্মই রহিয়াছে।

এই জগত এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র। এই যুদ্ধ দুই প্রকারের, ভিতরের যুদ্ধ ও বাহিরের যুদ্ধ; গীতা এই দুই প্রকার যুদ্ধের উপরেই ঝোঁক দিয়াছে। ভিতরের যুদ্ধে মানুষকে, ব্যক্তিকে, তাহার ভিতরের শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয় এবং বাসনা, অজ্ঞান, অহংকারকে বধ করিতে পারিলেই এই যুদ্ধে জয় হয়। কিন্তু মানব-সমাজে একটা বাহিরের যুদ্ধও আছে, এখানে ধর্ম্ম পক্ষ ও অধর্ম্ম পক্ষ এই দুইয়ের মধ্যে সংগ্রাম চলে। মানুষের মধ্যে যে ভাগবত ভাব, ভাগবত প্রকৃতি আছে এবং যে সকল মনুষ্য এই ভাব ও প্রকৃতির প্রতিনিধি বা সাধক, তাহারা ধর্ম্ম পক্ষের সহায় হয় এবং দুর্দ্ধর্ষ অহঙ্কার-পূর্ণ আসুরিক ও রাক্ষসিক প্রকৃতি ও এইরূপ প্রকৃতির মনুষ্যসকল অধর্ম্ম পক্ষের সহায় হয়। এই সংগ্রামের রূপক স্বরূপ দেবাসুরের যুদ্ধের কথায় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য পরিপূর্ণ; মহাভারতের যে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্র স্বরূপ তাহাও এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধেরই ছবি বলিয়া প্রায়ই বর্ণিত হইয়া থাকে; পাণ্ডবেরা দেবতার সন্তান, নররূপে দেবশক্তি, তাহারা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধ করিতেছে এবং তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা দানবীয় শক্তির অবতার, অসুর। এই বাহিরের যুদ্ধেও

সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতে, অসুরগণের, পাপীগণের প্রভুত্ব ধ্বংস করিয়া এবং তাহাদের শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া উৎপীড়িত ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে অবতার আবির্ভূত হন। যেমন ব্যক্তিগত মানবাত্মার মধ্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে, তেমনই পৃথিবীতে সমষ্টির মধ্যে স্বর্গ রাজ্যকে নিকটতর করিয়া দিতে অবতার আগমন করেন।

অবতারের আগমনের নিগূঢ় ফল তাহারা লাভ করে যাহারা ইহা হইতে দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে, যাহাদের চিত্ত তাঁহার চিন্তাতেই পূর্ণ হয়, যাহারা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে, মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ, তাহাদের জ্ঞানের সিদ্ধিপ্রদ শক্তির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া এবং নিম্ন প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা দিব্য সত্তা ও দিব্য প্রকৃতি লাভ করে, মদ্‌ভাবমাগতাঃ। অবতার আসিয়া দেখাইয়া দেন যে, মানুষের এই নীচের প্রকৃতির উর্দ্ধে দিব্য প্রকৃতি মানুষের মধ্যেই রহিয়াছে, অবতার আসিয়া দেখাইয়া দেন যে, দিব্য কর্ম্মের স্বরূপ কি—এরূপ কর্ম্ম মুক্ত, নিরহঙ্কার, নিঃস্বার্থ, নির্ব্যক্তিক, সার্ব্বজনীন—ভাগবত জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি দিব্য পুরুষরূপে অবতীর্ণ হন যেন তাঁহার দিব্য চরিত্রে মানুষের চিত্ত মন ভরিয়া উঠে এবং তাহার সঙ্কীর্ণ অহমিকা দূর হইয়া যায়, যেন এইরূপে সে ক্ষুদ্র অহং হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত ও বিশ্বব্যাপী সত্তা হইয়া উঠিতে পারে, সংসার হইতে মুক্তি পাইয়া অমৃতত্বে পৌঁছিতে পারে। তিনি ভাগবত শক্তি ও প্রেমরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন যেন তাহারা তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করে, যেন মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া, তাহাদের মানবীয় ভয় কাম ক্রোধাদির

দ্বন্দ্ব লইয়াই পড়িয়া না থাকে, যেন এই সব দুঃখ ও অশান্তি হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ ভগবানের শান্তি ও আনন্দের মধ্যে বাস করিতে পারে *। ভগবান কি নাম বা রূপ লইয়া, ভাগবতের কোন ভাব সম্মুখে রাখিয়া অবতীর্ণ হন তাহাতেও মূলতঃ কিছুই আসিয়া যায় না; কারণ মানুষ আপন আপন স্বভাবানুসারে ভগবান কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পথই অনুসরণ করিতেছে, সেই পথই শেষকালে তাহাদিগকে ভগবানের সমীপে লইয়া যাইবে; তিনি যখন তাহাদিগকে পথ দেখাইতে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার যে ভাব তাহাদের স্বভাবের অনুযায়ী সেই ভাবের অনুসরণই তাহাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট; মানুষ যে ভাবে ভগবানকে গ্রহণ করে, ভালবাসে, ভগবানে আনন্দ পায়, ভগবানও সেই ভাবে মানুষকে গ্রহণ করেন, ভালবাসেন, তাহাতে আনন্দ পান—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

---

* জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন। ৪।৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ। ৪।১০

দিব্য কৰ্ম্মী

তাহা হইলে দিব্য জন্ম (এক উর্দ্ধতর চেতনায় আত্মার দিব্য-ভাবাত্মক জন্ম) লাভ করা এবং দিব্য জন্ম লাভের পূর্ব্বে ইহার উপায় স্বরূপ ও পরে ইহার অভিব্যক্তি স্বরূপ দিব্য কর্ম্ম করা—ইহাই গীতা-কথিত কর্ম্মযোগের সমগ্র তত্ত্ব। গীতা কর্ম্মের এমন কোন বাহ্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করে নাই যাহা বাহ্য দৃষ্টিতেই চিনিতে পারা যায়, সংসারের প্রচলিত সমালোচনায় যাহার বিচার করিতে পারা যায়; এমন কি মানুষ সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধির আলোকে যে পাপ পূণ্যের প্রভেদ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে চায় গীতা ইচ্ছা করিয়াই সে সব প্রভেদ পরিত্যাগ করিয়াছ। গীতা দিব্য কর্ম্মের যে সব বিশিষ্ট লক্ষণ দিয়াছে সে সব হইতেছে অতিশয় গূঢ় ও আভ্যন্তরীণ; যে চিহ্নের দ্বারা দিব্য কর্ম্ম চেনা যায় তাহা অদৃশ্য, আধ্যাত্মিক, সাধারণ ভালমন্দ, পাপপূণ্য বিচারের অতীত।

আত্মা হইতেই দিব্য কর্ম্মসকল উদ্ভূত হয় এবং কেবল সেই আত্মার আলোকেই তাহাদিগকে চেনা যাইতে পারে। গীতায় বলা হইয়াছে, "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ," "কোনটি কর্ম্ম, কোন-টিই বা অকর্ম্ম, এ বিষয়ে জ্ঞানীগণও মোহিত ও ভ্রান্ত হন," কারণ তাঁহারা ব্যবহারিক, সামাজিক, নৈতিক, যৌক্তিক মানদণ্ড লইয়া বিচার করেন বলিয়া বাহ্য দিকটা লইয়াই পার্থক্য করেন, কিন্তু এ বিষয়ের যাহা মূল তত্ত্ব তাহার কোনও সন্ধান পান না।

তং তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ৪।১৬।১৭

—"আমি তোমাকে সেই কর্ম্মের কথা বলিব, যাহা জানিলে তুমি সমস্ত অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। কর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, অন্যায় কর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, অকর্ম্ম বা নিষ্ক্রিয়তা কি তাহাও বুঝিতে হইবে। এ সংসারে কর্ম্ম গভীর অরণ্যের মত, গহন।" প্রচলিত ভাব নীতি ও আদর্শের আলোকে মানুষ হোঁচট্ খাইতে খাইতে কোন রকমে এই গহন অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিতে থাকে; এই সকল নীতি ও আদর্শ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সমাজের ভাব ও আদর্শের মিশ্রণের ফল, এই সবকে লোকে অক্ষর ও সনাতন বলে বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহারা দেশ-কালানুগতিক এবং অনিত্য; এই সকল নীতি ও আদর্শের ভিত্তি জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া দেখাইবার নানারূপ চেষ্টা করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহারা ব্যবহারিক ও অ-যৌক্তিক। জ্ঞানী ব্যক্তি এই সবের মধ্যে কোন স্থায়ী নীতি ও মূল সত্যের উচ্চতম ভিত্তি সন্ধান করিতে করিতে অবশেষে চরম প্রশ্ন তুলিতে বাধ্য হন—সমস্ত কর্ম্ম ও সংসারই কি মিথ্যা, মায়ার ফাঁদ নহে? সমস্ত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া, অকর্ম্ম, ইহাই কি ক্লান্ত মোহমুক্ত মানবাত্মার শেষ আশ্রয়স্থল নহে? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, এ বিষয়ে জ্ঞানীদেরও বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। কারণ, নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা নহে, কিন্তু কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞান লাভ করা যায়, মুক্তি লাভ করা যায়।

তাহা হইলে এ সমস্যার মীমাংসা কি ? কোন প্রকারের কর্ম্ম করিলে আমরা এই জীবনের অশুভ সমূহ হইতে মুক্তি পাইব, এই সংশয়, এই ভ্রম, এই শোক হইতে মুক্তি পাইব, আমাদের শুদ্ধতম মহদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্য্যেরও মিশ্রিত, অশুদ্ধ, ব্যর্থতাময় পরিণাম হইতে মুক্তি পাইব, এই অসংখ্য প্রকারের অশুভ ও দুঃখ হইতে মুক্তি পাইব ? ইহার উত্তর এই যে, কোনরূপ বাহ্যিক ভেদ করিবার আবশ্যক নাই, সংসারের প্রয়োজনীয় কোন কর্ম্মই বর্জ্জন করিবার আবশ্যক নাই, আমাদের মানবীয় কর্ম্মের চতুর্দ্দিকে কোন সীমা বা গণ্ডী রচনা করিতে হইবে না ; পরন্তু সকল কর্ম্মই করা কর্ত্তব্য, তবে ভগবানের সহিত আত্মাকে যুক্ত রাখিয়াই সকল কর্ম্ম করিতে হইবে, যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। অকর্ম্ম, অর্থাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ প্রকৃত পন্থা নহে ; যে ব্যক্তি উচ্চতম বুদ্ধির অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তিনি বুঝেন যে, এরূপ অকর্ম্মের অবস্থায় বাস্তবিক পক্ষে অনবরত কর্ম্ম চলিতে থাকে, এই অবস্থা প্রকৃতি এবং প্রকৃতির গুণাবলীর ক্রিয়ার অধীন। যে ব্যক্তি শারীরিক কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে চায়, তাহার এখনও ভ্রম আছে যে, সেই বুঝি কর্ম্ম করে, প্রকৃতি নহে ; সে জড়তাকে মুক্তি বলিয়া ভুল করে ; সে জানে না যে, যে অবস্থা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বলিয়া মনে হয়, যেখানে ইঁট পাথর অপেক্ষাও অধিক জড়তা, সেখানেও প্রকৃতির ক্রিয়া চলিতেছে। আবার অন্যদিকে পূর্ণ কর্ম্মস্রোতের মধ্যেও আত্মা তাহার কর্ম্মসকল হইতে মুক্ত, সে কর্ত্তা নহে, কোন কৃত কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ নহে ; আর যে ব্যক্তি আত্মার মুক্তিতে বাস করে, প্রকৃতির গুণের অধীনতায় বাস করে না,

কেবল সেই ব্যক্তিই কর্ম্ম হইতে মুক্তি পাইয়াছে। ইহাই গীতার নিম্নলিখিত বাক্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু"—যিনি কর্ম্মের মধ্যে দেখেন কর্ম্ম নাই এবং নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে দেখেন কর্ম্ম চলিতেছে তিনিই মনুষ্যের মধ্যে প্রকৃত বুদ্ধিমান। গীতার এই বাক্য সাংখ্যকৃত পুরুষ প্রকৃতির প্রভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত—পুরুষ মুক্ত, নিষ্ক্রিয়, কর্ম্মের মধ্যেও চিরশান্ত, শুদ্ধ, অবিচলিত, আর প্রকৃতি চিরক্রিয়াশীলা; প্রকৃতি তাহার দৃশ্য কর্ম্মস্রোতের মধ্যে যেমন কর্ম্ম করিতেছে, জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা বলিয়া যাহা দেখায় তাহার মধ্যেও তেমনিই কর্ম্ম করিতেছে। বিচার বুদ্ধির চরম চেষ্টার ফলে আমরা এই জ্ঞানই লাভ করি, অতএব যে ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ কয়িয়াছেন তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান্, স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু—যে ভ্রান্ত-চিন্তাশীল ব্যক্তি নিম্নতন বুদ্ধির বাহ্যিক, অনিশ্চিত, অস্থায়ী প্রভেদ সমূহের দ্বারা জীবন ও কর্ম্মের বিচার করিতে চাহে, সে প্রকৃত বুদ্ধিমান নহে। অতএব মুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মকে ভয় পান না, তিনি সর্ব্বকর্ম্মকারী বৃহৎ-কর্ম্মী, কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ; অপরের ন্যায় তিনি প্রকৃতির অধীনে কর্ম্ম করেন না,পরন্তু আত্মার নিথর শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভগবানের সহিত যোগে ধীরভাবে কর্ম্ম করেন। ভগবানই তাঁহার সকল কর্ম্মের অধীশ্বর,কেবল তাঁহার ভিতর দিয়া ঐ সকল কর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহার প্রকৃতি নিজ অধীশ্বর সম্বন্ধে সচেতন হইয়া তাঁহারই পরিচালনায় যন্ত্র স্বরূপ ঐ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করে। এই জ্ঞানের জ্বলন্ত ও পূত অগ্নি-শিখায় তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম যেন পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, তাঁহার

মনে ঐ সকল কর্ম্মের দ্বারা কোন দাগ বা বিকৃতি হয় না, সকল কর্ম্মের মধ্যেও তাঁহার মন শান্ত, নীরব, অবিচলিত, শুভ্র, নির্ম্মল ও পবিত্র থাকে। কর্ত্তৃত্বের অভিমান শূন্য হইয়া, এই মোক্ষ-দায়ক জ্ঞানের আলোকে সমস্ত কর্ম্ম করা দিব্যকর্ম্মীর প্রথম লক্ষণ।

বাসনা হইতে মুক্তি দ্বিতীয় লক্ষণ; কারণ যেখানে ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বের অভিমান বা অহঙ্কার নাই সেখানে বাসনা অসম্ভব; সেখানে বাসনা কোন আহার্য্য পায় না, অবলম্বন না পাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, ক্ষীণ হইয়া লোপ পায়। মুক্ত ব্যক্তি বাহ্যতঃ অন্যান্য লোকের মতই সকল প্রকার কর্ম্ম করিতেছেন মনে হয়; বরং তিনি অন্যান্য লোক অপেক্ষা বৃহত্তর কর্ম্ম প্রবলতর সঙ্কল্প ও তেজের সহিতই সম্পাদন করিয়া থাকেন, কারণ ভগবদিচ্ছার মহতী শক্তি তাঁহার সক্রিয় প্রকৃতির ভিতর দিয়া ক্রিয়া করে; কিন্তু তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম ও আরম্ভ নীচের প্রকৃতির বাসনা ও সঙ্কল্প হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ। তিনি তাঁহার কর্ম্মের ফলে সকল আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন; আর যখন কেহ ফলের জন্য কর্ম্ম করে না, কিন্তু সকল কর্ম্মের অধীশ্বর ভগবানের হস্তে কেবল নির্ব্যক্তিক যন্ত্ররূপে কর্ম্ম করে, সেখানে বাসনা কোন স্থান পাইতে পারে না,—এমন কি ভগবানের কার্য্য সফল করিবার বাসনা বা কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার বাসনাও থাকিতে পারে না, কারণ ফল ভগবানের, ভগবান কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট এবং ভগবান নিজেই কর্ম্মের কর্ত্তা—ভগবান নিজের যে শক্তিকে কর্ম্মের ভার দিয়াছেন সেই শক্তিরই সকল

গৌরব, ক্ষুদ্র মনুষ্যের ব্যক্তিত্বের তাহাতে কোন গৌরবই নাই। মুক্ত পুরুষের মানবীয় মন ও আত্মা কিছুই করে না, ন কিঞ্চিৎ করোতি; যদিও তিনি তাঁহার প্রকৃতির ভিতর দিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রকৃতি, কার্য্যনির্ব্বাহিকা শক্তি, চৈতন্যময়ী ভগবতীই হৃদ্দেশে অবস্থিত ভগবান কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ঐ কর্ম্ম করেন।

তাই বলিয়া যে সুচারুভাবে, সফলতার সহিত কর্ম্ম করিতে হইবে না, কি উপায়ে কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে তাহা বিচার করিতে হইবে না, তাহা নহে; বরং যোগস্থ হইয়া শান্তভাবে কর্ম্ম করিলে তাহা যেরূপ সুচারুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, আশা নিরাশায় কম্পিত হৃদয়ে, ক্ষুদ্র অক্ষম বুদ্ধির নানা বাধায়, অতিব্যগ্র মানবীয় ইচ্ছার অস্থির চাঞ্চল্যে কর্ম্ম করিলে তাহা সেরূপ সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় না; গীতা আর এক স্থানে বলিয়াছে যে, যোগই কর্ম্ম করিবার প্রকৃত কৌশল, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। কিন্তু এই সকল কর্ম্ম ব্যষ্টিগত প্রকৃতির ভিতর দিয়া এক বিরাট বিশ্বগত জ্যোতি ও শক্তি দ্বারা নির্ব্যক্তিকভাবে সম্পাদিত হয়। কর্ম্মযোগী জানেন যে, তাঁহাকে যে-শক্তি দেওয়া হইয়াছে উহা ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট ফল লাভের উপযোগী হইবে, তাঁহাকে যে-কর্ম্ম করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় দিব্য জ্ঞান তিনি লাভ করিবেন এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তি কর্ম্মে ও লক্ষ্যে ভাগবত প্রজ্ঞার দ্বারাই সূক্ষ্মভাবে নিয়মিত হইবে—এই ইচ্ছা কর্ম্মীর ব্যক্তিগত বাসনা বা ইচ্ছা নহে, কোনরূপ ব্যক্তিগত জয় বা লাভ ইহার লক্ষ্য নহে, ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এক দিব্য বিজ্ঞানময়ী শক্তির নির্ব্যক্তিক প্রেরণা। এরূপ কর্ম্ম সাধারণের চক্ষে সাফল্যমণ্ডিতও

হইতে পারে, বিফলও হইতে পারে; কিন্তু কর্ম্মযোগী জানেন যে, বাহ্যতঃ যাহাই মনে হউক সমস্ত জয় পরাজয়, লাভ লোকসানের ভিতর দিয়া তাঁহার নিজের অভিপ্রায় নহে পরন্তু সকল কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয়, ভগবান কখনও বাহ্য জয়ের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছা সম্পাদন করেন, আবার অনেক সময়ে বাহ্য পরাজয়ের ভিতর দিয়াই তাঁহার ইচ্ছা অধিকতর জোরের সহিত সম্পন্ন করেন। অর্জ্জুনকে যে-যুদ্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে জয় সুনিশ্চিত; কিন্তু যদি নিশ্চিত পরাজয়ই তাঁহার সম্মুখে থাকে তথাপি তাঁহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে কারণ, যে বিরাট আয়োজনের দ্বারা ভগবানের ইচ্ছা নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে এই যুদ্ধটিই তাঁহার উপস্থিত কর্ত্তব্য বলিয়া অর্জ্জুনকে করিতে দেওয়া হইয়াছে।

মুক্ত মানবের ব্যক্তিগত কোন আশা, আকাঙ্ক্ষা নাই; তিনি কোন দ্রব্যই নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন না; ভগবানের ইচ্ছা যাহা আনিয়া দেয় তিনি তাহাই গ্রহণ করেন, কোনও দ্রব্যে লোভ করেন না, কাহাকেও ঈর্ষা করেন না; তিনি যাহা পান রাগদ্বেষশূন্য হইয়াই তাহা গ্রহণ করেন; কোন কিছু হারাইলে তিনি দুঃখ বা শোক করেন না। তাঁহার হৃদয় ও আত্মা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অধীন; সকল প্রকার প্রতিক্রিয়া ও বিক্ষোভ হইতে তাহারা মুক্ত, বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শে তাহারা বিচলিত হইয়া ভিতরে গোলযোগের সৃষ্টি করে না। তাঁহার কর্ম্ম বাস্তবিকই কেবল শারীরিক, শারীরং কেবলং কর্ম্ম; কারণ বাকী আর যাহা কিছু তাহা ঊর্দ্ধ হইতেই আইসে, মানবীয় স্তরে উৎপন্ন হয় না, তাহা ভগবান

পুরুষোত্তমের ইচ্ছা, জ্ঞান ও আনন্দের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। অতএব তিনি কর্ম্মে ও কর্ম্মের ফলে ঝোঁক দিয়া তাঁহার হৃদয় ও মনে সেই সকল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেন না যেগুলিকে আমরা রিপু বা পাপ বলিয়া থাকি। কারণ বাহিরের কর্ম্ম আদৌ পাপ নহে, কিন্তু কর্ম্মীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা, মন ও হৃদয়ের যে অশুদ্ধ প্রতিক্রিয়া এই কর্ম্মের আনুষঙ্গিক বা কারণ, বাস্তবিক পক্ষে তাহাই পাপ ; যাহা নির্ব্যক্তিক, আধ্যাত্মিক, তাহা সকল সময়েই শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধম্, এবং তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মকেই তাহা নিজস্ব অবিচ্ছেদ্য শুচিতা প্রদান করে। এই আধ্যাত্মিক নির্ব্যক্তিকতা (Spiritual impersonality) দিব্যকর্ম্মীর তৃতীয় লক্ষণ। অবশ্য যে সকল মানব কতকটা মহত্ত্ব এবং উদারতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অনুভব করেন যে এক নির্ব্যক্তিক শক্তি বা প্রেম বা ইচ্ছা এবং জ্ঞান তাঁহাদের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু তাঁহারা মানবীয় ব্যক্তিগত অহং ভাব হইতে মুক্ত নহেন, এবং মাঝে মাঝে এই অহং ভাব খুবই প্রচণ্ড হইয়া উঠে। কিন্তু মুক্ত পুরুষের এই স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে ; কারণ তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত সত্তাকে নির্ব্যক্তিক সত্তায় মিশাইয়া দিয়াছেন,—সেখানে ইহা আর তাঁহার নিজের নহে, ভগবান পুরুষোত্তম ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন,—তিনি সকল সান্ত গুণকে অনন্তভাবে, অবাধে ব্যবহার করিতেছেন এবং কিছুর দ্বারাই বদ্ধ হইতেছেন না। যাঁহার এরূপ মুক্তিলাভ হইয়াছে, তিনি আত্মা হইয়াছেন, তিনি আর শুধু প্রকৃতির গুণ সমূহের সমষ্টিমাত্র নহেন ; আর প্রকৃতির কার্য্যের জন্য ব্যক্তিত্বের যে আভাসটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহা কিছুর দ্বারা বদ্ধ নহে, তাহা একটা উদার, নমনীয়,

বিশ্বব্যাপী সত্তা, তাহা অনন্তের মুক্ত আধার, পুরুষোত্তমের জীবন্ত প্রতিরূপ।

এই জ্ঞান, এই বাসনাশূন্যতা এবং এই নির্ব্যক্তিকতার ফল হইতেছে আত্মা ও প্রকৃতিতে পূর্ণ সমতা। সমতা দিব্যকর্ম্মীর চতুর্থ লক্ষণ। গীতা বলে, দিব্য কর্ম্মী সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়াছেন; তিনি দ্বন্দ্বাতীতঃ। আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি জয় পরাজয়, কৃতকার্য্যতা অকৃতকার্য্যতা সবই সমান চক্ষে দেখেন এবং তাঁহার চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হয় না; কিন্তু শুধু ইহাই নহে, তিনি সকল দ্বন্দ্বের উপরে উঠিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন করেন। সংসারের ঘটনানিচয়ের সম্বন্ধে সাধারণ মনুষ্যের মনোভাব যে সকল বাহ্য ভেদাভেদের দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে, দিব্যকর্ম্মী সে সকল ভেদাভেদকে তত বড় করিয়া দেখেন না। তিনি এই সকল ভেদাভেদ অস্বীকার করেন না বটে, কিন্তু তিনি এই সকলের উপরে। শুভ ও অশুভ ঘটনার প্রভেদ সকাম মনুষ্যের পক্ষে গুরুতর ব্যাপার, কিন্তু নিষ্কাম দিব্য পুরুষের নিকট শুভ ও অশুভ উভয়েই সমান আদরের, কারণ ইহাদের সংমিশ্রণের দ্বারাই সনাতন শুভের ক্রমবিকাশশীল রূপ গড়িয়া উঠিতেছে। তাঁহার পরাজয় নাই কারণ তাঁহার পক্ষে সমস্ত ঘটনাই প্রকৃতির কুরুক্ষেত্রে দিব্যজয়ের দিকেই চলিয়াছে—এই যে কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের বিকাশ হইতেছে, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, এখানকার প্রত্যেক ঘটনাই এই যুদ্ধের অধিনায়ক, কর্ম্মসকলের ঈশ্বর, ধর্ম্মের দিশারী ভগবানের সর্ব্বদর্শী দৃষ্টি দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা আছে। মানুষের সম্মান বা অপমান, প্রশংসা বা নিন্দা দিব্য কর্ম্মীকে বিচলিত করিতে পারে না; কারণ তাঁহার কার্য্যের একজন

মহত্তর স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন বিচারকর্ত্তা আছেন, এক স্বতন্ত্র মানদণ্ডও আছে ; এবং তাঁহার কর্ম্মের প্রেরণা সাংসারিক পুরস্কারের উপর এতটুকুও নির্ভর করে না। ক্ষত্রিয় অর্জ্জুন স্বভাবতঃই যশঃ ও মানের আদর করিবেন, অপমান ও কাপুরুষ অপবাদকে মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক বলিয়া পরিত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে ঠিক ; কারণ মর্য্যাদা রক্ষা করা, জগতে সাহসিকতার আদর্শ অটুট রাখা তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ ; কিন্তু মুক্তপুরুষ অর্জ্জুনের পক্ষে এ সব বিষয় গ্রাহ্য করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে শুধু জানিতে হইবে যে, কর্ত্তব্যম্ কর্ম্ম কি, ভগবান তাঁহার নিকট কোন কর্ম্ম দাবী করিতেছেন, ভগবানে ফলাফল সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সেই কর্ম্মই করিতে হইবে। এমন কি তিনি পাপপুণ্যের প্রভেদেরও উপরে উঠিয়াছেন ; যাহারা অহঙ্কারের প্রভাব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিতেছে, রিপুগণের প্রচণ্ড বশ্যতা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের পক্ষে পাপপুণ্যের প্রভেদ একান্ত আবশ্যক,—কিন্তু যিনি মুক্ত তিনি এই সকল চেষ্টার উপরে উঠিয়াছেন এবং সাক্ষী প্রবুদ্ধ আত্মার পবিত্রতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পাপ তাঁহা হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, এবং তিনি যে চূড়ায় উঠিয়াছেন, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, অসৎকর্ম্মে তাহার ক্ষয় নাই বা সৎকর্ম্মে তাহার বৃদ্ধি নাই, তাহা অহংভাবশূন্য দিব্য প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অপরিবর্ত্তনীয় পবিত্রতা। সেখানে পাপপুণ্য বোধের কোন স্থান নাই, কোন উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা নাই।

অজ্ঞানের অধীন অর্জ্জুন হৃদয়ের মাঝে ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারেন এবং মনে মনে বিচার করিতে পারেন যে, যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া তাহার পক্ষে পাপ হইবে কারণ অত্যাচারী শক্তিকে বাড়িতে

দিলে দেশের উপর, জাতির উপর যে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার হইবে সে সবের দায়িত্ব তাঁহারই উপর পড়িবে ; অথবা তিনি হৃদয়ে হিংসা ও নরহত্যার প্রতি বিতৃষ্ণা অনুভব করিতে পারেন এবং মনে মনে বিচার করিতে পারেন যে, সকল অবস্থাতেই রক্তপাত পাপ এবং কিছুতেই ইহার সমর্থন করা যায় না। এই দুই প্রকার মনোভাবই সমান ভাবে ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত, ইহাদের মধ্যে তাহার মনে কোনটির জয় হইবে বা জগৎ কোনটিকে গ্রাহ্য করিবে তাহা অবস্থা কাল ও পাত্রের উপর নির্ভর করে। অথবা, শত্রুর বিরুদ্ধে বন্ধুদিগকে সাহায্য করিতে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায় ও শুভকে সমর্থন করিতে অর্জ্জুন কেবল মর্য্যাদা-বোধ ও হৃদয় বৃত্তির প্রেরণাতেই নিজেকে বাধ্য মনে করিতে পারেন। কিন্তু মুক্ত পুরুষের দৃষ্টি এই সব বিরোধী আদর্শ ও নীতিকে অতিক্রম করে ; তিনি শুধু দেখেন যে, ধর্ম্মের রক্ষা অথবা বিকাশের নিমিত্ত প্রয়োজন বলিয়া ভগবান তাঁহার নিকট কি চাহেন। তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার নাই, নিজের ব্যক্তিগত কোন রাগ দ্বেষ তৃপ্ত করিবার নাই, তাঁহার কর্ম্মের এমন কোন চিরনির্দ্দিষ্ট নীতি বা আদর্শ নাই যাহা বিকাশশীল মানব জাতির ক্রমোন্নতির পথে বাধাস্বরূপ হয় অথবা অসীমের ডাককে তুচ্ছ করিয়া বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। তাহার নিজের কোন শত্রু জয় করিবার বা বধ করিবার নাই, তিনি কেবল দেখেন যে, যাহারা তাঁহার বিরোধী তাহারা বাধা প্রদানের দ্বারাই নিয়তির গতিকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ভবিতব্য ও ঘটনাচক্রের দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন ক্রোধ বা বিদ্বেষ থাকিতে পারে না ; কারণ দিব্য প্রকৃতিতে ক্রোধ বা

বিদ্বেষের কোন স্থান নাই। বাধা মাত্রকেই ভাঙ্গিয়া ফেলিবার, ধ্বংস করিবার যে আকাঙ্ক্ষা অসুরের মধ্যে আছে, যে ভীষণ রক্ত-পিপাসা রাক্ষসের আছে, তাঁহার ধীরতা, শান্তি এবং সর্ব্বতোমুখী সহানুভূতি ও জ্ঞানের মধ্যে সে সব অসম্ভব। তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতে চান না, বরং সকলের প্রতি তাঁহার বন্ধুভাব ও করুণা, অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। কিন্তু হৃদয় স্নায়ু ও রক্তমাংসের শিহরণ জনিত যে অনুকম্পা সাধারণতঃ মনুষ্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এই দেবোচিত করুণা তাহা হইতে বিভিন্ন; ইহা হইতেছে মানুষের উপর দিব্য পুরুষের করুণাদৃষ্টি, সকল জীবকেই তিনি নিজের মধ্যে দেখেন। আবার মুক্ত পুরুষ যে শারীরিক জীবনটাকেই সব চেয়ে বড় করিয়া দেখেন তাহাও নহে, ইহার উপরে যে আত্মার জীবন আছে সেই দিকেই তিনি লক্ষ্য রাখেন এবং এই শরীরের জীবনকে কেবল যন্ত্রমাত্র বলিয়াই জানেন। তিনি সহসা হত্যাকাণ্ড বা যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন না, কিন্তু যদি ধর্ম্মের স্রোতে যুদ্ধ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তিনি পশ্চাৎপদ হন না, উদার সমতা ও পূর্ণ জ্ঞানের সহিত সেই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁহাকে যাহাদের প্রভুত্বের শক্তি ও জয়ের উল্লাস নষ্ট করিতে হয় তাহাদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির কোন অভাব হয় না।

কারণ তিনি সর্ব্বত্র দুইটি জিনিষ দেখেন, তিনি দেখেন যে, ভগবান সর্ব্বভূতে সমানভাবে বিরাজ করিতেছেন, কেবল সাময়িক ঘটনাক্রমে সর্ব্বত্র ভগববানের প্রকাশ সমান নহে। পশু ও মানবে, কুক্কুরে, অস্পৃশ্য চণ্ডালে, বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, সাধুতে ও পাপীতে, উদাসীনে, শত্রুতে এবং বন্ধুতে, শুভকারীতে এবং অনিষ্টকারীতে—সর্ব্বত্র তিনি নিজেকে দেখেন, ভগবানকে দেখেন, এবং সকলের প্রতিই তাঁহার অন্তরে

সমান দয়া, দিব্য ভালবাসা। ঘটনাচক্রে তিনি হয়ত কাহাকেও বাহ্যতঃ আলিঙ্গনে বদ্ধ করেন, আবার কাহাকেও বাহ্যতঃ যুদ্ধে আক্রমণ করেন—কিন্তু তাঁহার সমদৃষ্টি, উন্মুক্ত হৃদয় এবং সকলের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসার কখনও প্রত্যবায় হয় না। তাঁহার সকল কর্ম্মের মূলে একই অধ্যাত্মনীতি থাকে, পূর্ণতম সমতা, এবং একই কর্ম্মনীতি থাকে—মানবজাতিকে ক্রমশঃ ভগবানের দিকে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার মধ্যে ভগবৎ ইচ্ছার প্রেরণা।

দিব্যকর্ম্মীর আর এক লক্ষণ হইতেছে, পূর্ণ আন্তরিক আনন্দ ও শান্তি (ইহা দিব্য চৈতন্যেরও মূলতত্ত্ব), ইহার উৎপত্তি ও স্থায়িত্ব জগতের কোন কিছুর উপরই নির্ভর করে না ; এই পূর্ণ আনন্দ ও শান্তি আত্মার চৈতন্যের মূল উপাদান, দিব্য সত্তার ইহাই প্রকৃত স্বরূপ। সাধারণ মানব তাহার সুখের জন্য বাহ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে ; অতএব তাহার বাসনা আছে ; সেই জন্যই তাহার আছে ক্রোধ ও বিক্ষোভ, সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও শোক ; সেই জন্যই সমস্ত জিনিষকে সে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মানদণ্ডে ওজন করে। ইহাদের কোনটিই দিব্য পুরুষকে বিচলিত করিতে পারে না ; তিনি কোন কিছুর উপর নির্ভর না করিয়া সদাই পরিতৃপ্ত, নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ; কারণ তাঁহার আনন্দ, তাঁহার দিব্য স্বস্তি, তাঁহার সুখ, তাঁহার প্রসন্ন জ্যোতি—সবই নিত্য, তাঁহার অন্তরস্থিত, তাঁহার অঙ্গীভূত, আত্মরতিঃ, অন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। দিব্য পুরুষ বাহ্য বস্তু হইতে যে আনন্দ পান তাহা ঐ বস্তুর জন্য নহে, ঐ বস্তু যে তাঁহার কোন অভাব বা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে সে জন্য নহে পরন্তু ঐ সকল বস্তুতে যে আত্মা রহিয়াছে,

ভগবানের প্রকাশ রহিয়াছে, ঐ সকল জিনিষের মধ্যে যাহা নিত্য এবং কখনও তাঁহার অগোচর হইতে পারে না তাহার জন্যই তিনি ঐ সকল বস্তুতে আনন্দ পান। বাহ্য বস্তুর স্পর্শে তাঁহার কোনরূপ আসক্তি নাই, কিন্তু তিনি নিজের আত্মাতে যে আনন্দ পান সকল বস্তুতেই সেই আনন্দ পাইয়া থাকেন কারণ এই সব বস্তুর আত্মা এবং তাঁহার নিজের আত্মা এক, তিনি সর্ব্বভূতের আত্মার সহিত একাত্মা হইয়াছেন, তাহাদের সকল ভেদের মধ্যেও যে এক সম ব্রহ্ম রহিয়াছে সেই ব্রহ্মের সহিত তিনি যুক্ত হইয়াছেন, ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (৫।২১), সর্ব্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা (৫।৭)। তিনি সুখময় জিনিষের স্পর্শে উল্লসিত হন না বা দুঃখময় জিনিষের স্পর্শে যন্ত্রণা বোধ করেন না; কোন জিনিষের ব্যথা, কোন বন্ধুর দেওয়া বেদনা, কোন শত্রুর আঘাত—কিছুই তাঁহার হৃদয় বা মনের স্থৈর্য্য নষ্ট করিতে পারে না; তাঁহার আত্মা স্বভাবতঃ (উপনিষদের ভাষায়) অব্রণম্, ক্ষতশূন্য বা ব্যথাশূন্য। সকল জিনিষেই তাঁহার একই অক্ষয় আনন্দ—

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ৫।২১

এই সমতা, নির্ব্যক্তিকতা, শান্তি, আনন্দ, মুক্তি, কর্ম্ম করা বা না করার ন্যায় বাহ্য ব্যাপারের উপর নির্ভর করে না। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ত্যাগের প্রভেদের উপর, "সন্ন্যাস" ও "ত্যাগের" প্রভেদের উপর গীতায় পুনঃ পুনঃ জোর দেওয়া হইয়াছে। গীতার মতে আভ্যন্তরীণ ত্যাগ ভিন্ন বাহ্য ত্যাগের কোন মূল্যই নাই, প্রথমটি ভিন্ন দ্বিতীয়টি প্রায় অসম্ভব; আবার যেখানে আভ্যন্তরীণ মুক্তি আছে সেখানে বাহ্য

সন্ন্যাসের কোন প্রয়োজনই নাই। বাস্তবিক পক্ষে "ত্যাগ"ই (আভ্যন্তরীণ ত্যাগ) প্রকৃত এবং যথোচিত সন্ন্যাস,

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৫।৩

"যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না তাঁহাকে নিত্য-সন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে হইবে ; দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত এইরূপ ব্যক্তি অনায়াসে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন।" দুঃখদায়ক (দুঃখমাপ্তুম্) বাহ্য সন্ন্যাসের কোন প্রয়োজনই নাই। সমস্ত কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল যে সন্ন্যাস করিতে হইবে, ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সন্ন্যাস বাহ্য নহে, আভ্যন্তরীণ ; প্রকৃতির তামসিকতায় সমস্ত সমর্পণ করিতে হইবে না, কিন্তু সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল যজ্ঞরূপে পরমেশ্বরকে অর্পণ করিতে হইবে, নির্ব্যক্তিক সত্তার বিরাট শান্তি ও আনন্দের মধ্যে সমর্পণ করিতে হইবে,—এই সত্তা হইতে সমস্ত কর্ম্ম উৎপন্ন হইলেও উহার শান্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করাই প্রকৃত কর্ম্ম-সন্ন্যাস,

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ।। ৫।১০

—"যিনি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া (অথবা ব্রহ্মকে কর্ম্মের আধার বা ভিত্তি করিয়া) কর্ম্ম করেন, জলে কমল পত্রের ন্যায় তিনি পাপে লিপ্ত হন না।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে। ৫।১১

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ৫।১২

—অতএব "যোগিগণ প্রথমে শরীর, মন ও বুদ্ধির দ্বারা, এমন কি কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই অনাসক্ত হইয়া আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ব্রহ্মের সহিত যুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মের ফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার ঐকান্তিক শান্তিলাভ করেন, কিন্তু যে-ব্যক্তি এরূপ ব্রহ্মে যুক্ত নহেন তিনি কর্ম্মফলে আসক্ত হন এবং বাসনার বশে কর্ম্ম করিয়া বদ্ধ হন।" এই প্রতিষ্ঠা শুদ্ধি ও শান্তি একবার লাভ করিতে পারিলে দেহী আত্মা তাহার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করিয়া এবং সমস্ত কর্ম্ম মনের দ্বারা (বাহ্যভাবে নহে, আভ্যন্তরীণভাবে) সন্ন্যাস করিয়া "নবদ্বারবিশিষ্ট পুরবৎ দেহে কর্ম্ম না করিয়া এবং না করাইয়া অবস্থান করেন",

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্॥ ৫।১৩

কারণ এই আত্মাই সকলের অন্তরস্থিত এক নির্ব্যক্তিক আত্মা, সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর, "প্রভু", "বিভু", ইনি নির্ব্যক্তিক সত্তায় সংসারের কোন কর্ম্ম সৃষ্টি করেন না, মনের কর্ত্তৃত্বভাবও ইনি সৃষ্টি করেন না, কর্ম্মের সহিত কর্ম্মফলের সংযোগ অর্থাৎ কার্য্যকারণ শৃঙ্খলও তিনি সৃষ্টি করেন না। মানুষের মধ্যে যে প্রকৃতি রহিয়াছে, "স্বভাব," তাহার আত্মবিকাশের মূল শক্তি, সেই স্বভাবই এই সকল সৃষ্টি করিয়া থাকে—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ৫।১৪

ঐ সর্ব্বব্যাপী নির্ব্যক্তিক সত্তা কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না; জীবের অজ্ঞান হইতে, কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার হইতে, নিজের পরম সত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞান হইতে, প্রকৃতির ক্রিয়ার সহিত জড়িতভাব হইতে সকল পাপ পুণ্যের উৎপত্তি; তাহার মধ্যে আত্মজ্ঞান যখন এই অন্ধকারময় আবরণ হইতে মুক্ত হয়, সেই জ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় ভিতরের সত্য আত্মাকে প্রকাশিত করে; তখন সে নিজেকে প্রকৃতির যন্ত্রসমূহের উপরিস্থিত পরম আত্মা বলিয়া জানিতে পারে। শুদ্ধ, অনন্ত, অবিকার্য্য, অক্ষর, সে আর বিচলিত হয় না; প্রকৃতির ক্রিয়ার দ্বারা যে তাহার কোন রূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তখন আর তাহার এ ধারণা থাকে না। নিজেকে সেই নির্ব্যক্তিক সত্তার সহিত সম্পূর্ণভাবে এক করিয়া, সেও প্রকৃতির বন্ধনে পুনরাবৃত্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে,

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। ৫।১৫
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্‌॥ ৫।১৬
তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ৫।১৭

অথচ এইরূপ মুক্তিতে তাহার কর্ম্ম করিবার কোন বাধাই হয় না। কেবল তাহার এই জ্ঞান থাকে যে, সে নিজে ক্রিয়াপর নহে, বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির গুণত্রয়ই সমুদয় কর্ম্ম করে,

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্‌ শৃণ্বন্‌ স্পৃশন্‌ জিঘ্রন্নশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্‌॥ ৫।৮

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৫।৯

"তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি (নিষ্ক্রিয় নির্ব্যক্তিক সত্তার সহিত) যুক্ত থাকিয়া মনে করেন—'আমি কিছুই করিতেছি না'; তিনি যখন দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, আহার, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষু উন্মোচন ও চক্ষু নিমীলন করেন তখন তিনি এই ধারণা করেন যে, শুধু ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ের উপর ক্রিয়া করিতেছে।" তিনি অক্ষর, অবিকার্য্য পুরুষের সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় গুণত্রয়ের কবল হইতে উর্দ্ধে বিরাজ করেন, ত্রিগুণাতীত; তিনি সাত্ত্বিকও নহেন, রাজসিকও নহেন, তামসিকও নহেন; তাঁহার কর্ম্মে প্রাকৃতিক গুণ সমূহের যে ক্রমান্বয় পরিবর্ত্তন চলে, জ্যোতি ও সুখের, কর্ম্ম ও শক্তির, বিশ্রাম ও জড়িমার যে ছন্দোবদ্ধ লীলা চলে, সে সব তিনি নির্ম্মল শান্তভাবে নিরীক্ষণ করেন। শান্ত আত্মার এই উর্দ্ধস্থিতি, দ্রষ্টাভাবে নিজের কর্ম্মকে নিরীক্ষণ করা অথচ তাহাতে জড়িত বা বদ্ধ না হওয়া, এই ত্রৈগুণাতীত্য দিব্যকর্ম্মীর আর একটি মহৎ চিহ্ন। শুধু এই ভাব হইতে প্রকৃতির অন্ধনিয়মবাদের উৎপত্তি হইতে পারে, পুরুষ সম্পূর্ণভাবে উদাসীন ও দায়িত্বহীন, এইরূপ মতবাদের উদ্ভব হইতে পারে; কিন্তু, এরূপ মত অসম্পূর্ণ চিন্তার ফল, এই মত গীতা জ্ঞানদীপ্ত পুরুষোত্তম তত্ত্বের দ্বারা পূর্ণভাবে নিরসন করিয়াছে। গীতার এই মত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃতি নিজের কার্য্য নিজেই অন্ধভাবে নির্ণয় করে না; পরম পুরুষের ইচ্ছাই প্রকৃতিকে প্রেরণা দেয়; যিনি পূর্ব্বেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিধন করিয়া রাখিয়াছেন, অর্জ্জুন যাঁহার কর্ম্মের মানবীয় যন্ত্র মাত্র,

সেই বিশ্বপুরুষ, সেই প্রপঞ্চাতীত ভগবানই প্রকৃতির কর্ম্মের অধীশ্বর। আমাদের ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় স্বরূপই আমাদিগকে নির্ব্যক্তিক সত্তায় সকল কর্ম্ম অর্পণ করিতে হয়, কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের লক্ষ্য হইতেছে সকল কর্ম্ম সর্ব্বভূতমহেশ্বরে, সকলেরই যিনি পরমেশ্বর তাঁহাকে সমর্পণ করা।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ।৩।৩০

আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, আমাতে তোমার সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া, ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্ত হইয়া, "আমি" এবং "আমার" ভাব বর্জন করিয়া, 'বিগতজ্বরঃ' হইয়া যুদ্ধ কর, কর্ম্ম কর, জগতে আমার ইচ্ছা সম্পাদন কর। ভগবানই সমগ্র কর্ম্মটি উদ্ভাবন করেন, নির্দ্দেশ করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন; যে মানব ব্রহ্মের মধ্যে নির্ব্যক্তিক ভাব লাভ করিয়াছেন, তিনি হন ভগবানের শক্তির শুদ্ধ, নীরব আধার (channel); প্রকৃতিতে আবির্ভূত ঐ শক্তি দিব্য কর্ম্মধারাটি সম্পাদন করে। কেবল এই প্রকারের কর্ম্মই মুক্ত পুরুষের কর্ম্ম, মুক্তস্য কর্ম্ম, কারণ কোথাও তিনি ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বশে কর্ম্ম করেন না; এই প্রকারের কর্ম্ম হয় সিদ্ধ কর্ম্মযোগীর। সে সব কর্ম্ম মুক্ত আত্মা হইতে উত্থিত হয় এবং আত্মাকে কোনরূপ বিকৃত না করিয়াই চলিয়া যায়, ঠিক যেমন গভীর সমুদ্রে ঢেউ উঠিয়া আবার মিশাইয়া যায়,

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ৪।২৩

সমতা

যেহেতু জ্ঞান, নিষ্কামতা, নির্ব্যক্তিকতা, সমতা, আভ্যন্তরীণ স্বপ্রতিষ্ঠ শান্তি ও আনন্দ এবং ত্রৈগুণাতীত্য মুক্ত পুরুষের লক্ষণ, সেই হেতু তাহার সকল কর্ম্মে ঐ সকল গুণ থাকিবেই। সংসারের সকল আঘাত, সকল দ্বন্দ্ব, সকল ঘটনার মধ্যে সে যে অবিচলিত শান্তভাব রক্ষা করে, তাহার জন্য ঐগুলি একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে ব্রহ্মের যে সমতাপূর্ণ অক্ষরভাব, এই শান্তভাব তাহারই প্রতিচ্ছায়া; বিশ্বের বহুর মধ্যে যে অখণ্ড পক্ষপাতশূন্য একত্ব চিরকাল অনুস্যুত রহিয়াছে, এই শান্তভাব তাহারই। কারণ জগতের অসংখ্য ভেদ ও বৈষম্যের মধ্যে এই এক ব্রহ্মই সমতা রক্ষা করিতেছে; এবং ব্রহ্মের সমতাই একমাত্র প্রকৃত সমতা। কারণ জগতের অন্যান্য বিষয়ে কেবলমাত্র সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য থাকিতে পারে; কিন্তু জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সদৃশ বস্তু সমূহের মধ্যেও আমরা অসমতা ও ভেদ দেখিতে পাই এবং অসমান বস্তু সমূহকে পরস্পরের সহিত সুসম্বদ্ধ করিয়াই জগতে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা যাইতে পারে।

এই জন্যই গীতা কর্ম্মযোগের লক্ষণের মধ্যে সমতার উপর এত অধিক জোর দিয়াছে; মুক্ত আত্মা যে মুক্তভাবে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, এই সমতাই তাহার সন্ধিস্থল। মুক্তপুরুষ যতক্ষণ আত্মজ্ঞান, নিষ্কামতা, নির্ব্যক্তিকতা, আনন্দ, ত্রৈগুণাতীত্য লইয়া সংসার

হইতে সরিয়া নিজের মধ্যে নিজেকে লইয়াই থাকে, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ সমতার কোন প্রয়োজন হয় না ; কারণ যে সকল বস্তুতে সমতা ও অসমতার দ্বন্দ্ব আছে সে সকল বস্তু হইতে সে দূরে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আত্মা প্রকৃতির ক্রিয়ার বহুত্ব, নামরূপ, ভেদ, বৈষম্যের মধ্যে আসে তখনই তাহার মুক্ত অবস্থার অপর লক্ষণগুলিকে এই সমতার ভিতর দিয়াই কার্য্যে পরিণত করিতে হয়। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের সহিত একত্বের উপলব্ধিই জ্ঞান ; জগতের বহু জীব ও বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্কে থাকিয়া এই জ্ঞানকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে, সকলের সহিত সমান একত্ব অনুভব করিতে হইবে। এই নির্ব্যক্তিকতাতেই এক অক্ষর আত্মা জগতে তাহার বহু নাম রূপের বৈচিত্র্যের অতীত ; জগতের বিভিন্ন নাম রূপের সহিত ব্যবহারে আত্মার নির্ব্যক্তিকতা প্রকাশিত হয় সকলের প্রতি সম ও নিরপেক্ষ ব্যবহার করিয়া ; অবশ্য সকলের সহিত যে একই প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে তাহা নহে—যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অবস্থা ও সম্বন্ধ ভেদে ব্যবহারেরও প্রকার ভেদ হইবে বটে কিন্তু সকলের প্রতি সকল ব্যবহারেই ভিতরের ভাব সম ও নিরপেক্ষ রাখিতে হইবে। যেমন কৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ৯।২৯

তাঁহার প্রিয় কেহ নাই, তাঁহার ঘৃণাভাজনও কেহ নহে, তাঁহার ভিতরে সকলের প্রতিই সমভাব ; তথাপি যে ব্যক্তি তাঁহার ভক্ত তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া, কারণ এরূপ ব্যক্তি ভগবানের

সহিত যে-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে তাহা আলাদা, এবং সকলেরই প্রভু সেই এক পক্ষপাতশূন্য ভগবান তাঁহার সমীপে যে যে-ভাবে আসে তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করেন। সংসারের বিভিন্ন কাম্যবস্তু আত্মাকে সীমার মধ্যে, বন্ধনের মধ্যে টানিতে চাহিতেছে—অসীম আত্মা তাহার নিষ্কামতায় এই টানের অতীত; আত্মাকে যখন এই সকল বস্তুর সম্পর্কে আসিতে হয়, তখন তাহার নিষ্কামতা প্রকাশ করিতে হইবে তাহাদিগকে সমান উদাসীন ভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করিয়া অথবা সকল বস্তুতে সমান নিরপেক্ষ অনাসক্ত আনন্দবোধ ও প্রেমের দ্বারা; আত্মার সেই আনন্দ স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহা কোন বাহ্য বস্তুর লাভালাভের উপর নির্ভর করে না, তাহা স্বরূপতঃ অটল অক্ষয়। কারণ, আপনাতেই আত্মার আনন্দ; আর যদি জীব জগতের সম্পর্কের মধ্যেও সে এই আনন্দ পাইতে চায় তাহা হইলে কেবল এই ভাবেই আত্মা তাহার মুক্ত আধ্যাত্মিকতা প্রকট করিতে পারে। আত্মা প্রকৃতির গুণ সমূহের স্বভাবতঃ নিত্য চঞ্চল ও অসম ক্রিয়ার উর্দ্ধে এবং ইহাই আত্মার ত্রৈগুণাতীত্য; এই আত্মাকে যদি প্রকৃতির অসম দ্বন্দ্বপূর্ণ ক্রিয়ার সম্পর্কে আসিতে হয়, মুক্ত পুরুষ যদি নিজের প্রকৃতিকে কোনরূপ কর্ম্ম করিতে দেয় তাহা হইলে সকল কর্ম্ম, সকল ফল, সকল ঘটনার প্রতি নিরপেক্ষ সমভাবের দ্বারাই তাহার ত্রৈগুণাতীত্য প্রকাশ করিতে হইবে।

সমতা দিব্যকর্ম্মীর লক্ষণও বটে আবার যাহারা এই পথে অগ্রসর হইতে চায় তাহাদের পরীক্ষাও বটে। আত্মার মধ্যে যদি অসমতার ভাব থাকে তাহা হইলে বাসনার খেলা, ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুভূতি ও কর্ম্মের খেলা, সাধারণ সুখ দুঃখ অথবা চাঞ্চল্য

ও অতৃপ্তি সংযুক্ত যে আনন্দ বস্তুতঃ আধ্যাত্মিক নহে পরন্তু মানসিক তৃপ্তি মাত্র এই সব প্রকৃতির অসম খেলা কিছু না কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে আত্মায় অসমতা আছে সেখানে জ্ঞান হইতে বিচ্যুতি আছে, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসমন্বয়কারী ব্রহ্মের একত্বে এবং সকল বস্তুর সহিত ঐক্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠার অভাব আছে। এই সমতার দ্বারাই কর্ম্মযোগী তাহার কর্ম্মের মধ্যেও উপলব্ধি করে যে সে মুক্ত।

গীতা যে সমতার বিধান দিয়াছে তাহার স্বরূপ খুব উচ্চ ও ব্যাপক ; সমতার এই আধ্যাত্মিক স্বরূপই এ বিষয়ে গীতাশিক্ষার বিশেষত্ব। কারণ, হৃদয় মন চিত্তের সমতা যে খুবই বাঞ্ছনীয় তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, এই শিক্ষা কেবল যে গীতাতেই আছে তাহা নহে ; এই সমতার অবস্থায় আমরা মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার উপরে উঠি। সমতা সকল সময়েই দার্শনিক আদর্শ এবং জ্ঞানী-জনোচিত স্বভাব বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। গীতা এই দার্শনিক আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাকে আরও ঊর্দ্ধদেশে তুলিয়াছে, সেখানে আমরা অধিকতর উদার ও নির্ম্মল বায়ু সেবন করি। ইন্দ্রিয়া-কর্ষণের ঘূর্ণী হইতে, বাসনার বিক্ষুব্ধতা হইতে উঠিয়া পরমতম ভগবানেরই দিব্য শান্তি ও আনন্দলাভ করিতে হইলে আত্মাকে যে অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয় তাহার কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ হইতেছে কৃচ্ছ্র বা স্তোয়িক * সমতা (Stoic poise) ও দার্শনিক বা বিচারলব্ধ সমতা (Philosophic poise)। কৃচ্ছ্র সাধন ও কঠোর সহিষ্ণুতার

* গ্রীক Stoic সম্প্রদায়কে নির্দ্দেশ করিতে আমরা "স্তোয়িক" শব্দই ব্যবহার করিলাম। এই সম্প্রদায়ের মত হইতেছে, সুখ দুঃখ বোধ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর

দ্বারা যে আত্মজয় লাভ করা যায় তাহারই উপর স্তোয়িক সমতার প্রতিষ্ঠা। দার্শনিক সমতা ইহা অপেক্ষা শান্তিময় সুখময়—জ্ঞানলব্ধ আত্মজয়ের উপরেই দার্শনিক সমতার প্রতিষ্ঠা ; বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা আমাদের প্রকৃতির বিপর্য্যয় সমূহের প্রতি উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়া (উদাসীনবদাসীনঃ) এই সমতা লাভ করা যায়। সর্ব্বদা ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে মাথা নত করিয়া থাকার ভাব, তাঁহার বিধান সর্ব্বদা মাথা পাতিয়া লওয়ার ভাব আর এক প্রকারের সমতা, ইহাকে ধর্ম্মভাবের সমতা বা খ্রীষ্টান সমতা বলা যায়। এই তিনটি হইতেছে দিব্য শান্তিলাভের তিনটি ধাপ ও উপায়—বীরোচিত ভাবে সকল কষ্ট সহ্য করা, জ্ঞানের দ্বারা উদাসীন ভাব অবলম্বন করা, ধর্ম্মভাবের বশে ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে মাথা পাতিয়া দেওয়া,—"তিতিক্ষা", "উদাসীনতা", "নমঃ" বা "নতি"। গীতা তাহার উদার সমন্বয়ের রীতি

কিছুই নহে, এই দুর্ব্বলতাকে পদদলিত করিতে হইবে, মনের জোরে সুখ দুঃখকে জয় করিতে হইবে। এই ভাব বলদৃপ্ত অসুরের তপস্যা, ইহার মহত্ত্ব আছে, মানবের উন্নতি সাধনে প্রয়োজনও আছে, কিন্তু ইহা দুঃখ জয়ের প্রকৃত উপায় নহে। এরূপ দুঃখ নিগ্রহে মানবের হৃদয় শুষ্ক কঠোর প্রেমশূন্য হইয়া যায়। এইরূপ কৃচ্ছ্র সাধনে স্থায়ী উন্নতি নাই। তপস্যায় শক্তি হয় বটে, কিন্তু এই জন্মে যাহা চাপিয়া রাখি, পরজন্মে তাহা সর্ব্বরোধ ভাঙ্গিয়া দ্বিগুণ বেগে উছলিয়া আসে। গীতা বলিয়াছে, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। গীতা যে সমতার শিক্ষা দিয়াছে, তাহা স্তোয়িক সমতার অনেক উপরের জিনিষ। গীতার সমতায় হৃদয় শুষ্ক হয় না, গীতার সমতায় ভোগের স্থান আছে, গীতোক্ত সাধনায় সমতাবাদ ও শান্ত বা শুদ্ধভোগ একই পথ। তবে গীতোক্ত সমতালাভের সাধনায় প্রথমাবস্থায় স্তোয়িক সমতার দ্বারা হয়ত কিছু সাহায্য হইতে পারে, গ্রন্থের মধ্যেও এই বিষয় বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে।— অনুবাদক

অনুসারে এই তিন অবস্থাকেই গ্রহণ করিয়াছে এবং আত্মার উন্নতির উপায় স্বরূপ ইহাদের মিশ্রণ ও সমন্বয় সাধন করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকটিকেই গীতা গভীরতর ভিত্তি, বৃহত্তর লক্ষ্য, উচ্চতর ও ব্যাপকতর সার্থকতা দান করিয়াছে। কারণ গীতা এই তিন অবস্থারই ভিত্তি আত্মার শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং এই আধ্যাত্মিক সত্তার শক্তি চরিত্রবল অপেক্ষা মহত্তর, মানসিক বুদ্ধি বিচার অপেক্ষা মহত্তর, হৃদয়ের আবেগ অপেক্ষা মহত্তর।

সাধারণ মানবাত্মা তাহার প্রাকৃত জীবনের অভ্যস্ত বিক্ষোভসকলে একটা সুখ পায়; যেহেতু সে এই সুখ পায় এবং যেহেতু সে এই সুখ পায় বলিয়া সে নীচের প্রকৃতির এই অশান্ত খেলাতে সায় দেয়, সেই জন্যই এই খেলা চিরকাল চলিতে থাকে; কারণ প্রকৃতি তাহার প্রণয়ী ও ভোক্তা পুরুষের সুখের জন্য না হইলে এবং তাহার অনুমতি না পাইলে কোন কর্ম্মই করে না। আমরা এই সত্য ধরিতে পারি না কারণ বাস্তবিক যখন বিপদ আমাদের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে, তখন শোক, যন্ত্রণা, অসোয়াস্তি, দুর্ভাগ্য, অকৃতকার্য্যতা, পরাজয়, নিন্দা, অপমান প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মন সেই আঘাত হইতে পিছাইয়া পড়ে, আবার ইহাদের বিপরীত ও সুখময় বিক্ষোভ উপস্থিত হইলে সকল প্রকার তৃপ্তি, সৌভাগ্য, আনন্দ, কৃতকার্য্যতা, জয়, গৌরব, প্রশংসাকে আলিঙ্গন করিয়া লইতে মন আগ্রহের সহিত লাফাইয়া উঠে; কিন্তু আত্মার সংসার লীলায় যে আনন্দ ইহাতে তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না। মনের সকল দ্বন্দ্বের পশ্চাতে আত্মার সে আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে। যোদ্ধা তাহার ক্ষতের বেদনায় কোন শারীরিক সুখ

অনুভব করে না, পরাজয়েও মানসিক তৃপ্তি লাভ করে না ; কিন্তু যুদ্ধে তাহার পূর্ণ আনন্দ, যুদ্ধে যে জয়ের আনন্দ আছে তাহার জন্য সে ক্ষত ও পরাজয়ের সম্ভাবনাকেও বরণ করিয়া লয়, এবং এই আশা আশঙ্কার মিশ্রণ যুদ্ধের জন্য তাহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। এমন কি তাহার ক্ষতের বেদনা স্মরণ করিয়াও সে সুখ ও গৌরব অনুভব করে—ক্ষত যখন সারিয়া যায় তখন এই সুখের অনুভূতি পূর্ণ, ক্ষতের যন্ত্রণা ভোগের কালেও অনেক সময় সুখের অনুভূতি থাকে এবং যন্ত্রণাবোধের দ্বারাই সেই সুখ পুষ্ট হয়। পরাজয়ের মধ্যেও তাহার এই সুখ ও গৌরব বোধ থাকে যে একজন অধিকতর বলশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সে পশ্চাৎপদ হয় নাই ; অথবা যদি সে নীচ প্রকৃতির লোক হয় তবে এই পরাজয়ের ফলে তাহার ভিতর যে ঘৃণা ও প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠে তাহার মধ্যেও সে একপ্রকার নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগ করে। এইরূপেই আত্মা সংসারের সাধারণ খেলায় আনন্দ গ্রহণ করে।

ব্যথা ও যন্ত্রণার ভয়ে মানুষ বিপদ ও উৎপাত হইতে সরিয়া থাকিতে চায়, আত্মরক্ষার নীতিকে (জুগুপ্সা) কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত ইহাই প্রকৃতির কৌশল—ব্যথা ও যন্ত্রণার প্রতি মনের এই বিরাগের জন্য মানুষ এই রক্ত মাংসের ভগ্নপ্রবণ দেহটাকে অযথা ধ্বংসের মধ্যে লইয়া যায় না এবং এইরূপেই আত্মহত্যা হইতে রক্ষা পায় ; জীবনের পক্ষে উপকারী স্পর্শ সমূহে মানুষ সুখ পায় এবং এই রাজসিক সুখের লোভ দেখাইয়াই প্রকৃতি মানুষকে জড়তা হইতে, তামসিকতা হইতে টানিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে এবং মানুষের জয়, দ্বন্দ্ব, বাসনা, কামনার ভিতর দিয়া

নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লয়। আমাদের অন্তরাত্মা এই দ্বন্দ্ব ও চেষ্টার মধ্যেই একটা সুখ পায়, এমন কি বিপদ, যন্ত্রণাতেও একপ্রকার সুখ পায়—অতীতের স্মৃতিতে সে সুখ খুবই পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান বিপদ ও যন্ত্রণার মধ্যেও সে সুখবোধ পিছনে থাকে এবং অনেক সময় সম্মুখে আসিয়া বিপদগ্রস্ত মনুষ্যের দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে ধৈর্য্য আনিয়া দেয়; কিন্তু সংসারের যে সুখ-দুঃখ-ময় মিশ্রিত খেলাকে আমরা জীবন বলি তাহার সমগ্রটির দ্বারাই বাস্তবিক পক্ষে আত্মা আকৃষ্ট হয়, জীবনের সমস্ত চেষ্টা ও বাসনা, রাগ, দ্বেষ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, জীবনের সকল প্রকার বৈচিত্র্যই প্রকৃতপক্ষে আত্মাকে আকর্ষণ করে। আমাদের রাজসিক বাসনাময় আত্মার কাছে একঘেয়ে সুখ ভাল লাগে না; বিনাযুদ্ধে যে জয়লাভ, যে সুখে বিচ্ছেদ নাই, দুঃখের ছায়া নাই, এই সবে রাজসিক আত্মা বেশীদিন তৃপ্তি অনুভব করে না, শীঘ্রই এ সব অরুচি, ক্লান্তি ও অবসাদ আনয়ন করে; পশ্চাতে অন্ধকারের ছায়া না থাকিলে কোন আলোককে পূর্ণভাবে উপভোগ করা এরূপ আত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না; কারণ এরূপ আত্মা যে সুখ চায় ও উপভোগ করে তাহার স্বরূপই এই, তাহা আপেক্ষিক—তাহার বিপরীত দুঃখ দর্শনের উপরেই সেই সুখ নির্ভর করে—বিপরীত দুঃখের আস্বাদ গ্রহণ না করিলে সে সুখের আস্বাদ পাওয়া যায় না। আমাদের মন যে জীবন লীলায় সুখ পায় তাহার গূঢ় রহস্য এই যে, আমাদের অন্তরাত্মা এই দ্বন্দ্বের খেলায় এক প্রকার আনন্দ অনুভব করে।

মনকে যদি বলা যায় যে, এই সব দ্বন্দ্ব ছাড়িয়া শুদ্ধ আনন্দময় আত্মার অমিশ্র সুখের মধ্যে উঠিতে হইবে, তাহার সকল দ্বন্দ্বে এই শুদ্ধ আত্মাই তাহাকে শক্তি দিয়াছে, ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার অস্তিত্ব সম্ভব

করিয়াছে—তাহা হইলে মন তৎক্ষণাৎ সে আহ্বান হইতে পিছাইয়া পড়িবে। সে এরূপ শুদ্ধ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না ; আর যদিই বা বিশ্বাস করে, তথাপি মনে করে যে, সেরূপ উচ্চ অবস্থায় জীবন নাই, সংসারে যে বৈচিত্র্যময় খেলার সে রস পাইয়াছে ঐ উচ্চের অবস্থায় সেই রস নাই ; সে-অবস্থা আস্বাদহীন, অরুচিকর। অথবা সে অনুভব করে যে, ঐ উচ্চ অবস্থায় উঠিতে যে কঠিন চেষ্টার প্রয়োজন, তাহা তাহার সামর্থ্যে কুলাইবে না ; উপরে উঠিবার চেষ্টা হইতে সে পশ্চাৎপদ হয়, যদিও বাস্তবিক পক্ষে বাসনাময় আত্মা যে সকল আশার স্বপ্ন দেখে সে সব সফল করা অপেক্ষা এই আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন সাধন মোটেই কঠিন নহে, অথবা এরূপ আত্মা তাহার বাসনার তৃপ্তির জন্য অস্থায়ী জিনিষের পশ্চাতে উন্মত্তভাবে ধাবমান হইয়া যে বিপুল উদ্যম ও চেষ্টা করে, বাস্তবিক পক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে তাহা অপেক্ষা বেশী চেষ্টা বা কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। তাহার অনিচ্ছার প্রকৃত কারণ এই যে, সে যে-অবস্থায় রহিয়াছে সে-অবস্থা ছাড়াইয়া তাহাকে এমন এক উচ্চতর, শুদ্ধতর অবস্থায় উঠিতে বলা হইতেছে যেখানকার আনন্দের স্বরূপ সে বুঝে না, এমন কি তাহা যে সত্যই আছে তাহাও বেশ বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু তাহার নীচের অশুদ্ধ প্রকৃতির যে-আনন্দ সেইটির সহিতই সে পরিচিত, কেবল সেইটিকেই সে বেশ বুঝিতে পারে, ধরিতে পারে। এই নীচের অবস্থাতে যে-আনন্দ তাহাও যে একেবারে দোষের বা অলাভের তাহা নহে ; আমাদের জড় সত্তা (material being) তামসিক অজ্ঞান ও জড়তার একান্ত অধীন, এই অবস্থার উপরে আমাদের মানবীয় প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইলে রাজসিক দ্বন্দ্বময় জীবনের ভিতর দিয়া, বাসনাময় জীবনের ভিতর দিয়াই যাইতে হয় ; মানুষকে যে স্তরে

স্তরে ক্রমান্বয়ে উঠিয়া পরম জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ লাভ করিতে হয়, সেই ঊর্দ্ধ গমনেরই পথে ইহা রাজসিক স্তর। গীতাতে এই স্তরকেই "মধ্যমা গতিঃ" বলা হইয়াছে; কিন্তু, আমরা যদি চিরকাল এই স্তরেই পড়িয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের ঊর্দ্ধগমন, আত্মার পূর্ণ বিকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সাত্ত্বিক সত্তা ও স্বভাবের ভিতর দিয়া ত্রিগুণের অতীত অবস্থায় যাওয়াই আত্মার পূর্ণ সিদ্ধি লাভের পন্থা।

নীচের প্রকৃতির বিক্ষোভসকল হইতে উপরে উঠিতে হইলে আমাদিগকে সমতার দিকেই যাইতে হইবে—মনের সমতা, ভাবের সমতা আত্মার সমতা—ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই। তবে মনে রাখা উচিত যে, যদিও শেষ পর্য্যন্ত আমাদিগকে নীচের প্রকৃতির তিন গুণের উপরে উঠিতে হইবে তথাপি প্রথম প্রথম আমাদিগকে এই তিন গুণের একটি না একটিকে আশ্রয় করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়। সমতার আরম্ভ সাত্ত্বিক হইতে পারে, রাজসিক হইতে পারে অথবা তামসিক হইতে পারে; কারণ মানবচরিত্রে তামসিক সমতারও সম্ভাবনা আছে। এই সমতা খাঁটি তামসিক হইতে পারে, প্রকৃতিগত জড়তার বশে জীবনের আনন্দ উপভোগে অনিচ্ছা, সংসারের সুখ দুঃখের আঘাতে অসাড়তা, ইহা খাঁটি তামসিক সমতার লক্ষণ। আবার, কামনা উপভোগের সঞ্চিত ক্লান্তি হইতে সমতা আসিতে পারে, অথবা সংসার যুদ্ধে নিরাশ ও পরাভূত হইয়া সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার প্রতি বিরাগ আসিতে পারে, সাংসারিক ব্যাপারে অবসাদ, ভয় বা আতঙ্ক আসিতে পারে; এরূপ ভাব মিশ্রিত ভাব, রজোতামসিক, তবে ইহার মধ্যে নিম্নতর গুণ তামসিকতাই প্রবল। আবার তামসিক প্রকৃতির মধ্যে

কিছু সাত্ত্বিক ভাবের দিকে ঝোঁক থাকিতে পারে, বুদ্ধি বিচারের দ্বারা উপলব্ধি হইতে পারে যে, জীবনের বাসনা সমূহের তৃপ্তি কখনই হইতে পারে না, আত্মার এমন শক্তি নাই যে সংসারকে জয় করিতে পারে, সমস্ত জীবনটাই দুঃখময় ও অনিত্য, এখানে কোন সত্য নাই, স্বস্তি নাই, আলোক নাই, সুখ নাই; এইরূপ ভাবকে সত্ত্বতামাসিক সমতা বলা যাইতে পারে, ইহা প্রকৃতপক্ষে সমতা নয়, ইহা একপ্রকার উদাসীনতা, সবই সমান ভাবে পরিত্যাগ করা—তবে এইরূপ ভাব হইতে প্রকৃত সমতা আসিতে পারে। বস্তুতঃ তামসিক সমতা প্রকৃতির আত্মরক্ষণ নীতি, জুগুপ্সা নীতিরই প্রসারণ; এই নীতির বশে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক ব্যপার হইতে লোক স্বভাবতঃ সরিয়া থাকিতে চায়; কিন্তু এই প্রবৃত্তির বশে যখন লোকে সমস্ত প্রাকৃতিক জীবনকেই দুঃখময় ভাবিয়া তাহা হইতে সরিয়া থাকিতে চায়—আত্মা যে আনন্দ চায় সংসারে সে আনন্দ নাই, তাহার পরিবর্ত্তে শুধু যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা আছে এইরূপ মনোভাবে যে সমতা তাহাই তামসিক সমতা।

কেবলমাত্র তামসিক সমতাতেই প্রকৃত মুক্তি নাই; কিন্তু প্রকৃতির উপরে অবস্থিত অক্ষর আত্মার মহত্তর সত্তা, সত্যতর শক্তি, উচ্চতর আনন্দের উপলব্ধি করিয়া এই তামসিক সমতাকে যদি সাত্ত্বিক সমতাতে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আরম্ভ হিসাবে এইরূপ সমতার শক্তি খুব; ভারতের বৈরাগ্য ধর্ম্ম (Indian asceticism) এই মার্গই অবলম্বন করে। তবে এই ভাবের স্বাভাবিক ঝোঁক হইতেছে সন্ন্যাসের দিকে, সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার দিকে, কিন্তু গীতা যে ভিতরে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সংসারে থাকিয়াই নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার উপদেশ

দিয়াছে সে-দিকে ইহার ঝোঁক নহে। গীতা কিন্তু এরূপ তামসিক সমতাকেও স্থান দিয়াছে; সংসারের দোষ, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ উপলব্ধি করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনের অনুমতি গীতায় আছে, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্ (১৩।৮); এই পথে বুদ্ধের সাধনা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ; জরা ও মরণ হইতে মোক্ষ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই যাহারা আত্ম-সংযম অভ্যাস করিতে চায় গীতায় তাহাদের পন্থা পরিত্যক্ত হয় নাই, জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে (৭।২৯)। তবে ইহা হইতে প্রকৃত কোন ফল লাভ করিতে হইলে এই সঙ্গে এক উচ্চতর অবস্থার সাত্ত্বিক উপলব্ধি চাই, এবং ভগবানে আনন্দ ও আশ্রয় গ্রহণ করা চাই, মাম্ আশ্রিত্য। তখন এই বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মা এক উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়,

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমূদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪।২০

আত্মা গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া নিজের স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তার অমৃতত্ব উপভোগ করে। বস্তুতঃ, সংসারের দুঃখ যন্ত্রণাকে বরণ করিতে যে শুধু তামসিক অনিচ্ছা তাহা মানুষকে অধোগামী ও দুর্ব্বলই করিয়া দেয়, এবং নির্ব্বিশেষে সকলকে সন্ন্যাস ও সংসারবৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়া এইজন্যই বিপজ্জনক যে, এরূপ শিক্ষার ফলে অযোগ্য আত্মায় তামসিক দুর্ব্বলতা ও তামসিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, বুদ্ধিভেদ উপস্থিত হয়, "বুদ্ধিভেদম্ জনয়েৎ", উচ্চতর লক্ষ্য ও সাধনা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য যখন আত্মার হয় নাই তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করিবার নিমিত্ত; আত্মার কল্যাণেরই নিমিত্ত যে রাজসিক চেষ্টা ও দ্বন্দ্ব প্রয়োজন তাহা দমাইয়া দেওয়া হয়, জীবনের প্রতি ভালবাসা,

ধৃতি ও উৎসাহ কমাইয়া দিয়া আত্মার অনিষ্টই করা হয়। কিন্তু যে সকল আত্মা যোগ্য হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এরূপ তামসিক বৈরাগ্য উপকারী হইতে পারে; তাহাদের যে রাজসিক বাসনা ও নিম্নস্তরের জীবনের প্রতি তীব্র আগ্রহ তাহাদের সাত্ত্বিক উচ্চজীবন লাভের অন্তরায়, এই তামসিক বৈরাগ্য দ্বারা তাহা বিনষ্ট হয়। এইরূপ বৈরাগ্যের দ্বারা তাহারা জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি করে সেই অবস্থায় একটা আশ্রয় খুঁজিতে গিয়া তাহারা ভগবানের আহ্বান শুনিতে পায়—"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্"—"এই অনিত্য ও দুঃখময় সংসারে কে রহিয়াছ, এস, আমাতে আনন্দ গ্রহণ কর।"

তথাপি এই সমতা সংসারের সকল জিনিষেরই প্রতি সমান বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহার ফল হয় উপেক্ষা ও উদাসীনতা, কিন্তু ইহার মধ্যে সে শক্তি নাই যাহার দ্বারা সংসারের সকল প্রকার সুখ ও দুঃখের স্পর্শ সমানভাবে অনাসক্তি ও নির্ব্বিকারতার সহিত গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং এইটি হইতেছে গীতোক্ত সাধনার আবশ্যকীয় অঙ্গ। অতএব তামসিক বৈরাগ্যের কোন প্রয়োজনই নাই, আর যদিই আমরা ইহা লইয়া আরম্ভ করি, সেটা শুধু উচ্চতর সাধনায় আমাদিগকে প্রথমে প্রবৃত্ত করিবার জন্য, কিন্তু চিরকাল বিষাদে নিমগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য নহে। আমরা প্রথমে যে সকল জিনিষ হইতে পলাইয়া যাইতে চাই, যখন সে সকল জিনিষকে জয় করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে চেষ্টা করিব তখনই প্রকৃত সাধনার আরম্ভ হইবে। এইখানেই একপ্রকার রাজসিক সমতার সম্ভাবনা আসে; চিত্তবিক্ষোভ ও দুর্ব্বলতার উপরে উঠিতে, আত্মসংযম, আত্মজয় করিতে শক্তিশালী লোক

যে-গর্ব্ব অনুভব করে তাহা এই রাজসিক সমতার নিম্নতম অবস্থা ; এই মনোভাব হইতে আরম্ভ করিয়া এবং ইহাকে মূল সূত্ররূপে ধরিয়া নীচের প্রকৃতির সকল দুর্ব্বলতার বশ্যতা হইতে আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিবার যে সাধনা তাহাই স্তোয়িক আদর্শ (stoic ideal)। তামসিক অন্তর্মুখী বৈরাগ্য যেমন প্রকৃতির আত্মরক্ষণ নীতির, জুগুপ্সানীতির প্রসারণ, রাজসিক ঊর্দ্ধমুখী সাধনাও তেমনি প্রকৃতির যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বের নীতির, প্রভুত্ব ও জয়ের দিকে জীবনের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তির প্রসারণ ; তবে কেবলমাত্র যে-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জয় সম্ভব সেই ক্ষেত্রেই এই যুদ্ধ লইয়া যাওয়া হয়। সাধক নানা বিক্ষিপ্ত বাহ্যিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে এবং সাময়িক সাফল্য ও জয় লাভ করিতে চেষ্টা না করিয়া আধ্যাত্মিক সাধনা ও অন্তর্জয়ের দ্বারা একেবারে প্রকৃতিকে এবং জগৎকে জয় করিতে চায়। তামসিক বৈরাগ্য সংসারের সুখ ও দুঃখ উভয় হইতেই সরিয়া পলাইতে চায় ; রাজসিক সাধনা তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে সহ্য করিতে, জয় করিতে, তাহাদের উপরে উঠিতে চায়। মহাভারতে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র যেমন লৌহ ভীমকে আলিঙ্গনের মধ্যে টানিয়া লইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই স্তোয়িক সাধনা কুস্তিগিরের ন্যায় বাসনা ও রিপুগণকে আলিঙ্গনের ভিতরে লইয়া তাহাদিগকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। যে সকল সুখের বা দুঃখের জিনিষ শরীর ও মনের চাঞ্চল্যের কারণ, স্তোয়িক সাধক তাহাদের আঘাত সহ্য করিয়া তাহাদের ফল ধ্বংস করিয়া দেয়। এই সাধনা তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন আত্মা কিছুতেই ক্লিষ্ট বা আকৃষ্ট না হইয়া, কোনরূপ উত্তেজিত বা ব্যথিত না হইয়া সকল প্রকার বাহ্যস্পর্শ সহ্য করিতে পারে। এই সাধনা

চায় যে, মানুষ তাহার প্রকৃতিকে জয় করুক, তাহার প্রকৃতির রাজা হউক।

গীতা অর্জ্জুনের ক্ষাত্র স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়া এই বীরোচিত সাধনার কথাই প্রথমে বলিয়াছে। তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে পরম শত্রু কামনাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিতে। গীতা সমতার যে প্রথম বর্ণনা দিয়াছে তাহা ষ্টোয়িক দার্শনিকেরই সমতা,

দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে ॥ ২।৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২।৫৭

"যাঁহার মন দুঃখের মাঝে অবিচলিত এবং সুখের মাঝে স্পৃহাশূন্য, যাঁহা হইতে আসক্তি ও ক্রোধ ও ভয় দূর হইয়াছে, সেইরূপ মুনিকেই স্থিতধী বলা হয়। যিনি সর্ব্ববিষয়ে স্নেহশূন্য, কোন শুভ বা কোন অশুভ আসিলে যিনি আনন্দিত হন না বা দ্বেষ করেন না তাঁহার বুদ্ধি জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত।" গীতা একটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছে, যদি কেহ আহার করিতে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হয় না বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের যে লালসা, "রস", তাহা থাকিয়াই যায়; কেবল যখন বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়াও ইন্দ্রিয় বাহ্য ভোগের জন্য লালায়িত হয় না, আস্বাদ-সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে, শুধু তখনই হয় আত্মার উচ্চতম অবস্থা। রাগ দ্বেষ হইতে মুক্ত, আত্মবশীভূত মানসিক ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা বিষয়ের উপর বিচরণ করিয়াই আত্মার ও প্রকৃতির উদার ও মধুর স্বচ্ছতা লাভ হয়, সেখানে শোক বা দুঃখের কোন স্থান নাই,

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।

আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২।৬৪

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। ২।৬৫

যেমন নদীর জল সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয় না, সেইরূপে বাসনসমূহ আত্মায় প্রবেশ করিবে অথচ আত্মা তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইবে না; এইরূপে অবশেষে সমস্ত বাসনা বর্জ্জন করা যায়। ক্রোধ ও বিক্ষোভ হইতে মুক্ত হওয়া, ভয় ও আকর্ষণ হইতে মুক্ত হওয়া যে মুক্ত অবস্থার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা পুনঃ পুনঃ বিশেষ জোর দিয়া বলা হইয়াছে, এবং ইহার জন্য আমাদিগকে এই সকলের বেগ সহ্য করিতে শিখিতেই হইবে, কিন্তু ইহাদের কারণের সম্মুখীন না হইলে তাহা সম্ভব হয় না,

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।

কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ৫।২৩

"এই সংসারে, এই দেহেই যিনি কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সুখী। ইহার উপায় হইতেছে "তিতিক্ষা"—সহ্য করিবার সঙ্কল্প ও শক্তি,

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ২।১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ২।১৫

"বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শই শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখের কারণ, এই সকল স্পর্শ আসে যায়, অনিত্য, ইহাদিগকে সহ্য করিতে শিক্ষা

কর। কারণ যে-ব্যক্তি এই সকল বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে ব্যথিত বা বিচলিত হন না, যে ধীর ও জ্ঞানী ব্যক্তি সুখে দুঃখে সমান, তিনি অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হন।" যাঁহার আত্মা সমভাবাপন্ন (equal-souled) তিনি দুঃখভোগ করেন কিন্তু ঘৃণা করেন না, তিনি সুখ গ্রহণ করেন কিন্তু উল্লসিত হন না। এমন কি সহিষ্ণুতা দ্বারা শারীরিক যন্ত্রণাকেও জয় করিতে হইবে এবং ইহাও স্তোয়িক সাধনার অঙ্গ। জন্ম, মৃত্যু, দুখ, যন্ত্রণা হইতে পলায়ন করা হইবে না, তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে নিতান্ত উপেক্ষার দ্বারা জয় করিতে হইবে*। নীচের খেলায় প্রকৃতির ছদ্মবেশসকল দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করা নহে, কিন্তু সে-সবের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে জয় করাই তেজস্বী পুরুষসিংহের (পুরুষর্ষভ) সত্য সহজাত প্রেরণা। এইরূপে বাধ্য হইয়া প্রকৃতি তাহার ছদ্মবেশ দূর করিয়া দেয়, পুরুষ যে মুক্ত আত্মা, তাহার সেই প্রকৃত স্বরূপ পুরুষকে দেখাইয়া দেয়—পুরুষ তখন বুঝিতে পারে যে, সে প্রকৃতির দাস নহে, সে প্রকৃতির অধীশ্বর, স্বরাট, সম্রাট।

কিন্তু গীতা এই স্তোয়িক (stoic) সাধনা, এই বীরোচিত আদর্শ শুধু সেই সর্ত্তে স্বীকার করিয়াছে যে-সর্ত্তে গীতা তামসিক বৈরাগ্যও স্বীকার করিয়াছে,—ইহার উপরে থাকা চাই জ্ঞানের সাত্ত্বিক দৃষ্টি, ইহার মূলে থাকা চাই আত্মস্বরূপ লাভের লক্ষ্য, এবং ইহার গতি

---

* গীতা বলিয়াছে, ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ; তেজস্বী ও জ্ঞানী পুরুষ তাহা দ্বারা ব্যথিত হন না, বিচলিত হন না, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন না। তথাপি তাহাদিগকে স্বীকার করা হয়, কেবল জয় করিবার জন্যই, জরামরণমোক্ষায় যতন্তি।

হওয়া চাই উর্দ্ধে দিব্যজীবন লাভের দিকে। যে স্তোয়িক সাধনা কেবল মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলবৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেয়, তাহা তামসিক ক্লান্তি, নিস্ফল বিষাদ এবং বন্ধ্যা জড়তা হইতে কম বিপজ্জনক বটে কিন্তু তাহা একেবারে অমিশ্র মঙ্গল নহে কারণ তাহা হইতে প্রকৃত আধ্যাত্মিক মুক্তি না আসিয়া কেবল হৃদয়হীনতা এবং নিষ্ঠুর উদাসীনতা আসিতে পারে। গীতার সাধনায় স্তোয়িক সমতা সমর্থিত হইয়াছে শুধু এইজন্য যে, এইরূপ সমতার সহিত আত্মার অক্ষরাবস্থার একটা সম্বন্ধ পাওয়া যাইতে পারে এবং এইরূপ সমতার সাহায্যে সেই মুক্ত অক্ষর আত্মার স্বরূপ বুঝিবার (পরং দৃষ্ট্বা) এবং সেই নূতন আত্মজ্ঞানে স্থিতি লাভ করিবার (এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ) সহায়তা হইতে পারে,

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৩।৪৩

"বুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া, আত্মাকে আত্মশক্তির প্রয়োগেই ধীর ও নিশ্চল কর এবং এই দুর্নিবার শত্রু কামকে বিনাশ কর।" সাত্বিকতার ভিতর দিয়া আত্মজ্ঞান লাভই যখন লক্ষ্য শুধু তখনই তাহার সহায়স্বরূপ তামসিক বৈরাগ্য বা রাজসিক দ্বন্দ্ব ও জয়ের সার্থকতা আছে, নতুবা তাহাদিগকে সমর্থন করা যায় না।

দার্শনিক, মনীষী, জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল নিজের আদর্শ সমর্থনের জন্যই সত্ত্বগুণের উপর নির্ভর করেন না, কিন্তু প্রথম হইতেই তাঁহার প্রকৃতির সাত্বিকতার সাহায্যে আত্মজয়ের সাধনা করেন। সাত্বিক সমতা হইতেই তাঁহার সাধনা আরম্ভ। তিনিও লক্ষ্য করেন যে, বাহ্য ও জড় জগৎ

অনিত্য, তাহা হইতে বাসনার তৃপ্তি হয় না, বা প্রকৃত আনন্দলাভ করা যায় না, কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে শোক ভয় বা নিরাশার উদয় হয় না। তিনি শান্ত বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিতে সব দেখেন এবং দ্বেষ বা মোহের বশীভূত না হইয়া নিজের অভীষ্ট নির্ণয় করেন।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।। ৫।২২

"বস্তুর সংস্পর্শ হইতে যে সকল ভোগসুখ উৎপন্ন হয় সে-সকল পরিণামে দুঃখের কারণ তাহাদের আদি আছে, অন্ত আছে; অতএব যিনি জ্ঞানী, যাঁহার বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে (বুধঃ) তিনি সে সকল ভোগে আনন্দলাভ করেন না। "তাঁহার আত্মা বাহ্য বস্তুর স্পর্শে আসক্ত হয় না, তিনি আপনাতেই আপনার আনন্দের সন্ধান পান।"

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্। ৫।২১

তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজেই নিজের বন্ধু, আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ অতএব তিনি নিজের প্রভুত্ব বর্জন করিয়া নিজেকে কাম, ক্রোধাদির হস্তে ছাড়িয়া দেন না, নাত্মানমবসাদয়েৎ, কিন্তু নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তির সাহায্যে কাম-ক্রোধাদির বশ্যতা হইতে নিজেকে উদ্ধার করেন, উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং; কারণ যিনি নিজের নিম্নতন আত্মাকে জয় করিয়াছেন তিনিই দেখিতে পান যে, তাঁহার ঊর্দ্ধতন আত্মার মত তাঁহার পরম বন্ধু ও সহায় আর কেহ নাই, বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ (৬।৬)। তিনি হন জ্ঞানে পরিতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, সাত্ত্বিক সমতার

দ্বারা যোগী*, তিনি মৃত্তিকা, প্রস্তর ও স্বর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি শীত উষ্ণে, সুখ দুঃখে, মান অপমানে সমভাবাপন্ন ও প্রশান্ত।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৬।৮

শত্রু, মিত্র, উদাসীন মধ্যস্থ সকলের প্রতিই তাঁহার সমভাব, কারণ তিনি দেখেন যে, এই সকল সম্বন্ধ অনিত্য, জীবনের চির-পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা হইতে এই সকল সম্বন্ধের উৎপত্তি। এমন কি মানুষ বিদ্যার, শুচিতার, পুণ্যের দাবী করিয়া যে ছোট বড়, উচ্চ নীচ বিচার করে, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতেও বিভ্রান্ত হন না। সাধু ও অসাধুর প্রতি, পুণ্যবান, বিদ্বান, উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ এবং পতিত চণ্ডালের প্রতি—সকলের প্রতিই তিনি সমবুদ্ধিসম্পন্ন। গীতা এইরূপে সাত্ত্বিক সমতার বর্ণনা করিয়াছে; বিজ্ঞ ব্যক্তির যে শান্ত জ্ঞানসম্মত সমতার সহিত জগৎ পরিচিত, গীতার এই সাত্ত্বিক সমতার বর্ণনায় তাহার সারটুকু সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

তাহা হইলে এই সমতা এবং গীতা যে উদারতর সমতার শিক্ষা দিয়াছে, এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? বিচার বিতর্কের দ্বারা যে বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞান পাওয়া যায় তাহার সহিত আধ্যাত্মিক বৈদান্তিক ঐক্য জ্ঞানের যে প্রভেদ, এই দুই সমতার মধ্যেও সেই প্রভেদ; এই উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপরে, বৈদান্তিক ঐক্যজ্ঞানের উপরেই গীতা শিক্ষার ভিত্তি। দার্শনিক পণ্ডিতগণ সাধারণ মন বুদ্ধি দ্বারা বিচার বিতর্ক করিয়া ভিতরে সমভাব রক্ষা করেন; কিন্তু সমতার শুধু এইরূপ ভিত্তি মোটেই

* কারণ সমতাই যোগ, সমত্বং যোগ উচ্যতে (২।৪৮)।

দৃঢ় নহে। কারণ যদিও দার্শনিক বিজ্ঞ ব্যক্তি সতত সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া অথবা মনের অভ্যাসের দ্বারা নিজেকে নিজের বশে রাখেন, তথাপি বাস্তবিক পক্ষে তিনি তাঁহার নীচের প্রকৃতি হইতে মুক্ত নহেন, নানাদিক দিয়া নানাভাবে এই নীচের প্রকৃতি তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহাকে প্রত্যাখ্যান ও দমন করা হইয়াছে বলিয়া সেই প্রকৃতি যে কোন মুহূর্ত্তে সুযোগ পাইয়া ভীষণ প্রতিশোধ লইতে পারে। কারণ নীচের প্রকৃতির খেলা সকল সময়েই ত্রিধা খেলা, সত্ত্ব, রজঃ, তমের খেলা, এবং সাত্ত্বিক মনুষ্যকে কবলিত করিবার জন্য রজঃ ও তমঃ সতত ওৎ পাতিয়া থাকে।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ২।৬০

"সিদ্ধিলাভে যত্নশীল জ্ঞানী ব্যক্তির মনকেও প্রবল বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক হরণ করে।" সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হইতে হইলে সত্ত্বগুণের উপরে, বুদ্ধির উপরে (বুদ্ধেঃ পরং) যে আত্মপুরুষ রহিয়াছে তাহার আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন আর অন্য উপায় কিছুই নাই—ঐ আত্মপুরুষ দার্শনিকের মনোময় পুরুষ নহে কিন্তু দিব্য ঋষির বিজ্ঞানময় পুরুষ; উহা গুণত্রয়ের অতীত। সকল সাধনার উদ্‌যাপন করিতে হইবে উর্দ্ধের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে দিব্য জন্মলাভ করিয়া।

দার্শনিক জ্ঞানীর যে সমতা তাহা স্তোয়িক সাধকের সমতার ন্যায়, বা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর সমতার ন্যায়ই মানুষ হইতে স্বতন্ত্র ও দূরে নিজের মধ্যেই নিজে থাকার নির্জ্জন সমতা; কিন্তু যে ব্যক্তি দিব্য জন্মলাভ করিয়াছেন তিনি শুধু নিজের মধ্যেই নহে, কিন্তু সকলের মধ্যেই

ভগবানকে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি সকলের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, অতএব তাঁহার সমতা সহানুভূতি ও ঐক্যে পরিপূর্ণ। তিনি সকলকে নিজের সহিত অভিন্ন দেখেন এবং নিজের একক মুক্তির জন্য মোটেই ব্যগ্র নহেন; বরং তিনি অপরের সুখ দুঃখের বোঝা নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লন, যদিও তিনি নিজে সে সুখ দুঃখের দ্বারা বিচলিত বা বশীভূত হন না। গীতা একাধিকবার বলিয়াছে যে, সিদ্ধ জ্ঞানী সর্ব্বদা উদার সমতার সহিত সকলের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকেন, এইরূপ হিতসাধনেই তিনি কাজ পান, আনন্দ পান, সর্ব্বভূত-হিতে রতাঃ। পরম-সিদ্ধ যোগী কেবল উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে বাস করিয়া নির্জ্জনে আত্মধ্যানে নিমগ্ন থাকেন না, পরন্তু তিনি যুক্তঃ কৃৎস্ন-কর্ম্মকৃৎ, জগতের মঙ্গলের জন্য, জগতের মধ্যেই যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার জন্য, তিনি সর্ব্বকর্ম্মকারী, সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মী। কারণ তিনি যেমন একজন ঋষি, একজন যোগী, তেমনিই আবার তিনি একজন ভক্ত, একজন ভাগবত প্রেমিক,—প্রেমিক তিনি, ভগবানকে যেখানে দেখেন সেইখানেই ভালবাসেন এবং তিনি সর্ব্বত্রই ভগবানকে দেখিতে পান; আবার, তিনি যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে সেবা করিতে তিনি বিমুখ হন না; তাঁহার কর্ম্ম তাঁহাকে মিলনসুখ হইতেও বঞ্চিত করে না, কারণ তাঁহার সকল কর্ম্ম তাঁহার হৃদিস্থিত ভগবান হইতেই উত্থিত হয় এবং সর্ব্বভূতে যে এক ভগবান বিরাজিত রহিয়াছেন তাঁহারই উদ্দেশে সম্পাদিত হয়। গীতার সমতা উচ্চ, উদার সমতা, এই সমতায় সবই ভাগবত সত্তা ও ভাগবত প্রকৃতির একত্বের মধ্যে উত্তোলিত হয়।

সমতা ও জ্ঞান

গীতার শিক্ষার এই গোড়ারদিকে যোগ ও জ্ঞান আত্মার ঊর্দ্ধগমনের দুই পক্ষ স্বরূপ। বাসনাশূন্য হইয়া, সকল বস্তু ও সকল লোকের প্রতি সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া, পরমেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞস্বরূপ যে দিব্য কর্ম্ম করা যায় সেই কর্ম্মের ভিতর দিয়া মিলনই যোগ, আর যাহা এই বাসনা-শূন্যতা, এই সমতা, এই যজ্ঞশক্তির ভিত্তি তাহাই জ্ঞান। বস্তুতঃ এই দুই পক্ষই পরস্পরকে উড়িতে সাহায্য করে; মানুষের দুইটি চক্ষু যেমন একের পর একটি দেখে বলিয়াই একই সঙ্গে দেখিতে পারে, তেমনি যোগ ও জ্ঞান সূক্ষ্মভাবে ক্রমান্বয়ে পরস্পরকে সাহায্য পূর্ব্বক একই সঙ্গে কার্য্য করিয়া পরস্পরকে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করে। কর্ম্ম যেমন ক্রমশঃ বেশী বেশী নিষ্কাম হয়, সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়, যজ্ঞ-ভাবাপন্ন হয়, তেমনিই জ্ঞানও বর্দ্ধিত হইতে থাকে; আবার জ্ঞান যেমন বর্দ্ধিত হয় সেই সঙ্গে আত্মাও বাসনাশূন্যতায়, যজ্ঞার্থে কর্ম্মের সমতায় দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই গীতা বলিয়াছে যে, সকল প্রকার দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ বড় (৪।৩৩)।

"অপি চেদসিপাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি। ৪।৩৬

* * *

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। ৪।৩৮

"যদি তুমি সমুদয় পাপী অপেক্ষাও অধিকতর পাপকারী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ নৌকার দ্বারা সমুদয় পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে। ইহলোকে

জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই।" জ্ঞানের দ্বারা কামনা এবং কামনার জ্যেষ্ঠ সন্তান পাপ ধ্বংস হয়। মুক্ত মানব যজ্ঞরূপে কর্ম্ম করিতে পারেন কারণ তাঁহার মন, হৃদয় ও আত্মা আত্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, গতসঙ্গস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (৪।২৩)। তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইবামাত্র অদৃশ্য হয়, ব্রহ্মে লয়-প্রাপ্ত হয়, প্রবিলীয়তে; সে-কর্ম্ম তাঁহার আত্মার উপর কোন প্রতি-ক্রিয়ার ফল রাখিয়া যায় না, কোন দাগ বা সংস্কার রাখিয়া যায় না। তাঁহার প্রকৃতির ভিতর দিয়া ভগবানই সেই কর্ম্ম সম্পাদন করেন, সেই কর্ম্ম মানুষের নিজের নহে, মানুষ কেবল যন্ত্রমাত্র। কর্ম্মটিও তখন হয় ব্রহ্ম সত্তারই শক্তি (৪।২৪)।

এই অর্থেই গীতা বলিয়াছে যে, সমস্ত কর্ম্ম সমাপ্ত হয়, সম্পূর্ণ হয় জ্ঞানে, সর্ব্বং কর্ম্মাখিলম্ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৪।৩৭

—"প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্মরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।" ইহার দ্বারা মোটেই বোঝায় না যে, যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়, তখন কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়। ইহার প্রকৃত অর্থ গীতা খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছে,—

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪।৪১

—"যিনি জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয় নষ্ট করিয়াছেন এবং যোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়াছেন এবং আত্মাকে পাইয়াছেন সেরূপ

ব্যক্তি নিজের কর্ম্মরাশির দ্বারা বদ্ধ হন না।" আর একস্থানে গীতা বলিয়াছে, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে (৫।৭)—যাঁহার আত্মা সর্ব্বভূতের আত্মা হইয়াছে, তিনি কর্ম্ম করেন কিন্তু সে কর্ম্ম তাহাকে স্পর্শ করে না, তিনি সেই কর্ম্মের জালে বদ্ধ হন না, তাঁহার আত্মাকে মুগ্ধ করিতে পারে এমন কোন প্রতিক্রিয়া ঐ কর্ম্ম হইতে সৃষ্টি হয় না, কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। অতএব, গীতার মতে বাহ্য কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ ভাল, কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে (৫।২), কারণ দেহবান লোককে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিতেই হয়, এবং সেইজন্য তাহাদের পক্ষে বাহ্যকর্ম্ম-সন্ন্যাস কঠিন ব্যাপার, দুঃখমাপ্তুমু্, কিন্তু অন্যদিকে কর্ম্মযোগই যথেষ্ট, কর্ম্মযোগ সহজে এবং দ্রুতগতিতে জীবকে ব্রহ্মে লইয়া আসিতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, এই কর্ম্মযোগ হইতেছে সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করা; ইহাতে বাহিরে কর্ম্মত্যাগ করিতে হয় না, কেবল ভিতরে ত্যাগ করিতে হয়, শারীরিক কর্ম্মত্যাগ নহে, আধ্যাত্মিকভাবে সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মে, পরমেশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়, ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি (৫।১০), ময়ি সংন্যস্য (৩।৩০)। এইরূপে কর্ম্মরাশি যখন ব্রহ্মে সংন্যস্ত হয়, তখন যন্ত্রের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব কিছু থাকে না; সে কর্ম্ম করিয়াও কিছু করে না; কারণ সে শুধু কর্ম্মফল ত্যাগ করে নাই কিন্তু সমস্ত কর্ম্ম এবং তাহাদের সম্পাদনও ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছে। তখন ভগবান স্বয়ং তাহার নিকট হইতে তাহার কর্ম্মের বোঝা তুলিয়া লন; পরমেশ্বরই তখন কর্ত্তা কর্ম্ম এবং ফল সবই হন।

গীতা এই যে জ্ঞানের কথা বলিয়াছে ইহা মানসিক বুদ্ধি বিচারের ক্রিয়া নহে ; সত্যের * দিব্য সূর্য্যালোকে বৰ্দ্ধিত হইয়া সত্তার উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্তিকেই গীতাতে জ্ঞান নাম দেওয়া হইয়াছে। দুঃখদ্বন্দ্বময় অশান্ত নীচের প্রকৃতি হইতে বহু উর্দ্ধে, নির্ম্মল অধ্যাত্ম আকাশে অক্ষর ব্রহ্ম বিরাজিত, এখানকার পাপও তাঁহাকে স্পর্শ করে না, পুণ্যও তাঁহাকে স্পর্শ করে না, আমাদের পাপের বোধও তিনি গ্রহণ করেন না, পুণ্যের বোধও তিনি গ্রহণ করেন না ; নীচের প্রকৃতির সুখ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না, আমাদের জয়েতে যে সুখ তাহাতেও তিনি উদাসীন, আমাদের পরাজয়ে যে দুঃখ তাহাতেও তিনি উদাসীন ; তিনি সকলের ঈশ্বর, পরমতম, সৰ্ব্বব্যাপী, প্রভু, বিভূ, শান্ত, তেজস্বী, শুদ্ধ, সৰ্ব্ববস্তুতে সমান, প্রকৃতির মূল ; তিনি সাক্ষাৎভাবে আমাদের কৰ্ম্মের কৰ্ত্তা নহেন, কিন্তু প্রকৃতি ও প্রকৃতির কৰ্ম্মের সাক্ষী ; কৰ্ত্তা বলিয়া আমাদের যে-ভ্রম এই ভ্রমও তাঁহার দেওয়া নহে, নীচের প্রকৃতির অজ্ঞান হইতেই এই ভ্রমের উৎপত্তি। কিন্তু এই মুক্তি, এই ঈশ্বরত্ব, এই শুদ্ধতা আমরা দেখিতে পাই না ; প্রকৃতিগত অজ্ঞানের দ্বারা আমরা মোহগ্রস্ত, তাই আমাদের অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের যে সনাতন আত্মজ্ঞান লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা আমরা দেখিতে পাই না, অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। কিন্তু যাঁহারা অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত জ্ঞানের অনুসন্ধান করেন, তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিয়া তাঁহাদের প্রকৃতিগত অজ্ঞান দূর করিয়া দেয় ; বহুকাললুক্কায়িত সূর্য্যের ন্যায়

* এই সত্য সম্বন্ধেই ঋগ্বেদ বলিয়াছে :—"তৎ সত্যম্ সূর্য্যম্ তমসি ক্ষীয়ন্তম্", আমাদের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের আবরণে লুক্কায়িত সূর্য্যই সেই সত্য।

এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং এই নীচের প্রকৃতির দ্বন্দ্বসকলের উর্দ্ধে অবস্থিত পরম স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তাকে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া দেয়,

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম ॥ ৫।১৬

বহুকাল একাগ্রভাবে সাধনা করিয়া, আমাদের সমুদয় চেতন সত্তাকে তদভিমুখী করিয়া, তাহাকেই আমাদের সমগ্র লক্ষ্য করিয়া, আমাদের বুদ্ধির একমাত্র বিষয় করিয়া এবং এইরূপে শুধু আমাদের মধ্যেই নহে কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহাকে দেখিয়া আমরা তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মনঃ হই, জ্ঞানরূপ সলিলের * দ্বারা আমাদের নীচের প্রকৃতির সমস্ত দুঃখ, পাপ ও অজ্ঞান ধৌত হইয়া যায়,

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ৫।১৭

—ইহার ফল হয় এই যে, সকল বস্তু ও সকল ব্যক্তির প্রতি পূর্ণ সমভাব হয়, গীতা বলিয়াছে ; কেবল তখনই আমরা আমাদের কর্ম্ম সম্পূর্ভাবে ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে পারি। কারণ, ব্রহ্ম সমস্বরূপ, সমং ব্রহ্ম, যখন আমাদের এইরূপ পূর্ণ সমভাব হয়, সাম্যে স্থিতং মনঃ, যখন আমরা বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে সমদর্শী হই, এবং সকলকে এক ব্রহ্ম বলিয়া জানি, কেবল তখনই সেই

---

* ঋগ্বেদ এইরূপে সত্যের স্রোতধারার কথা বলিয়াছে,এই জলে পূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান, এই জল দিব্য সূর্য্যালোকে পরিপূর্ণ, ঋতস্য ধারাঃ, আপে বিচেতসঃ, সর্ব্বতীর আপঃ। এখানে যাহা উপমামাত্র, বেদ তাহা স্থূল রূপক।

একত্বের মধ্যে বাস করিয়া আমরা ব্রহ্মের মতই দেখিতে পারি যে, আমাদের কর্ম্মসমুহ প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত হইতেছে, তখন আর আসক্তি, পাপ বা বন্ধনের ভয় থাকে না। তখন আর দোষ বা পাপ হইতে পারে না; কারণ তখন আমরা কামনা ও কামনাজাত কর্ম্ম ও প্রতিক্রিয়ায় পূর্ণ অজ্ঞানের খেলাকে, সংসারকে জয় করিয়াছি, তৈর্জিতঃ সর্গঃ, এবং পরম দিব্য প্রকৃতির মধ্যে বাস করায় তখন আর আমাদের কর্ম্মে কোন দোষ বা ত্রুটি থাকে না; কারণ এই সমস্ত দোষ ত্রুটি অজ্ঞানের অসমতা হইতেই উদ্ভূত। সমান ব্রহ্ম দোষশূন্য, নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম, পাপপুণ্যের গণ্ডগোলের উপরে; ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিয়া আমরাও পাপ পুণ্যের উপরে উঠি; আমরা সেই শুচিতায় নির্ম্মলভাবে সমতার সহিত সর্ব্বভূতের হিত কামনাকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম করি, ক্ষীণকল্মষাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। আমাদের অজ্ঞানের অবস্থাতেও আমাদের হৃদিস্থিত ঈশ্বরই আমাদের কর্ম্মের কারণ, তবে তিনি তাঁহার মায়ার ভিতর দিয়া, আমাদের নীচের প্রকৃতির অহঙ্কারের ভিতর দিয়া আমাদিগকে পরিচালিত করেন; এই প্রকৃতিই আমাদের কর্ম্মসমূহের জটিল জাল সৃষ্টি করে এবং তাহাদের জটিল প্রতিক্রিয়া-সকলের প্রতিঘাত আমাদের অহংয়ের উপর আনিয়া দেয়, সেই সব প্রতিক্রিয়াই আভ্যন্তরীণ ভাবে পাপ ও পূণ্যরূপে এবং বাহ্যিক-ভাবে দুঃখ ও সুখরূপে, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যরূপে আমাদিগকে বিচলিত করে; ইহাই কর্ম্মের বিরাট শৃঙ্খল। যখন আমরা জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হই, তখন ঈশ্বর আর আমাদের হৃদয়ে গুপ্তভাবে থাকেন না, আমাদের পরম আত্মারূপে সাক্ষাৎভাবে আমাদের সমুদয় কর্ম্ম গ্রহণ করেন,

জগতের সাহায্যের নিমিত্ত আমাদিগকে নির্দ্দোষ যন্ত্রভাবে, নিমিত্ত মাত্রম্, ব্যবহার করেন। জ্ঞান ও সমতার নিগূঢ় মিলন এইরূপই; বুদ্ধিতে যাহা জ্ঞান তাহাই প্রকৃতিতে সমভাব রূপে প্রতিফলিত; ঊর্দ্ধে, চেতনার উচ্চতর ভূমিতে জ্ঞান হয় সত্তার জ্যোতি এবং সমতা হয় প্রকৃতির উপাদান।

এই "জ্ঞান" শব্দটি ভারতীয় দর্শন ও যোগশাস্ত্রে সর্ব্বত্র এই পরম আত্মজ্ঞানের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে; যে জ্যোতির দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া আমরা আমাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হই তাহাই জ্ঞান; যে জ্ঞানের দ্বারা আমরা নানা বিষয় জানিতে পারি, নানাদিক হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের মনের ভাণ্ডার পূর্ণ করি, ভারতীয় শাস্ত্রে তাহাকে জ্ঞান বলা হয় নাই; পাশ্চাত্যদেশে জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, সৌন্দর্য্যনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতিই জ্ঞান বলিয়া পরিচিত, ভারতে জ্ঞান বলিতে এ সব বুঝায় না। এই সব জ্ঞানের দ্বারাও যে আমাদের বিকাশে সাহায্য হয় তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে এ-সব জীবনের বিবর্ত্তনে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু আত্মস্বরূপলাভে কোন সাহায্য করিতে পারে না। যৌগিক জ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যে এই সব জ্ঞান তখনই স্থান পায় যখন পরমতমকে, আত্মাকে, ভগবানকে জানিবার জন্য আমরা ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করি; যখন জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জগতের বাহ্য দৃশ্য ও ঘটনাবলীর রহস্য ভেদ করি এবং তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের কারণ স্বরূপ যে এক সত্য বস্তু রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাই, যখন মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা নিজদিগকে জানিতে পারি, আমাদের ভিতর নীচের খেলা ও উপরের খেলার প্রভেদ, অপরা প্রকৃতি ও

পরা প্রকৃতির প্রভেদ বুঝিতে পারি এবং একটিকে বর্জ্জন করিয়া অপরটিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, যখন দর্শনশাস্ত্রের আলোকে আমরা জগতের মূলতত্ত্বগুলি জানিতে পারি এবং যাহা সৎ, যাহা নিত্য তাহার মধ্যে বাস করিতে পারি, যখন নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে আমরা পাপপুণ্যের প্রভেদ বুঝিতে পারি এবং পাপকে বর্জ্জন করিয়া, পুণ্যেরও উপরে উঠিয়া দিব্য প্রকৃতির শুদ্ধ পবিত্রতার মধ্যে বাস করিতে পারি, যখন কলাবিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা দিব্য সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাই, যখন সাংসারিক ব্যবহারিক জ্ঞানের সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান তাঁহার জীবগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন এবং মানুষের সেবার ভিতর দিয়া ভগবানেরই সেবা করিতে এই জ্ঞানকে লাগাইতে পারি, কেবল তখনই এই সকল জ্ঞানকে যৌগিক জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে ; তখনও এই সব জ্ঞান কেবলমাত্র সহায়তাই করিতে পারে ; প্রকৃত যে-জ্ঞান তাহা মনের অগোচর, মন কেবল তাহার ছায়ামাত্র পাইতে পারে, সে জ্ঞানের স্থান হইতেছে আত্মায়।

কিরূপে এই জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি সে সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছে যে, এই জ্ঞানের প্রথম দীক্ষা লাভ করিতে হয় তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণের নিকট,—যাঁহারা শুধু বিচার বিতর্ক করিয়া নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ (৪।৩৪) ; কিন্তু এই জ্ঞান প্রকৃত ভাবে লাভ করা যায় নিজেদের ভিতর হইতেই —"তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি" (৪।৩৮) যে-ব্যক্তি যোগের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছেন তিনি সেই জ্ঞান যথা সময়ে স্বীয় অন্তঃকরণে স্বয়ং লাভ করেন, অর্থাৎ এই জ্ঞান ভিতর হইতে বিকশিত

হইয়া উঠে, এবং তিনি বাসনাশূন্যতায়, সমতায়, ভগবদ্ভক্তিতে যত বৰ্দ্ধিত হন, এই জ্ঞানেও তেমনিই বৰ্দ্ধিত হন। কেবল পরম জ্ঞান সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে; মানুষের বুদ্ধি যে জ্ঞান সঞ্চয় করে তাহা ইন্দ্রিয়ের ও বিচার শক্তির সাহায্যে কষ্টে সৃষ্টে বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। পরম জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, প্রত্যক্ষানুভূত, স্বপ্রকাশ— ইহা লাভ করিতে হইলে মন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত ও সংযত করিতে হইবে, সংযতেন্দ্রিয়ঃ; যেন আর আমরা তাহাদের ছলনায় ভ্রান্ত না হই, কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয়গণ যেন সেই পরম জ্ঞানের নির্ম্মল দর্পণ স্বরূপ হয়; যে পরম সত্তার মধ্যে সর্ব্বভূত রহিয়াছে, আমাদের সমগ্র চেতনাকে তাহার সহিত যুক্ত করিতে হইবে, তৎপরঃ,—এইরূপে তাহার জ্যোতির্ম্ময় স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা আমাদের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

আর চাই আমাদের এমন শ্রদ্ধা, এমন বিশ্বাস, কোনরূপ সংশয়েই যাহাকে বিচলিত হইতে দেওয়া চলিবে না, শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং,

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ ৪।৪০

—"যে অজ্ঞান ব্যক্তির বিশ্বাস নাই, যাহার আত্মা সংশয়যুক্ত, সে বিনষ্ট হয়; সন্দেহাকুলচিত্ত মানবের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, কোন সুখও নাই।" বস্তুতঃ ইহা সত্য যে, বিশ্বাস ভিন্ন ইহ জগতে স্থায়ী কিছু সম্পাদন করা যায় না, কিম্বা উৰ্দ্ধলোক লাভের নিমিত্তও কিছু করা যায় না, কোন নিশ্চিত ভিত্তি ও দৃঢ় অবলম্বনকে ধরিতে না পারিলে ইহকালের বা পরকালের কাজ কিছুই সফল করা যায় না, কোন তৃপ্তি বা সুখ লাভ করা যায় না; যে-মন কেবল সংশয়পূর্ণ

তাহা শূন্যতার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। তবু কিন্তু নিম্নস্তরের জ্ঞানে সংশয় ও অবিশ্বাসের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা আছে; উপরের জ্ঞানে এ-সব বিষম বাধা, কারণ সেখানকার গূঢ় তত্ত্ব এই যে, সেখানে বুদ্ধির দ্বারা সত্য অসত্যের বিচার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয় না, পরন্তু স্বতঃ প্রকাশমান সত্যকে ক্রমশঃ বেশী প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিতে করিতেই অগ্রসর হইতে হয়। বুদ্ধির স্তরে যে-জ্ঞান তাহার সহিত সকল সময়েই অসম্পূর্ণতা বা মিথ্যা মিশিয়া রহিয়াছে, অতএব সংশয় দৃষ্টিতে এই জ্ঞানকে পরীক্ষা করিয়া মিথ্যার ভাগ বর্জ্জন করিতে হয়; কিন্তু উচ্চস্তরের জ্ঞানে মিথ্যা স্থান পাইতে পারে না এবং নানা মতের সংস্পর্শে আসিয়া বুদ্ধি যে-সংশয় উৎপাদন করে তাহা কেবল বিচারের দ্বারা দূর করা যায় না, ক্রমশঃ অনুভূতি ও উপলব্ধি দ্বারা সে-সংশয় আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। এইরূপে লব্ধ জ্ঞানে যে-কোন অসম্পূর্ণতা থাকুক না কেন তাহা দূর করিতে হইলে যতটুকু উপলব্ধি হইয়াছে তাহাতে সংশয় করিলে চলিবে না, কিন্তু আত্মার মধ্যে গভীরতর, উচ্চতর ভাবে বাস করিয়া, পূর্ণতর অনুভূতি উপলব্ধি দ্বারা সে অসম্পূর্ণতা দূর করিতে হইবে। যে টুকু এখনও অনুভূত হয় নাই, বিশ্বাসের দ্বারাই তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, সন্দেহপূর্ণ বিচারের দ্বারা নহে, কারণ এই জ্ঞান দান করা বিচার বিতর্কের সাধ্যাতীত, বাস্তবিক বিচার বিতর্কের দ্বারা মন যে-সকল ধারণার মধ্যে জড়াইয়া পড়ে, অনেক সময়েই সে-সব উচ্চস্তরের জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত,—এই সত্য বিচারের দ্বারা প্রমানের বিষয় নহে, জীবনের মধ্যে ইহাকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, ক্রমবিকাশের দ্বারা আমাদিগকে যে উচ্চতন

আত্মস্বরূপ লাভ করিতে হইবে, ইহা সেই সত্য। শেষতঃ, এই সত্য হইতেছে স্বয়ংসিদ্ধ, আমরা যে অজ্ঞানের ছলনার মধ্যে বাস করি তাহা না থাকিলে ইহা আপনিই প্রকাশ হইত; যে সংশয়, মোহ আমাদিগকে এই সত্য দেখিতে ও অনুসরণ করিতে দেয় না তাহা সেই অজ্ঞান হইতেই আইসে, অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থম্ সংশয়ম্,—আমাদের ইন্দ্রিয়বিক্ষুব্ধ, নানা মতে ভ্রান্ত হৃদয় ও মন নীচের ব্যবহারিক সত্যে ডুবিয়া আছে বলিয়াই তাহারা উপরের সত্য বস্তু সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। গীতা বলিয়াছে, জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা এই সংশয় ছেদন করিতে হইবে, অনুভূতি উপলব্ধির দ্বারা এই সন্দেহ দূর করিতে হইবে, সতত যোগের অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং, যাঁহাকে জানিলে সব জানা যায়, সেই পরম পুরুষের সহিত যোগে জীবন যাপন করিয়া সকল সন্দেহ ভ্রান্তি নিরসন করিতে হইবে।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪।৪২

সর্ব্বদা ব্রহ্মে অবস্থিত ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি সকল সময়েই সেই উচ্চতর জ্ঞানের আলোকে সমস্ত জিনিষ অবলোকন করেন। তাহা অন্য জিনিষকে ছাড়িয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মকে দেখা নহে, পরন্তু সমস্ত জিনিষকেই ব্রহ্মে দেখা এবং আত্মা বলিয়া দেখা। কারণ গীতা বলিয়াছে, যে জ্ঞান লাভ করিলে আর আমাদিগকে আমাদের মানসিক প্রকৃতির মোহজালের মধ্যে পুনরায় পড়িতে হয় না "সেই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা সর্ব্বভূতকেই (কাহাকেও বাদ না দিয়া) আত্মাতে দেখিবে, পরে আমাতে দেখিবে।"

যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৪।৩৫

—এই কথাই গীতা অন্যত্র আরও বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছে—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ৬।২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৬।৩০
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৬।৩১
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬।৩২

—"সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগী সর্ব্বভূতে আত্মা এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন। যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন এবং সকলকে ও প্রত্যেককেই আমার মধ্যে দেখেন আমি তাহাকে কখনও হারাই না, তিনিও আমাকে কখনও হারান না। যিনি একত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে ভজনা করেন, তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন না কেন, তিনি আমার মধ্যেই বাস করেন, কর্ম্ম করেন। হে অর্জ্জুন, যিনি সুখে দুঃখে সর্ব্বত্র সকলকে সমান ভাবে নিজের মত দেখেন, আমার মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।" ইহাই উপনিষদের প্রাচীন বৈদান্তিক জ্ঞান, এই জ্ঞানকে গীতা সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে; তবে এই জ্ঞানের অন্যান্য পরবর্ত্তী বিবৃতির তুলনায় গীতার শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, এই জ্ঞানের সাহায্যে কেমন করিয়া কার্য্যতঃ দিব্যজীবন গড়িয়া তুলিতে

হয় তাহারই উপর গীতা একান্ত ভাবে ঝোঁক দিয়াছে। এই ঐক্য-জ্ঞানের সহিত কর্ম্মযোগের সম্বন্ধ গীতায় বার বার বিশেষ ভাবে দেখান হইয়াছে,—দেখান হইয়াছে যে, সংসারে মুক্তভাবে কর্ম্ম করিবার ভিত্তিই হইতেছে এই ঐক্যের জ্ঞান। গীতা যখনই জ্ঞানের কথা বলিয়াছে, তখনই ইহার ফলস্বরূপ সমতার কথাও বলিয়াছে ; গীতা যখনই সমতার কথা বলিয়াছে তখনই এই সমতার ভিত্তিস্বরূপ জ্ঞানের কথাও বলিতে অগ্রসর হইয়াছে। গীতা যে-সমতার উপদেশ দিয়াছে তাহার আরম্ভ এবং শেষ কেবল আত্মমুক্তির উপযোগী নিশ্চল অধ্যাত্ম অবস্থায় নহে ; তাহা সকল সময়েই কর্ম্মের ভিত্তি। মুক্ত পুরুষের আত্মায় প্রতিষ্ঠারূপে থাকে ব্রহ্মের শান্তি ; মুক্ত প্রকৃতিতে ঈশ্বরের বিরাট, মুক্ত, সম, বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম সেই শান্তি হইতে উত্থিত শক্তি বিকীরণ করে। এই দুইকে এক করিয়াই দিব্যকর্ম্ম ও ভাগবত জ্ঞানের সমন্বয় হয়।

অন্যান্য দর্শন, নীতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রে জীবনের যে সকল আদর্শ রহিয়াছে, গীতা সে-সব লইয়া তাহাদের কিরূপ গভীর বিস্তার সাধন করিয়াছে তাহা এখন সহজেই বুঝা যায়। সহিষ্ণুতা, দার্শনিক উদাসীনতা এবং নতি যে তিন প্রকার সমতার ভিত্তি তাহা আমরা বলিয়াছি ; গীতা যে কেবল এই তিনটিরই সমন্বয় সাধন করিয়াছে শুধু তাহাই নহে, গীতা তাহাদিগকে অসীম গভীরতা এবং অপূর্ব্ব উদার সার্থকতা প্রদান করিয়াছে। সহিষ্ণুতার দ্বারা আত্মজয় করিবার যে-শক্তি আত্মার আছে তাহার জ্ঞানই স্তোয়িক জ্ঞান (stoic knowledge), নিজের প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াই এই সমতা লাভ করিতে হয়, সতত সজাগ দৃষ্টি, খাড়া পাহারার দ্বারা প্রকৃতির স্বাভাবিক বিদ্রোহসমূহকে দমন করিয়া এই সমতা বজায়

রাখিতে হয় ; ইহা হইতে একটা মহৎ শান্তি, একটা কঠোর সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু মুক্ত পুরুষের জীবনে যে পরম আনন্দ তাহা লাভ করা যায় না ;—এই মুক্ত পুরুষের জীবন বিধি নিষেধ অনুসারে যাপিত হয় না, তাঁহার দিব্য সত্তার শুদ্ধ সহজ স্বতঃস্ফুর্ত্ত সিদ্ধাবস্থাতে তিনি জীবন যাপন করেন,—সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে,—"তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন, তিনি ভগবানের মধ্যেই বাস করেন, কর্ম্ম করেন," কারন এখানে সিদ্ধি শুধু লব্ধই হয় না, জন্মগত অধিকার হইয়া উঠে, উহাকে চেষ্টা করিয়া রক্ষা করিতে হয় না কারণ উহা আত্মার প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। আমাদের নীচের প্রকৃতিকে জয় করিতে সাধনার প্রথমাবস্থায় ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার সার্থকতা গীতা স্বীকার করিয়াছে ; কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় কতকটা জয়লাভ করিতে পারিলেও, পূর্ণজয়ের মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবানের সহিত যোগ সাধন ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই,—সেই এক দিব্য পুরুষের সত্তায় নিজেদের ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়া দিতে হইবে, তাঁহার মধ্যে বাস করিতে হইবে, ভগবদিচ্ছার মধ্যে ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে লয় করিতে হইবে। প্রকৃতির এবং তাহার কর্ম্মের একজন দিব্য অধীশ্বর, আছেন, তিনি প্রকৃতির মধ্যে বাস করিয়াও প্রকৃতির উর্দ্ধে, তিনিই আমাদের উচ্চতম সত্তা, আমাদের বিশ্বব্যাপী আত্মা ; তাঁহার সহিত এক হওয়াই আমাদের দিব্যাবস্থালাভ। ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া আমরা পূর্ণ মুক্তি ও পরম জয় লাভ করি। ষ্টোয়িকদের যে-আদর্শ, যে জ্ঞানীব্যক্তি আত্মজয়ের দ্বারা বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাকেও জয় করিয়া রাজা হইয়াছেন, তাঁহার সহিত বেদান্তের স্বরাট্, সম্রাট্ আদর্শের বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু

তাহা হইতেছে নীচের স্তরে। স্তোয়িকের প্রভুত্ব আত্মার উপর ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর বল প্রয়োগ করিয়া বজায় রাখিতে হয়; যোগীর যে পূর্ণ মুক্ত প্রভুত্ব তাহা দিব্য প্রকৃতির চিরন্তন ঈশ্বরত্ব হইতে স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভূত,—নীচের প্রকৃতি যাহার যন্ত্র মাত্র, উর্দ্ধে সেই দিব্য প্রকৃতির মুক্ত বিশালতায় বাস করিয়াই এই পূর্ণ জয়ে, পূর্ণ স্বাধীনতায় সহজ স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। তিনি সকল জিনিষের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন তাহার কারণ এই যে, তিনি সকল জিনিষের সহিত একাত্মা হন, সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা। প্রাচীন রোমক সমাজের একটি দৃষ্টান্ত লইয়া স্তোয়িক মুক্তি বুঝান যাইতে পারে,—যে ক্রীতদাসকে তাহার যোগ্যতার জন্য মুক্তি দেওয়া হইত (libertus) সে যেমন মুক্ত হইয়াও বস্তুতঃ পূর্ব্ব প্রভুরই অধীন থাকিত, স্তোয়িক সাধনায় মুক্ত ব্যক্তিকেও প্রকৃতি তেমনই তাহার যোগ্যতার জন্য মুক্তি দেয়। কিন্তু গীতা যে-মুক্তির কথা বলিয়াছে তাহা স্বাধীন মনুষ্যের (freeman) জন্মগত স্বাধীনতা, দিব্য প্রকৃতিতে জন্মলাভ করিয়া সেই সত্য স্বাধীনতা লাভ করা যায়, তাহা দিব্য সত্তায় স্বপ্রতিষ্ঠ। মুক্ত পুরুষ যাহাই করুন, যেখানেই থাকুন তিনি ভগবানেব মধ্যেই বাস করেন; তিনি বাড়ীর দুলাল, বালবৎ, তাঁহার ভুল হইতে পারে না, পতন হইতে পারে না কারণ তিনি নিজে যাহা এবং তিনি যাহা করেন সে সবই সিদ্ধ, পরম আনন্দময়, পরম প্রেমময়, পরম সুন্দর। তিনি যে-রাজ্য ভোগ করেন, রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্, তাহা সুখ ও মধুরতার রাজ্য, তাহার সম্বন্ধে গ্রীক্ পণ্ডিতের গভীর ভাষায় বলা যায়, "শিশুর রাজ্য"—The Kingdom is of the child."

বিশ্ব জগতের প্রকৃত ধারা, বাহ্য বস্তুর অনিত্যতা, সাংসারিক ভেদ বৈষম্যের নিরর্থকতা এবং আভ্যন্তরীণ ধীরতা, শান্তি, জ্যোতি ও আত্মনির্ভরতার সার্থকতা—এই সবের জ্ঞানই দার্শনিক * জ্ঞান। ইহা দার্শনিকজ্ঞানলব্ধ উদাসীনতার সমতা; ইহা হইতে একটা উচ্চ শান্তভাব আইসে কিন্তু উচ্চতর আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করা যায় না; এই মুক্তি সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা—উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া কত লোক হাবুডুবু খাইতেছে, এই তুরবস্থা হইতে দূরে উচ্চ শৈলশিখর হইতে কেহ যেরূপ অন্যান্য সকলের তুরবস্থা দর্শন করে ইহাও সেইরূপ,—শেষ পর্য্যন্ত ইহা সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং ইহা সংসারের কোন কাজেই লাগে না। সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ দার্শনিক উদাসীনতার যে উপযোগিতা আছে গীতা তাহা স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু যে উদাসীনতা গীতার চরম লক্ষ্য তাহাতে সংসারকে উপেক্ষার কোন ভাব নাই, সে অবস্থাকে ঠিক উদাসীনতা বলা চলে কি না সন্দেহ। যেন উচ্চে বসিয়া আছে এরূপ একটা ভাব সে অবস্থায় আছে বটে, উদাসীনবৎ, কিন্তু যেমন ভগবান উচ্চে বসিয়া রহিয়াছেন—সংসারে তাঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তথাপি তিনি সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতেছেন এবং সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়া জীবকে ধরিয়া রহিয়াছেন, সাহায্য করিতেছেন, পথ দেখাইয়া

* ইংরাজী 'Philosophy' শব্দের প্রতিশব্দ স্বরূপ বাংলায় "দর্শন" শব্দ ব্যবহারই প্রচলিত রীতি এবং আমরাও সেই রীতি অনুসরণ করিয়াছি। তবে মনে রাখা উচিত যে, Philosophy তত্ত্বদর্শী ঋষির অপরোক্ষানুভূত তত্ত্বজ্ঞান নহে, মানসিক বুদ্ধির দ্বারা বিচার বিতর্ক করিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা লইয়াই Philosophy.

দিতেছেন। সর্ব্বভূতের সহিত একত্বের উপলব্ধির উপর এই সমতা প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিক সমতাতে যে অভাব আছে, এখানে তাহা পূর্ণ হইয়াছে ; কারণ ইহার মূলে শান্তি আছে, উপরন্তু প্রেম আছে। এই সমতার অবস্থায় সর্ব্বভূতকে নির্ব্বিশেষে ভগবানের মধ্যে দেখা যায়, সর্ব্বভূতের সহিত একাত্মবোধ হয়, অতএব সকলের প্রতিই পরম সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া যায়। কেহই বাদ থাকে না, "অশেষেণ", কেবল যে-সব বস্তু শুভ, সুন্দর ও আনন্দদায়ক শুধু সেইসবই নহে, যত নীচ, পতিত, পাপী, কুরূপ হউক না কেন এই সার্ব্বজনীন ঐকান্তিক সহানুভূতি ও আধ্যাত্মিক একত্ব হইতে কোন বস্তু, কোন ব্যক্তিকেই বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। এখানে যে কেবল ঘৃণা, ক্রোধ বা হৃদয়হীনতার স্থান নাই শুধু তাহাই নহে, এখানে উপেক্ষা তাচ্ছিল্য বা মহত্ত্বের গর্ব্বেরও স্থান নাই। অবশ্য মানব মনের দ্বন্দ্ব ও অজ্ঞানের প্রতি দিব্য করুণা থাকিবে, তাহাকে জ্ঞান দিবার, শক্তি দিবার, আনন্দ দিবার দিব্য প্রবৃত্তি থাকিবে; কিন্তু মানুষের মধ্যে যে দিব্য আত্মা রহিয়াছে তাহার প্রতি আরও অধিক কিছু থাকিবে, ভক্তি ও প্রেম থাকিবে। কারণ সকলের ভিতর হইতে,—যেমন সাধু ও জ্ঞানীর ভিতর হইতে, তেমনই চোর, চণ্ডাল, পতিতার ভিতর হইতেও সেই প্রেমময় চাহিয়া আছেন এবং আমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—"এখানেও আমি"। সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজতি, "সর্ব্বভূতের মধ্যে অবস্থিত আমাকে যে ভাল বাসে"—দিব্য সার্ব্বজনীন প্রেমের চরম পূর্ণতা ও গভীরতার এত বড় শক্তিমান কথা জগতের আর কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ ধর্ম্মে বলা হইয়াছে ?

নতি এক প্রকার ভক্তসুলভ সমতার ভিত্তি—এই সমতা ভগবানের

ইচ্ছার সম্মুখে মাথা পাতিয়া দেওয়া, সংসারের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ধীর ভাবে সহ্য করা। গীতায় এই ভাব হইয়াছে আরও পূর্ণতর, সমগ্র সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের নিকট সমর্পণ করা। ইহা কেবল মাত্র নিষ্ক্রিয় নতি (passive submission) নহে, পরন্তু ইহা সক্রিয় আত্মদান (active self-giving)। গীতার সমর্পণের অর্থ কেবল সমস্ত জিনিষেই ভগবানের ইচ্ছা দেখা এবং স্বীকার করিয়া লওয়া নহে, কিন্তু নিজের ইচ্ছাশক্তিকে সর্ব্ব কর্ম্মের প্রভু ভগবানের যন্ত্র করিয়া দেওয়া; এই যন্ত্রভাব কেবল নিম্নতর দাসভাব মাত্র নহে,—প্রথমাবস্থায় যাহাই হউক, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের চৈতন্য ও কর্ম্ম এমন পূর্ণভাবে ভগবানে সমর্পণ করিতে হইবে যেন আমাদের সত্তা ভগবানের সত্তার সহিত এক হইয়া যায় এবং আমাদের ন্যির্ব্যক্তিক-ভাবাপন্ন প্রকৃতি হয় কেবল একটি যন্ত্র, আর কিছুই নহে। শুভ অশুভ, সুখদুঃখ, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য—সকল প্রকার ফলই সর্ব্ব কর্ম্মের প্রভু ভগবানের বলিয়াই গ্রহণ করা হয়, অতএব শেষ পর্য্যন্ত শোক দুঃখ যে কেবল সহ্য করা হয় তাহা নহে, শোক দুঃখ একেবারে লোপ পায়; হৃদয়ে পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যন্ত্রের ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন বোধ থাকে না; সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বপুরুষ পূর্ব্ব হইতেই সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষের অহঙ্কার ভগবানের সেই ইচ্ছার কোন ব্যতিক্রমই করিতে পারে না, এই জ্ঞান হয়। অতএব শেষ ভাব হইবে যেমন একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—"আমার দিব্য ইচ্ছা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে আমি ইতিপূর্ব্বেই সব করিয়া রাখিয়াছি, হে অর্জ্জুন, তুমি এখন কেবল নিমিত্তমাত্র হও"—নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ (১১।৩৩)। এইরূপ ভাব হইতে

শেষে ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত ভাগবত ইচ্ছার সম্পূর্ণ যোগ হয় এবং ক্রমশঃ জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত এমন অবস্থা লাভ করা যায় যে তখন যন্ত্র সম্পূর্ণ নিখুঁত ভাবেই ভগবানের শক্তি ও জ্ঞানে সাড়া দেয়। বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় পুরুষের সহিত ব্যক্তির এই চরম মিলনের অবস্থায় আত্মসমর্পণের পূর্ণতম চরমতম সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, মন দিব্য আলোক ও শক্তির নমনীয় আধার হয়, সক্রিয় সত্তা জগতে এই দিব্য আলোক ও শক্তির মহান কার্য্যক্ষম যন্ত্র হয়।

অপরে আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করে সে সম্বন্ধেও সমভাব হইবে। সর্ব্বত্র এক আত্মাকে দর্শন করিয়া, সর্ব্বভূতে ভগবানকে দর্শন করিয়া, অন্তরে যে একত্ব বোধ, প্রেম, সহানুভূতির উদয় হয় তাহা কিছুতেই বিচলিত হয় না, অপরে আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুক না কেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যাহা করিবে নির্বিরোধে তাহা মানিয়া লইতে হইবে এমন কোন কথাই নাই; এরূপ হইতেই পারে না কারণ সংসারে লোকে আপন আপন অহঙ্কারের তৃপ্তির জন্য দ্বন্দ্ব বিরোধের সৃষ্টি করিতেছে, ভগবদিচ্ছার সহিত ইহাদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, অতএব যাহারা সর্ব্বদা ভগবদিচ্ছার যন্ত্রভাবে কার্য্য করিবে তাহাদিগকে সংসারে বাসনা-চালিত অহঙ্কৃত নানা ব্যক্তির, নানা কর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেই হইবে। সেইজন্যই অর্জ্জুন বাধা দিতে, যুদ্ধ করিতে, জয় করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে ঘৃণা বা ব্যক্তিগত বাসনা বা ব্যক্তিগত শত্রুভাব পরিহার করিয়াই যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে, কারণ মুক্ত পুরুষে এই সকল ভাব সম্ভবে না। নির্ব্যক্তিকভাবে লোকসংগ্রহের জন্য, ভাগবত আদর্শের

দিকে লোক সকলকে পরিচালনার জন্য কর্ম্ম করা, এই নীতি ভগবানের সহিত, বিশ্বপুরুষের সহিত জীবের একাত্মবোধ হইতেই উত্থিত হয়, কারণ বিশ্ব কর্ম্মের উহাই সমগ্র লক্ষ্য ও অর্থ। আবার সর্ব্বভূতের সহিত আমাদের যে একত্ব তাহারও সহিত এই নীতির কোন বিরোধ নাই, হউক না কেন এখানে অনেকেই আমাদের সম্মুখে শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থিত। কারণ ভাগবত আদর্শ তাহাদেরও আদর্শ, যাহাদের বাহ্য মন অজ্ঞান ও অহঙ্কারের দ্বারা বিপথে চালিত হয় এবং ভাগবত উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহাদেরও নিগূঢ় লক্ষ্য হইতেছে ভাগবত আদর্শে পৌঁছান। তাহাদিগকে বাধা দিলে বা পরাস্ত করিলেই তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাহ্যিক সেবা বা উপকার করা হয়। ইহা উপলব্ধি করিয়া গীতা বাহ্যিক ব্যবহার-বৈষম্যের অবশ্যম্ভাবিতা অস্বীকার করে নাই, কিম্বা অজ্ঞান-জনিত দুর্ব্বল অনুকম্পার উপদেশ দেয় নাই, কিন্তু আন্তরিক জ্ঞানসম্মত সমতা ও প্রেমের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আত্মায় সকলের সহিত একত্ব থাকিবে, হৃদয়ে সকলের প্রতি শান্ত সার্ব্বজনীন প্রেম, সহানুভূতি, করুণা থাকিবে, কিন্তু হস্ত মুক্ত থাকিবে নির্ব্যক্তিকভাবে কল্যাণ সাধন করিতে, মানব জাতিকে শুভ ও মোক্ষের পথে আগাইয়া দিতে, সর্ব্বভূতের সমগ্র হিতসাধন করিতে, এই ব্যক্তির বা ঐ ব্যক্তির বাহ্যিক মঙ্গল করিতে যাইয়া কখনই তাহা ভাগবত কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।

ভগবানের সহিত একত্ব, সর্ব্বভূতের সহিত একত্ব, সর্ব্বত্র সনাতন দিব্য ঐক্যের উপলব্ধি এবং সকল মনুষ্যকে এই একত্বের দিকে টানিয়া লওয়া—ইহাই জীবনের ধর্ম্ম রূপে গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা

গভীর, উদার, মহৎ ধর্ম্ম আর কিছুই হইতে পারে না। নিজে মুক্ত হইয়া এই একত্বের মধ্যে বাস করা, যে-পথে ইহা লাভ করা যায় সমস্ত মানব জাতিকে সেই পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করা, এবং ইতিমধ্যে সমস্ত কর্ম্ম ভগবদর্থে সম্পাদন করা এবং অপরকেও এইরূপে সম্মতি ও আনন্দের সহিত আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত করা, কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ, সর্ব্বকর্ম্মাণি জোষয়ন্—দিব্যকর্ম্মের ইহা অপেক্ষা উদার বা মহৎ নীতি আর কিছু দিতে পারা যায় না। এই মুক্তি এবং এই একত্বই আমাদের মানবীয় প্রকৃতির নিগূঢ় লক্ষ্য, এবং মানব জাতির জীবনে ইহাই চরম ইচ্ছা। সমগ্র মানবজাতি আজ যে-সুখের জন্য বৃথা খুঁজিয়া মরিতেছে তাহার জন্য এই দিকে ফিরিতেই হইবে যখন মানুষ একবার নিজেদের মধ্যে ও চারিদিকে; সর্ব্বেষু, সর্ব্বত্র, ভগবানকে দেখিবার জন্য চক্ষু ও হৃদয়কে উন্মুক্ত করিবে এবং শিখিবে যে, তাহারা ভগবানের মধ্যেই বাস করিতেছে, এই নীচের প্রকৃতি কেবল কারাপ্রাচীর মাত্র, ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই হইবে, বড় জোর ইহা শৈশবের পাঠশালা মাত্র, ইহাকে ছাড়াইয়া উঠিতেই হইবে, তবেই আমরা প্রকৃতিতে সাবালক হইতে পারিব, আত্মায় মুক্ত স্বাধীন হইতে পারিব। ভগবান ঊর্দ্ধে রহিয়াছেন, মনুষ্যের মধ্যে রহিয়াছেন, জগতের মধ্যে রহিয়াছেন—সেই সর্ব্বত্র বিরাজমান ভগবানের সহিত একাত্ম হইতে হইবে, ইহাই মুক্তির অর্থ, ইহাই সিদ্ধির পরম রহস্য।

প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব

(The Determinism of Nature)

আত্মজ্ঞান ও কর্ম্মের ঐক্যের দ্বারা যখন আমরা উর্দ্ধতন আত্মার মধ্যে বাস করিতে পারি, তখন আমরা প্রকৃতির নিম্নতন কর্ম্ম-পদ্ধতির উর্দ্ধে উঠি। তখন আর আমরা প্রকৃতি ও তাহার গুণ-সকলের অধীন থাকি না, কিন্তু আমাদের প্রকৃতির প্রভু ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া প্রকৃতিকে আমাদের মধ্যে ভগবদ্ ইচ্ছার উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করিতে পারি, তখন আর আমাদিগকে কর্ম্মবন্ধনের অধীন হইতে হয় না ; কারণ আমাদের মধ্যে যে মহত্তর আত্মা তাহা তিনিই, তিনি প্রকৃতির কর্ম্মের অধীশ্বর, তাহার প্রতিক্রিয়াসকলের বিক্ষুব্ধ আঘাত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অন্য পক্ষে যে আত্মা অজ্ঞান অবস্থায় প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে সে সেই অজ্ঞানের দ্বারাই প্রকৃতির গুণে বদ্ধ হয়, কারণ সেখানে সে তাহার প্রকৃত সত্তার সহিত, প্রকৃতির উর্দ্ধে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সহিত নিজেকে স্বচ্ছন্দে এক করিয়া দেখে না পরন্তু নির্ব্বোধভাবে এবং অস্বচ্ছন্দে মনের "আমি"কেই নিজের স্বরূপ বলিয়া দেখে, এই "আমি" নিজেকে যত বড়ই দেখাক না কেন ইহা বস্তুতঃ প্রকৃতির ক্রিয়ার একটা নীচের অংশ মাত্র, ইহা কেবল একটি মানসিক গ্রন্থি, একটি কেন্দ্র; ইহাকে ধরিয়া প্রকৃতির কর্ম্মধারাসকলের খেলা চলে। এই গ্রন্থিকে ছিন্ন করা, "আমি"-কেই আর আমাদের

কর্ম্মের কেন্দ্র ও ভোক্তা না করা পরন্তু দিব্য পরমপুরুষ হইতেই সব প্রেরণা লাভ করা এবং তাঁহাকেই সব কিছু উৎসর্গ করা—ইহাই হইতেছে প্রকৃতির গুণসকলের সকল অশান্ত বিক্ষোভের অতীত হইবার পন্থা। কারণ তখন আমরা পরম চৈতন্যের মধ্যে বাস করি, মনের "আমি" হইতেছে তাহার একটা নীচের রূপ মাত্র; তখন আমরা ভাগবত ইচ্ছা ও শক্তির সাম্যে ও ঐক্যে কর্ম্ম করি, গুণসকলের খেলার অসাম্যে নহে, এই খেলা হইতেছে একটা ঐক্যহীন প্রয়াস, একটা বিক্ষোভ, একটা নীচের মায়া।

গীতা যে-সকল স্থানে অহংকে প্রকৃতির অধীন বলিয়াছে, কেহ কেহ সেই সকলের অর্থ এইরূপ বুঝিয়া থাকেন যে, গীতার মতে বিশ্বজগতে কাহারও কোনরূপ স্বাধীনতা নাই, সবই অলঙ্ঘ্য যন্ত্রবৎ নিয়মের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। অবশ্য গীতা যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে তাহা খুবই জোরের, এবং তাহা একেবারেই চরম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেমন অন্যত্র তেমনি এখানেও আমাদিগকে গীতার কথাটিকে সমগ্রভাবে ধরিতে হইবে, অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ইহার অর্থ করিলে চলিবে না, কারণ প্রত্যেক সত্য, তাহা নিজে যতই সত্য হউক না কেন,—অন্য যে-সব সত্য তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় এবং সেই সঙ্গেই তাহাকে পূর্ণ করিয়া তোলে সে-সব হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহা হয় বুদ্ধির পক্ষে একটি ফাঁদের মত, তাহা ভ্রান্তিপ্রদ হঠোক্তিতে পরিণত হয়, কারণ প্রত্যেকটিই

হইতেছে একটি সমগ্রের অংশ, সেই সমগ্র হইতে কোনটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে চলিবে না। সমগ্রের জ্ঞান যাহাদের নাই, অকৃৎস্নবিৎ, যাহারা আংশিক সত্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়, আর যে-যোগী সমগ্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কৃৎস্নবিৎ—গীতা নিজেই এই দুইয়ের প্রভেদ করিয়াছে। সমস্ত জীবনকে ধীর ভাবে দেখা এবং সমগ্র ভাবে দেখা, জীবনের আপাতবিরোধী সত্যসকলের দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়া, ইহাই হইতেছে যোগীজনবাঞ্ছিত শান্ত ও পূর্ণ জ্ঞানের পক্ষে সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজন। আমাদের এই বিচিত্র সত্তার এক প্রান্তে এক প্রকার পূর্ণ স্বাধীনতাই হইতেছে আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধের একটা দিক; আবার বিপরীত প্রান্তে প্রকৃতির এক প্রকার পূর্ণ নিয়ন্তৃত্বই (absolute determinism) হইতেছে উহার বিপরীত দিক; আবার, এই দুই বিপরীত সত্যের বিকৃত ছায়া ক্রমবিকাশশীল মনের উপর পড়িলে আত্মায় এক প্রকার স্বাধীনতার আভাস হয়—ইহা আংশিক ও আভাসমাত্র, অতএব ইহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে। এই শেষেরটিকেই সাধারণতঃ আমরা কতকটা ভ্রান্তভাবেই স্বাধীন ইচ্ছা (free will) নাম দিয়া থাকি; কিন্তু গীতা পূর্ণ মুক্তি ও প্রভুত্ব ভিন্ন আর কিছুকেই স্বাধীনতা বলিয়া স্বীকার করে নাই।

সকল সময়েই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, গীতার সমস্ত শিক্ষার পশ্চাতে আত্মা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটি মহান তত্ত্ব রহিয়াছে, (১) সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্ব বেদান্তের পুরুষত্রয়ের তত্ত্বের দ্বারা সংশোধিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং (২) যুগ্ম প্রকৃতি, ইহার নীচের রূপ

হইতেছে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এবং উর্দ্ধের রূপ হইতেছে দিব্য প্রকৃতি, প্রকৃত অধ্যাত্ম প্রকৃতি। গীতার শিক্ষার নানাস্থানে যে অসামঞ্জস্য ও বিরোধ আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় সে সমুদয়ের প্রকৃত সামঞ্জস্য করিবার ইহাই হইতেছে মূল সূত্র। বস্তুতঃ আমাদের চৈতন্যময় জীবনের বিভিন্ন স্তর আছে, যাহা এক স্তরে কার্য্যতঃ সত্য উপরের আর এক স্তরে উঠিলে তাহাই আর সত্য থাকে না, কারণ তখন তাহা ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, উপর হইতে জিনিষ-সকলকে আমরা আরও সমগ্রভাবে দেখিতে পারি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা নির্দ্ধারণ করিয়াছে যে, মনুষ্য, পশু, উদ্ভিদ্ এমন কি ধাতুদ্রব্য পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে মূলতঃ একই জীবনের সাড়া পাওয়া যায়, অতএব প্রত্যেকের মধ্যেই কোন এক প্রকারের স্নায়বিক চৈতন্য (nervous consciousness) রহিয়াছে, তাহাদের স্থূল মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি একই। অথচ প্রত্যেকেই যদি তাহার অনুভূতি উপলব্ধিসকলের বর্ণনা দিতে পারিত তাহা হইলে আমরা একই প্রতিক্রিয়া এবং একই প্রাকৃত তত্ত্বের চারিপ্রকার সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং অনেকাংশেই বিরোধী বর্ণনা পাইতাম, কারণ আমরা যেমন জীবনের পর্য্যায় উর্দ্ধতর স্তরে উঠি তেমনই তাহাদের অর্থ ও উপযোগিতার বিভিন্নতা হয় এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন দৃষ্টি লইয়া বিচার করিতে হয়। মানবাত্মার স্তর সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমাদের সাধারণ ধারণায় আমরা যেটিকে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলি, এবং এরূপ বলিবার কতকটা ন্যায্যতাও আছে, তথাপি যে যোগী উর্দ্ধে উঠিয়াছেন এবং আমাদের রাত্রি যাঁহার নিকট দিন স্বরূপ

এবং আমাদের দিন রাত্রি স্বরূপ, তাঁহার নিকট সেটি আদৌ স্বাধীন ইচ্ছা নহে, পরন্তু প্রকৃতির গুণসমূহের বশ্যতা। তিনি একই জিনিষ দেখেন, কিন্তু সমগ্র জ্ঞানীর, কৃৎস্নবিৎ ব্যক্তির, উচ্চতর দৃষ্টি লইয়া দেখেন, আর আমরা দেখি আমাদের আংশিক জ্ঞানের ক্ষুদ্র পরিধি হইতে, অকৃৎস্নবিৎ, ইহা অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেটাকে আমরা আমাদের স্বাধীনতা বলিয়া গর্ব্ব করি, তিনি দেখেন যে সেটা দাসত্ব।

নীচের প্রকৃতির জালে সর্ব্বদা বদ্ধ থাকিয়াও আমরা যে নিজ-দিগকে স্বাধীন বলিয়া মনে করি, গীতা ইহাকে অজ্ঞান বলিয়াই দেখিয়াছে এবং এই অজ্ঞান ধারণার বিরুদ্ধেই গীতা বলিয়াছে যে, এই স্তরে অহংরূপী আত্মা সম্পূর্ণভাবেই প্রকৃতির গুণ সমূহের অধীন। গীতা বলিয়াছে, * "কর্ম্মসকল সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির গুণ সমূহের দ্বারা সম্পন্ন হইলেও যে-ব্যক্তির আত্মা অহংভাবের দ্বারা বিমূঢ় সে মনে করে যে তাহার "অহং"ই সে-সব করিতেছে। কিন্তু যে-ব্যক্তি গুণ ও কর্ম্মবিভাগের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন,

* প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। ৩।২৭
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে। ৩।২৮
প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ। ৩।২৯
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ। ৩।৩০

তিনি উপলব্ধি করেন যে, গুণসকলই পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতেছে, তিনি আসক্তির দ্বারা তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন না। যাহারা গুণসকলের দ্বারা বিমূঢ় হইয়া পড়ে, সমগ্রের জ্ঞান যাহাদের নাই, সমগ্র-জ্ঞানীরা যেন তাহাদের মানসিক ধারণাকে বিচলিত না করেন। তোমার সকল কর্ম্ম আমাকে সমর্পণ করিয়া, কামনা ও অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া, শোক-ত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর।" এখানে চেতনার দুইটি স্তরের, কর্ম্মের দুইটি প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট প্রভেদ করা হইয়াছে,—এক স্তরে আত্মা তাহার অহংভাবাপন্ন প্রকৃতিতে বদ্ধ, প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে, তাহার স্বাধীন ইচ্ছা রহিয়াছে মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন স্বাধীনতাই নাই; আর এক স্তরে আত্মা মুক্ত, সে আর নিজেকে অহংএর সহিত এক করিয়া দেখিতেছে না, প্রকৃতির উর্দ্ধে থাকিয়া প্রকৃতির কর্ম্মসকল সাক্ষীভাবে অবলোকন করিতেছে, সমর্থন করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

আমরা বলি আত্মা প্রকৃতির অধীন; কিন্তু অন্যদিকে আবার গীতা আত্মা ও প্রকৃতির লক্ষণ প্রভেদ করিতে গিয়া বলিয়াছে যে, আত্মা সকল সময়েই প্রভু, ঈশ্বর, আর প্রকৃতি কার্য্যনির্ব্বাহক শক্তি। এখানে গীতা বলিতেছে, আত্মা অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় হয়, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা, কিন্তু বেদান্তের মতে প্রকৃত যে আত্মা তাহা ভাগবত, চিরমুক্ত, আত্মবিৎ। তাহা হইলে এই যে আত্মা প্রকৃতির দ্বারা বিমূঢ় হয়, এই যে আত্মা প্রকৃতির অধীন, ইহা কি? ইহার উত্তর হইতেছে এই যে, এখানে

আমরা নিম্নতন মানসিক জ্ঞানের ভাষাই প্রয়োগ করিতেছি ; আমরা বলিতেছি, আভাস আত্মার কথা, প্রকৃত আত্মা, প্রকৃত পুরুষের কথা নহে। প্রকৃত পক্ষে অহংই হইতেছে প্রকৃতির অধীন, আর ইহা অবশ্যম্ভাবী, কারণ এই অহং নিজেই হইতেছে প্রকৃতির অংশ, তাহার যন্ত্রের একটি প্রক্রিয়া ; মানসিক চেতনায় যে আত্মসম্বিৎ তাহা যখন নিজেকে এই অহং এর সহিত এক করিয়া দেখে, তখন একটা নিম্নতন আত্মা, অহং-আত্মার আভাস সৃষ্ট হয়। সেই রকমই আমরা যাহাকে সাধারণতঃ অন্তর্পুরুষ বলিয়া মনে করি বস্তুতঃ তাহা হইতেছে প্রাকৃতিক ব্যক্তি-সত্তা, সত্য পুরুষ নহে, পরন্তু আমাদের মধ্যে বাসনাত্মক আত্মা (desire-soul), তাহা হইতেছে প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে পুরুষের চৈতন্যের প্রতিচ্ছায়া ; বাস্তবিক পক্ষে ইহা প্রকৃতির গুণত্রয়েরই একটি ক্রিয়া, অতএব প্রকৃতিরই অঙ্গ। তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, আমাদের মধ্যে দুইটি আত্মা রহিয়াছে, একটি হইতেছে আভাস আত্মা বা বাসনাত্মক আত্মা, গুণত্রয়ের পরিবর্ত্তনের সহিত ইহা পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে গুণত্রয়ের দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত, অপরটি হইতেছে মুক্ত ও শাশ্বত পুরুষ, প্রকৃতি এবং তাহার গুণসকলের অতীত। আমাদের দুইটি আত্মা রহিয়াছে, একটি হইতেছে আভাস আত্মা, তাহা কেবল অহং, আমাদের মধ্যে সেই মানসিক কেন্দ্র যাহা প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তনশীল ক্রিয়াকে, এই পরিবর্ত্তনশীল ব্যক্তি সত্তাকে গ্রহণ করিয়া বলে, "আমিই এই পুরুষ, আমিই এই প্রাকৃতিক সত্তা, আমিই এই সকল কর্ম্ম করিতেছি",—কিন্তু ঐ প্রাকৃতিক সত্তা প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে, উহা গুণসকলেরই একটা সমবায়,—অপরটি হইতেছে প্রকৃত আত্মা, তাহা বাস্তবিক পক্ষেই

প্রকৃতির ভর্ত্তা, ভোক্তা, ঈশ্বর, তাহা প্রকৃতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে কিন্তু নিজে ঐ পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক সত্তা নহে। তাহা হইলে মুক্তির পন্থা হইতেছে, এই বাসনাত্মক আত্মার বাসনা কামনা সকল বর্জ্জন করা এবং এই অহংএর মিথ্যা আত্ম-অভিমান বর্জ্জন করা। গুরু বলিলেন, নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা, বাসনা ও অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া, তোমার আত্মাকে সমস্ত কাতরতা হইতে মুক্ত করিয়া যুদ্ধ কর।

আমাদের সত্তা সম্বন্ধে এই যে মত, সাংখ্যকৃত পুরুষ প্রকৃতি যুগ্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ হইতেই ইহার আরম্ভ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অকর্ত্তা; প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা, কর্ত্রী। পুরুষ চৈতন্যের জ্যোতিতে পূর্ণ সত্তা; প্রকৃতি জড় নিশ্চেতন, তাহার সমুদয় ক্রিয়া চৈতন্যময় সাক্ষী পুরুষে প্রতিফলিত করিতেছে। প্রকৃতি তাহার গুণত্রয়ের অসাম্যের দ্বারা কর্ম্ম করে, তাহারা অনবরত পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছে, মিশ্রিত হইতেছে, পরিবর্ত্তিত হইতেছে; প্রকৃতি তাহার অহং বুদ্ধির ক্রিয়ার দ্বারা পুরুষকে এই সকল ক্রিয়ার সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিতে বাধ্য করে, এবং এইভাবেই আত্মার চিরনিশ্চলতা ও নীরবতার মধ্যে সক্রিয়, পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য ব্যক্তিত্ব ভাবের অনুভূতি সৃষ্টি করে। অশুদ্ধ প্রাকৃতিক চৈতন্য শুদ্ধ আত্ম-চৈতন্যকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া দেয়; মন অহং ভাব ও ব্যক্তিক সত্তার মধ্যে পুরুষকে ভুলিয়া যায়; আমরা ইন্দ্রিয়গত মন (sense-mind) এবং ইহার বহির্মুখী ক্রিয়াসকলের দ্বারা এবং প্রাণ ও শরীরের বাসনার দ্বারা আমাদের বিচারবুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত হইতে দিই। যতদিন পুরুষ এই কার্য্যে অনুমতি দিবে, অহং ও বাসনা ও অজ্ঞান প্রাকৃত সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করিবেই।

কিন্তু ইহাই যদি সব হইত, তাহা হইলে একমাত্র প্রতিকার হইত ঐ

অনুমতি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা, এই প্রত্যাহারের দ্বারা আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে গুণত্রয়ের নিশ্চল সাম্যাবস্থার মধ্যে পড়িতে দেওয়া বা পড়িতে বাধ্য করা এবং এইভাবে সকল কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়া। ইহা যে একপ্রকার প্রতিকার তাহাতে সন্দেহ নাই, বলিতে পারা যায় যে, এই প্রতিকারের দ্বারা রোগের সহিত রোগীকেও শেষ করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু গীতা ঠিক এই প্রতিকারটিকেই পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিয়াছে। বিশেষতঃ অজ্ঞানীদের উপর এই শিক্ষা চাপাইয়া দিলে তাহারা ঠিক তামসিক নিষ্ক্রিয়তাই অবলম্বন করিবে; তাহাদের বিচারবুদ্ধি মিথ্যা ভেদে, মিথ্যা বিরোধে পতিত হইবে, বুদ্ধিভেদঃ; তাহাদের কর্ম্মপ্রবণ প্রকৃতি এবং তাহাদের বুদ্ধি পরস্পরের বিরোধী হইয়া উঠিবে, কোন সত্য ফল উৎপন্ন না করিয়া বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করিবে, মিথ্যা ও আত্মপ্রতারণামূলক কর্ম্মধারা, মিথ্যাচার, সৃষ্টি করিবে, অথবা আসিবে একটা কেবল তামসিক নিষ্ক্রিয়তা, কর্ম্ম হইতে বিরতি, জীবন ও কর্ম্মে প্রবৃত্তির হ্রাস, অতএব তাহা প্রকৃত মুক্তি হইবে না পরন্তু প্রকৃতির অধমতম গুণের, তমঃ গুণেরই বশ্যতা হইবে, সে গুণের লক্ষণ অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তি। অথবা তাহারা ইহার কোন মর্ম্মই গ্রহণ করিতে পারিবে না, তাহারা এই উচ্চতর শিক্ষার দোষ ধরিবে, ইহার বিরুদ্ধে তাহাদের বর্ত্তমান মানসিক অনুভূতিকে, স্বাধীন ইচ্ছা সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞান ধারণাকেই সত্য বলিয়া প্রচার করিবে, এবং তাহাদের নিজেদের যুক্তিকেই সারবান মনে করিয়া তাহাদের অহং ও বাসনার ভ্রান্তি ও ছলনাতে আরও অধিক দৃঢ় হইবে, তাহাদের অজ্ঞান গভীরতর এবং প্রখরতর সমর্থন লাভ করিয়া তাহাদের মুক্তির সম্ভাবনা নষ্ট করিবে।

বাস্তবিক পক্ষে এই সকল উচ্চতর সত্য কেবল চৈতন্য ও সত্তার উচ্চতর ও উদারতর ক্ষেত্রেই সাহায্যপ্রদ হইতে পারে, কারণ কেবল সেইখানেই তাহারা অনুভূতিতে সত্য হইয়া উঠে এবং জীবনে অনুসরণের উপযোগী হয়। নীচে হইতে এই সকল সত্য দেখিলে ভুল দেখা হইবে, ভুল বুঝা হইবে। সম্ভবতঃ তাহাদের অপপ্রয়োগই করা হইবে। পাপ ও পুণ্যের প্রভেদ অহংভাবপূর্ণ মানব জীবনের পক্ষেই উপযোগী ব্যবহারিক সত্য, এই জীবন হইতেছে পশুভাব হইতে দেবভাবে উঠিবার সন্ধিস্থল, কিন্তু উচ্চতরস্তরে উঠিলে আমরা পাপ ও পুণ্যের উর্দ্ধে উঠি, ভগবান যেমন তাহাদের দ্বন্দ্বের অতীত আমরাও সেইরূপ হই—এই যে সত্য, ইহা এইরূপই উচ্চতর সত্য। কিন্তু নিম্নতর চৈতন্যে ইহা কার্য্যতঃ সত্য নহে, সেখান হইতে না উঠিয়াই যে অপরিপক্ক মন এই সত্যকে ধরিতে যাইবে, সে এইটিকে তাহার আসুরিক প্রবৃত্তিসকলকে প্রশ্রয় দিবার একটি সুবিধাজনক অছিলা করিয়া তুলিবে, পাপ পুণ্যের ভেদ একেবারেই অস্বীকার করিবে এবং নীচ ভোগের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অধঃপাতে যাইবে, সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ নষ্টান্ অচেতসঃ। প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব সম্বন্ধেও এইরূপ ; এইটিকে লোকে ভুল বুঝিবে, ইহার অপব্যবহার করিবে। এই সত্যের অপব্যবহার তাহারাই করে যাহারা বলে যে, মানুষকে তাহার প্রকৃতি যেমন গড়িয়াছে সে সেইরূপই হইয়াছে, এবং তাহার প্রকৃতি যাহা করাইবে মানুষ তাহাই করিতে বাধ্য। ইহা এক হিসাবে সত্য বটে কিন্তু লোকে ইহাকে যে অর্থে বুঝে তাহা সত্য নহে, ইহার এই অর্থ নহে যে, অহং যে-সব কাজ করিতেছে সে-সব সম্বন্ধে তাহার কোন দায়িত্বই নাই এবং সে সবের জন্য তাহাকে কোন

ফলভোগ করিতে হইবে না ; কারণ অহংএর ইচ্ছা আছে, বাসনা আছে, আর যতক্ষণ সে তাহার ইচ্ছা অনুসারে, বাসনা অনুসারে কর্ম্ম করিবে, সেটা তাহার প্রকৃতি হইলেও তাহাকে তাহার কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। বলিতে পার যে, সে একটা জালে পড়িয়াছে, একটা ফাঁদে পড়িয়াছে, তাহার বর্ত্তমান অনুভূতিতে, তাহার সীমাবদ্ধ আত্মজ্ঞানে, সেটা দুর্ব্বোধ্য, যুক্তিবিগর্হিত, অন্যায়, ভয়ঙ্কর বলিয়া বেশই মনে হইতে পারে, তথাপি সে ফাঁদ সে নিজেই সাধ করিয়া পড়িয়াছে, সে জাল তাহার নিজেরই তৈয়ারী।

গীতা বলিয়াছে বটে, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি, "সর্ব্বভূতই আপন আপন প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে, ইহাকে নিগ্রহ করিলে কি হইবে ?" যদি শুধু এই কথাটিই ধরা হয় তাহা হইলে মনে হয় যে, আত্মার উপর প্রকৃতির আধিপত্য অসীম, অনতিক্রম্য ; সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি, "জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকেন।" ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই গীতা বিধান দিয়াছে,

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩।৩৫

—"স্বধর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও উহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; স্বধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যুও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্মের অনুসরণ বিপজ্জনক।" এই "স্বধর্ম্ম" বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা আমরা দেখিতে পাইব যখন গীতার শেষের দিকে যেখানে পুরুষ, প্রকৃতি এবং গুণত্রয় সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যান আছে সেখানে যাইব ; কিন্তু

নিশ্চয়ই ইহার অর্থ এই নয় যে, আমরা যাহাকে আমাদের প্রকৃতি বলি তাহা আমাদিগকে যে-কোন প্রেরণা দিবে সেটি অশুভ হইলেও আমাদিগকে সেটি অনুসরণ করিতে হইবে। কারণ এই দুইটি শ্লোকের মধ্যস্থলে গীতা আর একটি এই বিধান দিয়াছে,

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩।৩৪

—"প্রতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়েই রাগ ও দ্বেষ অবস্থিত রহিয়াছে ; তাহাদের কবলে পতিত হইও না, তাহারা আত্মার শ্রেয়মার্গে বিঘ্নকারী।" ইহার অব্যবহিত পরেই অর্জ্জুন যখন প্রশ্ন তুলিলেন, আমাদের প্রকৃতির অনুসরণ করিতে যদি কোন দোষই নাই তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কে আমাদিগকে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন বলপূর্ব্বক পাপে প্রবৃত্ত করায় সে সম্বন্ধে কি? তখন গুরু উত্তর দিলেন, কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ, ইহা কাম এবং কামের সহচর ক্রোধ, ইহারা প্রকৃতির দ্বিতীয় গুণ বিক্ষোভাত্মক রজোগুণের সন্তান, এই কাম বা বাসনা আত্মার পরম শত্রু, ইহাকে বধ করিতে হইবে। গীতা বলিয়াছে, মুক্তির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করা এবং গীতা সর্ব্বদা আত্মজয়, আত্মসংযম, মন ও ইন্দ্রিয় ও সমগ্র নিম্নতন প্রকৃতির সংযম উপদেশ দিয়াছে।

অতএব এখানে একটা প্রভেদ করা আবশ্যক, প্রকৃতিতে যাহা মূলগত, যাহা ইহার নিজস্ব ও অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়া তাহাকে দমন করিবার, চাপিয়া দিবার, নিগ্রহ করিবার চেষ্টা বৃথা ; আর প্রকৃতিতে যাহা মূলগত নহে পরন্তু আগন্তুক, প্রকৃতির পথচ্যুতি, বিশৃঙ্খলা, বিকৃতি—এ-সবকে

সংযত করিতেই হইবে। "নিগ্রহ" ও "সংযম" এই দুয়ের মধ্যেও প্রভেদ রহিয়াছে, জোর করিয়া দমন করা, চাপিয়া দেওয়া "নিগ্রহ," আর যথাযথ ব্যবহার, যথাযথ পরিচালনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করাই "সংযম"। প্রথমটি হইতেছে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রকৃতির উপর অত্যাচার, তাহা শেষ পর্য্যন্ত সত্তার স্বাভাবিক শক্তিগুলিকে অবসন্ন করিয়া দেয়, আত্মানম্ অবসাদয়েৎ; দ্বিতীয়টি হইতেছে উর্দ্ধতন আত্মার দ্বারা নিম্নতন আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করা, তাহা সকল স্বাভাবিক শক্তিকে তাহাদের যথাযথ ক্রিয়া এবং উচ্চতম দক্ষতা প্রদান করে, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। সংযমের এই স্বরূপ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বেশ স্পষ্ট করিয়াছে *। "আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে, আত্মাকে কখনও (অতিরিক্ত ভোগ বা দমনের দ্বারা নির্জ্জিত ও অবসন্ন করিবে না); কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। সেই ব্যক্তির আত্মাই বন্ধু যাহার মধ্যে (নিম্নতন) আত্মা (উর্দ্ধতন) আত্মার দ্বারা বিজিত হইয়াছে, কিন্তু যে-ব্যক্তি তাহার (উর্দ্ধতন) আত্মাকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে তাহরে (নিম্নতন) আত্মা শত্রুবৎ এবং শত্রুর ন্যায়ই কার্য্য করে।" যখন কেহ নিজ

---

* উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৬।৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬।৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৬।৭

আত্মাকে জয় করিয়াছেন এবং পূর্ণ আত্মজয় ও আত্মলাভের শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তখন তাহার মধ্যে পরমাত্মা বাহ্য মানবীয় চৈতন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্য কথায় বলিতে গেলে, নিম্নতন আত্মাকে উর্দ্ধতন আত্মার দ্বারা জয় করা, প্রাকৃত সত্তাকে অধ্যাত্ম সত্তার দ্বারা জয় করা, ইহাই মানুষের সিদ্ধি ও মুক্তি লাভের পন্থা।

তাহা হইলে এইখানেই দেখা যাইতেছে, প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব কত বেশী পরিমিত, এবং ইহার অর্থ ও পরিধির সঠিক সীমা কি। প্রকৃতির বশ্যতা হইতে মুক্ত হইয়া কেমন করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব লাভ করা যায় তাহা আমরা উত্তমরূপে দেখিতে পাই যদি আমরা অনুধাবন করি প্রকৃতির গুণগুলির ক্রিয়া পর্য্যায়ক্রমে অধঃ হইতে উর্দ্ধ পর্য্যন্ত কিরূপ। সর্ব্বনিম্নস্তরে যে সব বস্তু রহিয়াছে তাহাদের উপর তমোগুণেরই পূর্ণ আধিপত্য, তাহারা এখনও আত্ম-চেতনার আলোক লাভ করে নাই, তাহারা প্রকৃতির প্রবাহের দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে চালিত হয়। পরমাণুর (atom) মধ্যেও একটা ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে, কিন্তু আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, তাহা স্বাধীন ইচ্ছা নহে, কারণ ইহা যন্ত্রবৎ (mechanical), আর ঐ ইচ্ছা পরমাণুটির অধিকৃত নহে, পরমাণুটিই ঐ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অধিকৃত। এখানে যে বুদ্ধি রহিয়াছে, প্রকৃতির মধ্যে বোধ ও সঙ্কল্পের তত্ত্ব, ইহা বস্তুতঃ এবং স্পষ্টতঃ সাংখ্য যাহা বলিয়াছে তাহাই, জড়, একটা যন্ত্রবৎ এমন কি নিশ্চেতন তত্ত্ব, সেখানে চেতন আত্মার জ্যোতি আদৌ সম্মুখে আসিতে পারে নাই ; পরমাণু তাহার বোধশক্তি ও ইচ্ছা-শক্তি সম্বন্ধে সজ্ঞান নহে ; অপ্রবৃত্তি ও অজ্ঞানের তত্ত্ব তমঃ গুণই তাহাকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, নিজের মধ্যে রজঃগুণকে ধরিয়া রাখিয়াছে,

১৩

সংযত করিতেই হইবে। "নিগ্রহ" ও "সংযম" এই দুয়ের মধ্যেও প্রভেদ রহিয়াছে, জোর করিয়া দমন করা, চাপিয়া দেওয়া "নিগ্রহ," আর যথাযথ ব্যবহার, যথাযথ পরিচালনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করাই "সংযম"। প্রথমটি হইতেছে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রকৃতির উপর অত্যাচার, তাহা শেষ পর্য্যন্ত সত্তার স্বাভাবিক শক্তিগুলিকে অবসন্ন করিয়া দেয়, আত্মানম্ অবসাদয়েৎ; দ্বিতীয়টি হইতেছে উর্দ্ধতন আত্মার দ্বারা নিম্নতন আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করা, তাহা সকল স্বাভাবিক শক্তিকে তাহাদের যথাযথ ক্রিয়া এবং উচ্চতম দক্ষতা প্রদান করে, যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। সংযমের এই স্বরূপ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বেশ স্পষ্ট করিয়াছে *। "আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে, আত্মাকে কখনও (অতিরিক্ত ভোগ বা দমনের দ্বারা নির্জ্জিত ও অবসন্ন করিবে না); কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। সেই ব্যক্তির আত্মাই বন্ধু যাহার মধ্যে (নিম্নতন) আত্মা (উর্দ্ধতন) আত্মার দ্বারা বিজিত হইয়াছে, কিন্তু যে-ব্যক্তি তাহার (উর্দ্ধতন) আত্মাকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে তাহরে (নিম্নতন) আত্মা শত্রুবৎ এবং শত্রুর ন্যায়ই কার্য্য করে।" যখন কেহ নিজ

---

* উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৬।৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬।৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৬।৭

আত্মাকে জয় করিয়াছেন এবং পূর্ণ আত্মজয় ও আত্মলাভের শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তখন তাহার মধ্যে পরমাত্মা বাহ্ মানবীয় চৈতন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্য কথায় বলিতে গেলে, নিম্নতন আত্মাকে উর্দ্ধতন আত্মার দ্বারা জয় করা, প্রাকৃত সত্তাকে অধ্যাত্ম সত্তার দ্বারা জয় করা, ইহাই মানুষের সিদ্ধি ও মুক্তি লাভের পন্থা।

তাহা হইলে এইখানেই দেখা যাইতেছে, প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব কত বেশী পরিমিত, এবং ইহার অর্থ ও পরিধির সঠিক সীমা কি। প্রকৃতির বশ্যতা হইতে মুক্ত হইয়া কেমন করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব লাভ করা যায় তাহা আমরা উত্তমরূপে দেখিতে পাই যদি আমরা অনুধাবন করি প্রকৃতির গুণগুলির ক্রিয়া পর্য্যায়ক্রমে অধঃ হইতে উর্দ্ধ পর্য্যন্ত কিরূপ। সর্ব্বনিম্নস্তরে যে সব বস্তু রহিয়াছে তাহাদের উপর তমোগুণেরই পূর্ণ আধিপত্য, তাহারা এখনও আত্ম-চেতনার আলোক লাভ করে নাই, তাহারা প্রকৃতির প্রবাহের দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে চালিত হয়। পরমাণুর (atom) মধ্যেও একটা ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে, কিন্তু আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, তাহা স্বাধীন ইচ্ছা নহে, কারণ ইহা যন্ত্রবৎ (mechanical), আর ঐ ইচ্ছা পরমাণুটির অধিকৃত নহে, পরমাণুটিই ঐ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অধিকৃত। এখানে যে বুদ্ধি রহিয়াছে, প্রকৃতির মধ্যে বোধ ও সঙ্কল্পের তত্ত্ব, ইহা বস্তুতঃ এবং স্পষ্টতঃ সাংখ্য যাহা বলিয়াছে তাহাই, জড়, একটা যন্ত্রবৎ এমন কি নিশ্চেতন তত্ত্ব, সেখানে চেতন আত্মার জ্যোতি আদৌ সম্মুখে আসিতে পারে নাই ; পরমাণু তাহার বোধশক্তি ও ইচ্ছা-শক্তি সম্বন্ধে সজ্ঞান নহে ; অপ্রবৃত্তি ও অজ্ঞানের তত্ত্ব তমঃ গুণই তাহাকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, নিজের মধ্যে রজঃগুণকে ধরিয়া রাখিয়াছে,

সত্ত্বগুণকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, এবং অবাধ প্রভুত্বের লীলা করিতেছে; সত্য বটে প্রকৃতি এই সকল বস্তুকে বিরাট শক্তির সহিত কর্ম্ম করাইতেছে, কিন্তু জড় যন্ত্ররূপে, যন্ত্রারূঢ়ম্ মায়য়া। ইহারই উপরের স্তরে উদ্ভিদ, সেখানে রজঃগুণ সম্মুখে আসিতে পারিয়াছে, তাহার সহিত আনিয়াছে জীবনী শক্তি এবং আমাদের মধ্যে যাহা সুখ দুঃখ বলিয়া অনুভূত হয় সেই সব স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার সামর্থ্য, কিন্তু সত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা এখনও চেতন বুদ্ধির আলোক জাগ্রত করিতে অগ্রসর হয় নাই; এখনও সবই যন্ত্রবৎ, অবচেতন বা অর্দ্ধচেতন, তমঃ রজঃ অপেক্ষাও প্রবল, উভয়ে মিলিয়া সত্ত্বকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

ইহার উপরের স্তরে হইতেছে পশু; যদিও তমঃ এখনও খুবই প্রবল, যদিও আমরা পশুকে তামসিক সর্গেরই অন্তর্গত বলিতে পারি, তথাপি এখানে তমোগুণের বিরুদ্ধে রজোগুণের শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক, রজঃ তাহার সহিত লইয়া আসিয়াছে তাহার জীবন, কাম, ক্রোধ, সুখ, দুঃখের বিকশিত শক্তি, আর সত্ত্ব এখনও নীচের ক্রিয়ার অধীন হইলেও সম্মুখে আসিতেছে, এই সমুদয়কে সচেতন মনের প্রথম আলোক, স্থূল অহংভাব, সচেতন স্মৃতি, এক প্রকারের চিন্তাশক্তি, বিশেষতঃ সহজাত প্রেরণা এবং পশুসুলভ সহজবোধের আশ্চর্য্য শক্তি আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু এখনও বুদ্ধি চৈতন্যের পূর্ণ আলোক লাভ করে নাই; অতএব পশুকে তাহার কার্য্যের জন্য দায়ী করা যায় না। যেমন পরমাণুকে তাহার অন্ধ গতির জন্য, অগ্নিকে দগ্ধ করার জন্য, ঝড়কে ধ্বংস করার জন্য দোষ দেওয়া যায় না তেমনই ব্যাঘ্রকে হত্যা ও গ্রাস করার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। ব্যাঘ্র যদি জবাব দিতে পারিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে

মানুষের মত বলিত যে, তাহার স্বাধীন ইচ্ছা রহিয়াছে ; কর্ত্তার অহংবোধ তাহার মধ্যে থাকিত এবং সে বলিত, "আমি হত্যা করি, আমি গ্রাস করি", কিন্তু আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, বাস্তবিক পক্ষে ব্যাঘ্র নহে পরন্তু ব্যাঘ্রের ভিতর প্রকৃতিই বধ করে, ব্যাঘ্রের ভিতর প্রকৃতিই গ্রাস করে ; আর যদি সে বধ করিতে বা গ্রাস করিতে বিরত হয় তবে সেটা ক্ষুধার অভাব, ভয় বা আলস্য হইতে, এবং ইহা তাহার মধ্যে প্রকৃতিরই আর একটি গুণের ক্রিয়া, তমোগুণের ক্রিয়া। ব্যাঘ্রের ভিতর প্রকৃতি যেমন বধ করে তেমনি ব্যাঘ্রের ভিতর প্রকৃতিই বধকার্য্য হইতে বিরত হয়। ব্যাঘ্রের মধ্যে যে-আত্মাই থাকুক তাহা নির্ব্বিরোধে প্রকৃতির কার্য্যে সায় দেয়, ব্যাঘ্রের আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তায় সে যেমন নিশ্চেষ্ট, পশুটির ক্রোধ ও কর্ম্মের মধ্যেও সে তেমনই নিশ্চেষ্ট। পরমাণুর ন্যায় পশুও তাহার প্রকৃতির যান্ত্রিক ক্রিয়ার বশেই কর্ম্ম করে, সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ, যেন যন্ত্রে আরূঢ়, যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।

তাহা হউক, কিন্তু অন্ততঃ মানুষের মধ্যে ত অন্য এক রকমের ক্রিয়া আছে, একটা স্বাধীন আত্মা আছে, দায়িত্বজ্ঞান আছে, প্রকৃতি ব্যতীত, মায়ার যান্ত্রিক কৌশল ব্যতীত একজন সত্যকার কর্ত্তা আছে ? এইরূপই মনে হয়, কারণ মানুষের মধ্যে রহিয়াছে সচেতন বুদ্ধি ; সাক্ষী পুরুষের জ্যোতিতে এই বুদ্ধি পূর্ণ, মনে হয় পুরুষ এই বুদ্ধির ভিতর দিয়া দেখে, বুঝে, সম্মত হয় অথবা অসম্মত হয়, অনুমতি দেয় অথবা নিষেধ করে, মনে হয় এইবার বুঝি পুরুষ তাহার প্রকৃতির প্রভু হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষ ব্যাঘ্র বা অগ্নি বা জড় পরমাণুর মত নহে ; সে খুন করিয়া এমন সাফাই দিতে পারে না যে, "আমি আমার প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম করি-

তেছি," পারে না কারণ ব্যাঘ্র, জড় বা অগ্নির প্রকৃতি তাহার প্রকৃতি নহে এবং তাহাদের স্বধর্ম্ম, তাহাদের কর্ম্মের নীতি, তাহার স্বধর্ম্ম নহে। তাহার আছে একটা সচেতন বুদ্ধি, এবং সেই বুদ্ধিকে অনুসরণ করিয়া তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। যদি সে তাহা না করে, যদি সে তাহার ইন্দ্রিয়ের বশে, রিপুর তাড়নায় অন্ধভাবে কর্ম্ম করে, তাহা হইলে তাহার স্বধর্ম্ম যথাযথ অনুষ্ঠান করা হয় না, স্বধর্ম্মঃ স্ব-অনুষ্ঠিতঃ ; তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্বের যোগ্য কর্ম্ম করা হয় না, কেবল পশুর মতনই কর্ম্ম করা হয়। সত্য বটে যে, সে যে-কোন কর্ম্মই করুক বা যে কোন কর্ত্তব্যই অবহেলা করুক, তাহার মধ্যে রজোগুণ অথবা তমোগুণ তাহার বুদ্ধিকে ধরিয়া তাহা সমর্থন করাইয়া লয় ; তবুও যেমন করিয়া হউক বুদ্ধির সমর্থন লইতেই হয়, অন্ততঃ বুদ্ধিকে জানাইতে হয়, তা সে কর্ম্মের আগেই হউক বা পরেই হউক। তাহা ছাড়া মানুষের মধ্যে সত্ত্ব জাগ্রত, তাহা কেবল বুদ্ধি এবং বুদ্ধিমূলক সঙ্কল্পরূপেই ক্রিয়া করে না পরন্তু আলোকের সন্ধান করে, যথাযথ জ্ঞান চায় এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী যথাযথ কর্ম্ম করিতে চায়, অপরের জীবন ও দাবী সম্বন্ধে সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করে, তাহার মধ্যে সাত্ত্বিকতা তাহার নিজের প্রকৃতির যে উচ্চতর ধর্ম্ম সৃষ্টি করে তাহা জানিতে এবং তাহা অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে, এবং পুণ্য, জ্ঞান ও সহানুভূতি যে মহত্তর শান্তি ও সুখ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে সে সম্বন্ধে ধারণা করে। মানুষ অল্পাধিক অসম্পূর্ণভাবে জানে যে, তাহার সাত্ত্বিক প্রকৃতির দ্বারা তাহার রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, তাহার সাধারণ মনুষ্যত্বের পূর্ণতা ও সিদ্ধি লাভের ইহাই পন্থা।

কিন্তু প্রকৃতিতে সাত্ত্বিকতার প্রাধান্যই কি মুক্তির অবস্থা, আর মানুষের মধ্যে এই ইচ্ছা কি স্বাধীন ইচ্ছা? গীতা এক উচ্চতর চৈতন্যের দিক হইতে দেখিয়া ইহা অস্বীকার করিয়াছে। সাত্ত্বিক অবস্থাতে চেতন বুদ্ধি হইতেছে প্রকৃতিরই একটি যন্ত্র এবং যখন তাহা কাজ করে, যত সাত্ত্বিকভাবেই সে কাজ করা হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিই সে-কাজ করে এবং আত্মা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় মায়ার দ্বারাই চালিত হয়। অন্ততঃপক্ষে ইহা ঠিকই যে আমরা যাহাকে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলি তাহার দশ অংশের নয় অংশই স্পষ্টতঃ ভ্রম; কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে ঐ ইচ্ছা কি হইবে, কোন দিকে চালিত হইবে তাহা স্বতঃ নির্দ্ধারিত হয় না পরন্তু আমাদের অতীত, আমাদের বংশ, আমাদের শিক্ষা, আমাদের পরিবেষ্টনীর দ্বারা, যে বিরাট জটিল জিনিষকে আমরা "কর্ম্ম" বলি সমগ্রভাবে তাহার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়; এই "কর্ম্ম" আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, আমাদের উপরে এবং জগতের উপরে প্রকৃতির যে সমগ্র অতীত ক্রিয়া তাহা এক এক ব্যক্তির উপরে কেন্দ্রীভূত হইতেছে, সে কি হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছে, কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে তাহার ইচ্ছা কি হইবে এবং, যতদূর বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, সেই মুহূর্ত্তে সে কি কাজ করিবে তাহাও নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছে। অহং সকল সময়েই নিজের "কর্ম্মের" সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে এবং বলে, "আমি করিয়াছি", "আমি ইচ্ছা করি", "আমি দুঃখ ভোগ করি", কিন্তু সে যদি নিজের দিকে চাহিয়া দেখে এবং বুঝে যে, সে কিরূপে গঠিত হইয়াছে তাহা হইলে সে যেমন পশুর সম্বন্ধে তেমনিই মানুষের সম্বন্ধেও বলিতে বাধ্য হইবে যে, "প্রকৃতি আমার মধ্যে ইহা করিয়াছে, প্রকৃতি

আমার মধ্যে ইচ্ছা করে," আর যদি সে সংশোধন করিয়া বলে "আমার প্রকৃতি", তাহার অর্থ কেবল ইহাই হয়—"প্রকৃতি এই বিশেষ জীবটির মধ্যে নিজে যে-রূপ গ্রহণ করিয়াছে।" জগতের এই দিকটা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়াই বৌদ্ধগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, সমস্তই হইতেছে "কর্ম্ম", আত্মা বলিয়াই কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই, আত্মা হইতেছে মানসিক অহংয়ের একটা ভ্রম মাত্র। অহং যখন মনে করে, "আমি এই পুণ্য কর্ম্ম করিতে সঙ্কল্প করিতেছি, ঐ পাপ কর্ম্মটা বর্জ্জন করিতেছি", তখন সে প্রকৃতির সত্ত্বগুণের একটি ক্রিয়াকেই নিজ ক্রিয়া বলিয়া ভ্রম করে, বস্তুতঃ এই সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রকৃতি বুদ্ধির ভিতর দিয়া এক প্রকার কর্ম্ম বাছিয়া লয়, অন্য প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করে ; প্রকৃতির এই ক্রিয়ার সহিত অহং নিজেকে এক করিয়া দেখে ঠিক যেমন ঘূর্ণায়মান চক্রের উপরিস্থিত মক্ষিকা অথবা ঐ চক্রেরই দন্ত বা অন্য কোন অংশ (যদি তাহা সচেতন হইত) মনে করিতে পারে যে, সে নিজেই ইচ্ছা করিয়া ঘুরিতেছে। সাংখ্য বলে, নিষ্ক্রিয় সাক্ষী পুরুষের আনন্দের নিমিত্ত প্রকৃতি আমাদের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিতেছে, সঙ্কল্প করিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে।

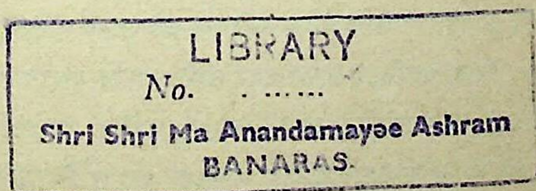
কিন্তু যদিও সাংখ্যের এই একান্ত উক্তি সংশোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক (কিভাবে সংশোধন প্রয়োজন তাহা আমরা পরে দেখিব) তথাপি আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্বাধীনতা (যদি আমরা উহাকে এই নাম দিতেই চাই) খুবই আপেক্ষিক (relative), প্রায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে অন্য এমন বহু জিনিয যাহাদের উপর আমাদের কোন হাতই নাই। ইহার যে প্রবলতম শক্তি তাহাও

প্রকৃত প্রভুত্ব নহে। উহা যে ঘটনাস্রোতের তীব্র বেগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে সে ভরসা করিতে পারা যায় না; রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি সাত্ত্বিক প্রকৃতিকে দাবাইয়া রাখে, অথবা ক্ষুণ্ণ করিয়া দেয় অথবা উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে, আর যদি তা না পারে ত সূক্ষ্মভাবে উহাকে প্রতারিত করে, ফাঁকি দেয়। আমাদের ইচ্ছা যত সাত্ত্বিকই হউক না কেন, রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা উহা এরূপ অভিভূত বা মিশ্রিত বা প্রতারিত হয় যে তাহা কেবল আংশিক ভাবেই সাত্ত্বিক হইতে পারে; মনোবিজ্ঞানীর নির্ম্মম সূক্ষ্ম দৃষ্টি মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মের মধ্যেও যে বহুল পরিমাণ আত্ম-প্রতারণার অংশ ধরিয়া ফেলে তাহা এইভাবেই উত্থিত হয়, অজ্ঞাতসারে এমন কি নির্দ্দোষভাবেই মানুষ মনকে চোখ ঠারে, নিজেদের সঙ্গেই লুকোচুরি খেলিয়া থাকে। যখন আমরা মনে করি যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই কাজ করিতেছি, তখনও আমাদের কর্ম্মের পশ্চাতে কত শক্তি লুকাইয়া থাকে, অতিশয় সতর্ক আত্ম-অনুসন্ধানের দ্বারাও তাহাদিগকে ধরিতে পারা যায় না; যখন আমরা মনে করি অহং হইতে মুক্ত হইয়াছি, তখনও অহং থাকে, প্রচ্ছন্নভাবে—যেমন পাপীর মনের মধ্যে থাকে তেমনি সাধুর মনের মধ্যেও থাকে। আমাদের কর্ম্ম এবং কর্ম্মের উৎস সম্বন্ধে যখন আমাদের চক্ষু প্রকৃতভাবে খুলিয়া যায়, তখন আমরা গীতার সঙ্গেই বলিতে বাধ্য হই, গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে, "প্রকৃতির গুণসকলই গুণসকলের উপর ক্রিয়া করিতেছে।"

এইজন্য সত্ত্বগুণের সমুচ্চ প্রাধান্য হইলেও তাহাতে প্রকৃত স্বাধীনতার অবস্থা হয় না। কারণ, গীতা দেখাইয়াছে যে, অন্যান্য গুণের ন্যায় সত্ত্বও

বন্ধন করে, এবং অন্যান্য গুণের ন্যায়ই বাসনার দ্বারা, অহংএর দ্বারা বন্ধন করে ; সে বাসনা মহত্তর, সে অহং শুদ্ধতর,—কিন্তু যতদিন এই দুইটি যে কোন রূপে সত্তাকে অধিকার করিয়া থাকিবে ততদিন স্বাধীনতা নাই। যে মনুষ্য সাধু, জ্ঞানী, তাঁহার মধ্যে সাধুর অহং রহিয়াছে, জ্ঞানীর অহং রহিয়াছে এবং তিনি সেই সাত্ত্বিক অহংকে তৃপ্ত করিতে চান ; তিনি নিজের জন্যই সাধুতা চান, জ্ঞান চান। আমাদের মধ্যে যে অহং রহিয়াছে, আমাদের ক্ষুদ্র "আমি", যখন আমরা আর তাহাকে তৃপ্ত করিতে চাহি না, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া চিন্তা করি না, ইচ্ছা করি না কেবল তখনই হয় প্রকৃত স্বাধীনতার অবস্থা। অন্য কথায়, স্বাধীনতা, উচ্চতম আত্মজয় আরম্ভ হয় যখন প্রাকৃত আত্মার উর্দ্ধে আমরা পরম আত্মাকে দেখিতে পাই, ধরিতে পারি ; অহং তাহাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, অন্ধকার ছায়ায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আর ইহা কেবল তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন আমরা প্রকৃতির উর্দ্ধে অবস্থিত এক আত্মাকে আমাদের মধ্যে দেখিতে পাই এবং আমাদের ব্যষ্টিগত সত্তাকে সত্তায় ও চেতনায় তাহার সহিত এক করি এবং তাহাকে তাহার ব্যষ্টিগত কর্ম্মশীল প্রকৃতিতে এক পরম ইচ্ছা শক্তির, যে একমাত্র ইচ্ছা শক্তি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন তাহারই যন্ত্র করিয়া দিই। ইহার জন্য আমাদিগকে গুণত্রয়ের বহু উর্দ্ধে উঠিতেই হইবে, ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে ; কারণ ঐ আত্মা সত্ত্বগুণেরও উর্দ্ধে। আমাদিগকে তাহাতে উঠিতে হইবে সত্ত্বের ভিতর দিয়াই, কিন্তু আমরা যখন সত্ত্বকে অতিক্রম করিব কেবল তখনই তাহাকে লাভ করিব ; অহংকে ধরিয়াই আমরা তাহার দিকে অগ্রসর হই, কিন্তু অহংকে না ছাড়িলে তাহাতে

উপনীত হইতে পারি না। আমরা তাহার দিকে আকৃষ্ট হই যে বাসনার দ্বারা তাহা উচ্চতম, তীব্রতম, অন্য সকল বাসনা অপেক্ষা তাহা প্রবল ও উল্লাসময়; কিন্তু যতক্ষণ না সকল বাসনা আমাদের সত্তা হইতে খসিয়া পড়িতেছে ততক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে নিশ্চিতভাবে বাস করিতে পারি না। একটা অবস্থায় আমাদিগকে আমাদের মুক্তির বাসনা হইতেও মুক্ত হইতে হইবে।



ত্রিগুণাতীত

প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্বের সীমা কতদূর তাহা আমরা দেখিলাম, এই নিয়ন্তৃত্বের অর্থ কেবল এই যে, আমরা যে অহং হইতে কর্ম্ম করি তাহা নিজেই প্রকৃতির ক্রিয়ার একটি যন্ত্রবিশেষ এবং সেইজন্যই তাহা প্রকৃতির বশ্যতা হইতে মুক্ত হইতে পারে না; অহংয়ের যে ইচ্ছা তাহা প্রকৃতির দ্বারাই নির্ণীত ইচ্ছা, আমাদের মধ্যে প্রকৃতি তাহার নিজেরই অতীত কর্ম্ম ও আত্ম-পরিবর্ত্তনসমূহের দ্বারা যে-ভাবে গঠিত হইয়াছে ঐ ইচ্ছা সেই প্রকৃতিরই অংশ, আর আমাদের মধ্যে এইভাবে গঠিত প্রকৃতির দ্বারা এবং ইহার মধ্যে এইভাবে গঠিত ইচ্ছার দ্বারাই আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আমরা সর্ব্বপ্রথমে যে কর্ম্ম করি সেটি আমরা সর্ব্বদা স্বাধীনভাবেই বাছিয়া লই, তাহার পরে যাহা কিছু আসে তাহা সেই প্রাথমিক কর্ম্মের দ্বারা যতই নির্দ্ধারিত হউক না কেন, আর এই যে প্রথমে আরম্ভ করিবার ক্ষমতা এবং আমাদের ভবিষ্যতের উপর ইহার পরিণাম এইখানেই রহিয়াছে আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু প্রকৃতিতে এমন প্রথম কর্ম্ম কোথায় যাহার পিছনে কোন অতীত নেই, তাহাকে নির্দ্ধারণ করিয়া দেয় নাই? আমাদের প্রকৃতির সেই বর্ত্তমান অবস্থা কোথায় যাহা সাকল্যে এবং খুঁটিনাটিতে আমাদের অতীত প্রকৃতির কর্ম্মের পরিণাম নহে? স্বাধীন প্রাথমিক কর্ম্মের ধারণা এইজন্যই আমাদের মনে উঠে যে, আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াই জীবন যাপন করি, আমরা সর্ব্বদা

আমাদের বর্ত্তমান হইতে আমাদের অতীতের দিকে ফিরিয়া চাহি না, সেইজন্যই বর্ত্তমান এবং বর্ত্তমানের পরিণামফলই আমাদের মনে জীবন্তভাবে স্পষ্ট হইয়া থাকে, আর আমাদের বর্ত্তমান যে সম্পূর্ণভাবেই আমাদের অতীতের পরিণাম সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট থাকে ; এই অতীতকে আমরা দেখি যেন একেবারে মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে। আমরা কথা কই, কর্ম্ম করি যেন শুদ্ধ ও নবীন মুহূর্ত্তে আমরা আমাদিগকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত, আমরা ভিতর হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এমন কোন সম্পূর্ণ মুক্তি নাই, আমাদের সঙ্কল্পে এমন কোনও স্বাধীনতা নাই।

অবশ্য আমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা রহিয়াছে তাহাকে সকল সময়েই কয়েকটি সম্ভাবনার মধ্যে কোন একটি বাছিয়া লইতে হয়, কারণ প্রকৃতি সর্ব্বদা এইভাবেই কর্ম্ম করে ; এমন কি আমাদের নিশ্চেষ্টতা, কোনরূপ ইচ্ছা করিতে অস্বীকার, ইহাও একটা নির্ব্বাচন, ইহাও হইতেছে আমাদের মধ্যে প্রকৃতির ইচ্ছার একটি ক্রিয়া, এমন কি পরমাণুর মধ্যেও একটা ইচ্ছাশক্তি সকল সময়েই কর্ম্ম করিতেছে। প্রকৃতির মধ্যে যে ইচ্ছা কর্ম্ম করিতেছে তাহার সহিত আমরা আমাদের অহংভাবকে কতটা সংযুক্ত করি তাহা লইয়াই সমস্ত প্রভেদ ; যখন আমরা এইভাবে নিজদিগকে উহার সহিত সংযুক্ত করি, তখন আমরা মনে করি যে ঐটি আমাদেরই ইচ্ছা এবং বলি যে উহা হইতেছে স্বাধীন ইচ্ছা এবং আমরা নিজেরাই কর্ম্ম করিতেছি। আর ইহা ভুল হউক আর না হউক, ভ্রান্তি হউক আর না হউক, ইহা যে নিস্ফল, ইহার যে কোন উপযোগিতা নাই

তাহা নহে; প্রকৃতিতে প্রত্যেক জিনিষেরই ফল আছে, উপযোগিতা আছে। বস্তুতঃ ইহা হইতেছে আমাদের চেতন সত্তার সেই প্রক্রিয়া যাহার দ্বারা আমাদের মধ্যে প্রকৃতি তাহার অন্তরস্থিত গুপ্ত পুরুষের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে ক্রমশঃ বেশী বেশী সজ্ঞান ও সজাগ হইয়া উঠে এবং সেই জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা কর্ম্ম সম্বন্ধে বৃহত্তর সম্ভাবনায় উন্মুক্ত হয়; এই অহংভাব ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার সাহায্যেই সে নিজেকে তাহার উচ্চতর সম্ভাবনাসমূহে উন্নীত করে, তামসিক প্রকৃতির পূর্ণ বা সমধিক নিশ্চেষ্টতা হইতে রাজসিক প্রকৃতির আবেগ ও সংগ্রামের মধ্যে উঠে এবং রাজসিক প্রকৃতির আবেগ ও সংগ্রাম হইতে সাত্ত্বিক প্রকৃতির মহত্তর জ্যোতি, সুখ ও পবিত্রতার মধ্যে উঠে। প্রাকৃত মানব নিজের উপর যে আপেক্ষিক আত্মজয় লাভ করে তাহা হইতেছে তাহার প্রকৃতির নিম্নতন সম্ভাবনাসকলের উপরে তাহার উচ্চতর সম্ভাবনাসকলের প্রাধান্য; আর ইহা সম্পন্ন হয় যখন উচ্চতর গুণ নিম্নতর গুণকে জয় করিবার, বশীভূত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে তাহার সহিত সে তাহার অহংভাবকে সংযুক্ত করে। স্বাধীন ইচ্ছার অনুভূতি ভ্রান্ত হউক আর নাই হউক, ইহা প্রকৃতির কর্ম্মের একটি আবশ্যকীয় কৌশল, মানুষের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয়, আর সে যতক্ষণ না উচ্চতর সত্যের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে ততক্ষণ এই অনুভূতি নষ্ট হইলে তাহার পক্ষে বিভ্রাট হইবে। যদি বলা যায় (এমন বলা হইয়া থাকে) যে, প্রকৃতি মানুষকে প্রতারণা করিয়া নিজের আদেশ পালন করাইয়া লয়, আর ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা হইতেছে এইসব প্রতারণার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতম, তাহা হইলে ইহাও বলিতে হইবে যে, এই প্রতারণা তাহারই কল্যাণের জন্য

এবং ইহা ছাড়া তাহার পূর্ণ সম্ভাবনাসমূহের বিকাশ হইতে পারে না।

কিন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবেই প্রতারণা নহে, ইহা কেবল একটা দেখিবার ভুল, ইহাকে ঠিক যে-ভাবে যেখানে দেখিতে হইবে সেরূপ দেখা হয় না। অহং মনে করে যে, সে-ই হইতেছে প্রকৃত আত্মা, সে এমনভাবে ব্যবহার করে যেন সে-ই হইতেছে কর্ম্মের কেন্দ্র, যেন সব কিছু রহিয়াছে তাহারই জন্য, এবং এইখানেই সে দেখিবার ভুল করে, বুঝিবার ভুল করে। সে যে মনে করে, আমাদের প্রকৃতির এই কর্ম্মের মধ্যে এমন কেহ বা কোন বস্তু রহিয়াছে যে তাহার কর্ম্মের প্রকৃত কেন্দ্র, তাহার জন্যই সব কিছু রহিয়াছে—ইহাতে কোন ভুলই নাই; কিন্তু এইটি অহং নহে, ইহা হইতেছে আমাদের হৃদ্দেশে অবস্থিত ঈশ্বর, ভাগবত পুরুষ, এবং তাঁহার অংশস্বরূপ জীব,—এই জীব আর অহং এক বস্তু নহে। আমাদের মধ্যে প্রকৃত এক আত্মা রহিয়াছে, সে সকলের প্রভু, তাহারই জন্য, তাহারই আদেশে প্রকৃতি সমুদয় কর্ম্ম করিতেছে,—আমাদের মনে এই সত্যেরই বিকৃত চূর্ণিত ছায়া হইতেছে অহংয়ের অহমিকা। সেইরূপই অহংয়ের যে স্বাধীন ইচ্ছার অনুভূতি তাহাও হইতেছে—আমাদের মধ্যে এক মুক্ত আত্মা রহিয়াছে এই সত্যেরই বিকৃত ও অযথান্যস্ত অনুভূতি; প্রকৃতিতে যে ইচ্ছা তাহা হইতেছে এই আত্মারই ইচ্ছার মন্দীভূত ও বিকৃত ছায়া,—মন্দীভূত ও বিকৃত কারণ উহা কালের মুহূর্ত্তসকলের ধারাবাহিকতার মধ্যে রহিয়াছে এবং অনবরত পরিবর্ত্তনের দ্বারা কর্ম্ম করিতেছে, তাহাতে অতীতের পূর্ণ স্মৃতি নাই, ভবিষ্যতের ফলাফল ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই। কিন্তু অন্তরে যে দিব্য ইচ্ছা

তাহা কালের মুহূর্ত্তসকলের উর্দ্ধে এবং তাহা এই সমস্তই জানে; আমরা বলিতে পারি যে, ঐ অভ্যন্তরীণ ইচ্ছা ও জ্ঞান পূর্ণ অতিমানস জ্যোতিতে যাহা ভবিষ্যদ্দৃষ্টি করে, আমাদের মধ্যে প্রকৃতির কর্ম্ম হইতেছে সেইটিকে প্রাকৃত ও অহংভাবময় অজ্ঞানের দুরূহ পরিস্থিতিতে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা।

কিন্তু আমাদের ক্রম প্রগতিতে এমন একদিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন আমরা আমাদের সত্তার প্রকৃত সত্যের দিকে চক্ষু উন্মীলন করিতে প্রস্তুত হইব, আর তখন আমাদের অহংয়ের স্বাধীন ইচ্ছার ভ্রান্তি নিশ্চয়ই দূর হইয়া যাইবে। অহংভাবাত্মক স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা বর্জ্জনের অর্থ কর্ম্মের অবসান নহে, কারণ প্রকৃতিই হইতেছে কর্ত্রী, তাহার ক্রমবিকাশে অহংভাবের উদ্ভব হইবার পূর্ব্বে যেমন সে কর্ম্ম করিত এই যন্ত্রটি পরিত্যক্ত হইবার পরও সে তেমনিই কর্ম্ম করিবে। এমন কি যে মানুষের মধ্যে ইহা পরিত্যক্ত হইবে তাহার মধ্যে বৃহত্তর কর্ম্মের বিকাশ করা প্রকৃতির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে; কারণ তাহার মন আরও ভালরূপে বুঝিতে পারিবে অতীতের আত্মবিকাশের দ্বারা তাহার প্রকৃতি বর্ত্তমানে কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, আরও ভালরূপে জানিতে পারিবে কি কি পারিপার্শ্বিক শক্তি তাহার প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করিয়া প্রকৃতির বিকাশের বাধা বা সহায় হইতেছে, আর তাহার মধ্যে যে-সব জিনিষ প্রকট হইতে পারে কিন্তু এখনও প্রকট হয় নাই সে-সবের জন্য যে সকল মহত্তর সম্ভাবনা তাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সে সকল সম্বন্ধেও সে অধিকতর সজ্ঞান হইয়া উঠিবে; আর এই যে মহত্তর সম্ভাবনাসকলের সন্ধান সে পায় এই সব সম্বন্ধে আত্মপুরুষের অনুমতি এইরূপ অহংভাবশূন্য

মনের ভিতর দিয়া আরও অবাধে আসিতে পারে এবং তাহাতে প্রকৃতির সাড়া দিবার পক্ষে এবং তাহার ফলস্বরূপ ঐ সকল সম্ভাবনার বিকাশ ও সিদ্ধির পক্ষে এইরূপ মন আরও অবাধ যন্ত্র হইতে পারে। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছার বর্জ্জন যেন আমাদের মধ্যে যে প্রকৃত আত্মা রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে দৃষ্টিবিরহিত বুদ্ধিতে কেবল অদৃষ্টবাদ (**fatalism**) বা প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ববাদ না হয়; কারণ তাহা হইলে কেবলমাত্র অহংকেই আত্মা বলিয়া আমাদের মনে ধারণা থাকিয়া যাইবে, আর যেহেতু ঐ অহং সকল সময়েই প্রকৃতির যন্ত্রমাত্র, আমরা অহংকে ধরিয়া এবং আমাদের ইচ্ছাকে প্রকৃতির যন্ত্রস্বরূপ করিয়া কর্ম্ম করিব, এবং এইরূপ ধারণা কোন প্রকৃত পরিবর্ত্তন আনিবে না, কেবল আমাদের বুদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু সংশোধন হইবে। আমাদের অহং ও অহংয়ের ক্রিয়া যে প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এই বাহ্যিক সত্যটিই আমরা মানিয়া লইব; কিন্তু আমাদের মধ্যে গুণসকলের ক্রিয়ার অতীত যে অজাত আত্মা রহিয়াছে তাহার দর্শন আমরা পাইব না; আমাদের মুক্তির দ্বার কোথায় রহিয়াছে তাহার দর্শন আমরা পাইব না। প্রকৃতি ও অহং লইয়াই আমাদের সব নহে; আমাদের মধ্যে রহিয়াছে মুক্ত আত্মা, পুরুষ।

কিন্তু পুরুষের স্বাধীনতার স্বরূপ কি? প্রচলিত সাংখ্য দর্শনের পুরুষ আপন মূল সত্তায় স্বাধীন, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়, "অকর্ত্তা" বলিয়াই স্বাধীন; সে প্রকৃতিকে তাহার কর্ম্মের ছায়া নিষ্ক্রিয় আত্মার উপর ফেলিতে যখন অনুমতি দেয় তখন সে বাহ্যতঃ গুণসকলের কর্ম্মাবলীর দ্বারা বদ্ধ হইয়া পড়ে এবং যতক্ষণ না সে প্রকৃতি হইতে নিজেকে বিযুক্ত

করে এবং প্রকৃতির খেলা বন্ধ না হইয়া যায় ততক্ষণ সে তাহার স্বাধীনতা ফিরিয়া পায় না। তাহা হইলে যদি কোন মনুষ্য "আমি কর্ত্তা" বা "আমার কর্ম্ম" এইরূপ অহংভাব বর্জ্জন করে, যদি গীতার উপদেশ মত সে নিজেকে অকর্ত্তা বলিয়া দেখে, আত্মানম্ অকর্ত্তারম্, কর্ম্মসকল তাহার নিজের নহে পরন্তু প্রকৃতির, প্রকৃতির গুণত্রয়ের খেলা—এই উপলব্ধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে কি অনুরূপ ফল হইবে না? সাংখ্যের পুরুষ হইতেছে অনুমন্তা, কিন্তু সে কেবল নিষ্ক্রিয় ভাবেই অনুমতি দেয়, কর্ম্মটি সম্পূর্ণভাবেই হইতেছে প্রকৃতির; মূলতঃ সেই পুরুষ হইতেছে দ্রষ্টা ও ভর্ত্তা, বিশ্ব-ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রী ও সক্রিয়া চৈতন্য নহে। সে পুরুষ দেখে, গ্রহণ করে, কোন নাটক অভিনয়ের দ্রষ্টা যেভাবে ঐ অভিনয়কে গ্রহণ করে সেইভাবে সে গ্রহণ করে, কিন্তু যে পুরুষ নিজের দ্বারা উদ্ভাবিত এবং নিজের সত্তার মধ্যে অভিনীত নাটককে দেখে এবং নিয়ন্ত্রণও করে সাংখ্যের পুরুষ তাহা নহে। তাহা হইলে যদি সে অনুমতিটি প্রত্যাহার করিয়া লয়, যে কর্ত্তৃত্বভাবের ভ্রান্তি হইতে অভিনয়টি চলিতেছে সেই ভ্রান্তি স্বীকার করিতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে সে আর ভর্ত্তা থাকে না, প্রকৃতির ঐ খেলাকে ধরিয়া থাকে না, এবং সেইজন্য কর্ম্মটি থামিয়া যায়, কারণ কেবল দ্রষ্টা চৈতন্যময় পুরুষের ভোগের জন্যই প্রকৃতি ঐ কর্ম্ম সম্পাদন করে এবং কেবল পুরুষের দ্বারা বিধৃত হইলেই সে উহা চালাইতে পারে। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বিষয়ে গীতার শিক্ষা সাংখ্য হইতে ভিন্ন, কারণ একই প্রক্রিয়ার ফল হইতেছে সম্পূর্ণ পৃথক, এক ক্ষেত্রে ফল হইতেছে কর্ম্মের বিরতি, আর এক ক্ষেত্রে ফল হইতেছে মহান কর্ম্ম, নিস্বার্থ ও

নিষ্কাম কর্ম্ম, দিব্য কর্ম্ম। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতি হইতেছে তুইটি বিভিন্ন বস্তু, গীতার মতে তাহারা হইতেছে একই স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার তুইটি দিক, তুইটি শক্তি; পুরুষ কেবল অনুমতিদাতা নহেন, পরন্তু তিনি প্রকৃতির ঈশ্বর, প্রকৃতির ভিতর দিয়া তিনি জগৎলীলা উপভোগ করিতেছেন, প্রকৃতির ভিতর দিয়া জগতে ভাগবত ইচ্ছা ও জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিতেছেন,—এই জগতের ব্যবস্থা তাঁহারই অনুমতির দ্বারা বিধৃত, তিনি সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন বলিয়া ইহার অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে, ইহা রহিয়াছে তাঁহারই সত্তায়; তাঁহার সত্তার ধর্ম্মের দ্বারা এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত সচেতন ইচ্ছার দ্বারা ইহা নিয়ন্ত্রিত। এই পুরুষকে জানা, ইহার আহ্বানে সাড়া দেওয়া, ইহার দিব্য সত্তা ও প্রকৃতির মধ্যে বাস করা—এই উদ্দেশ্যেই অহং এবং তাহার ক্রিয়াকে বর্জ্জন করিতে হয়। তখন মানুষ ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উর্দ্ধতন ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে উঠে।

নীচের প্রকৃতি হইতে ভাগবত প্রকৃতিতে এই উন্নয়ন যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সংসাধিত হয় তাহা পুরুষের সহিত প্রকৃতির জটিল সম্বন্ধ হইতেই উদ্ভূত; ইহা গীতার পুরুষত্রয় তত্ত্বের উপরে নির্ভর করে। যে পুরুষ সাক্ষাৎভাবে প্রকৃতির কার্য্য, তাহার পরিবর্ত্তন লীলা, তাহার ক্রমান্বয় বিকাশকে অনুপ্রাণিত করিতেছে তাহাই ক্ষর পুরুষ; মনে হয় ইহা প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার চলার সহিত চলিতেছে, প্রকৃতির "কর্ম্মের" অবিশ্রান্ত ক্রিয়ার দ্বারা এই পুরুষের নাম রূপের যে-সব পরিবর্ত্তন হইতেছে সে-সবকে সে তাহার সত্তার পরিবর্ত্তন বলিয়াই অনুসরণ করিতেছে। প্রকৃতি এখানে ক্ষর, কালের

মধ্যে অবিরাম গতি ও পরিবর্ত্তন, অবিরাম বিবর্ত্তন। কিন্তু এই প্রকৃতি পুরুষেরই কার্য্যকরী শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে; কারণ প্রকৃতি কি হইবে তাহা পুরুষের স্বরূপেরই উপর নির্ভর করে, পুরুষের বিবর্ত্তনের যে-সব সম্ভাবনা রহিয়াছে তদনুসারেই প্রকৃতি কার্য্য করিতে পারে; প্রকৃতি পুরুষের সত্তার বিবর্ত্তনকে প্রকট করিতেছে। প্রকৃতির "কর্ম্ম" পুরুষের "স্বভাবের" (the own-nature) দ্বারা, তাহার আত্ম-বিবর্ত্তনের (self-becoming) ধারার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়, যদিও অনেক সময় মনে হয় যে কর্ম্মের দ্বারাই প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হইতেছে, কারণ ইহার দ্বারাই বিবর্ত্তন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। আমরা স্বরূপে যাহা তদনুসারে আমরা কর্ম্ম করি, আবার আমাদের কর্ম্মের দ্বারাই আমাদের স্বরূপকে বিকশিত করি, প্রকট করি। প্রকৃতিই হইতেছে কর্ম্ম, পরিবর্ত্তন, বিবর্ত্তন এবং প্রকৃতিই হইতেছে সেই শক্তি যাহার দ্বারা এই সব সম্পাদিত হয়; কিন্তু পুরুষ হইতেছে চৈতন্যময় সত্তা, তাহা হইতেই ঐ শক্তি উদ্ভূত, তাহারই চৈতন্যের জ্যোতির্ম্ময় উপাদান হইতে প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল ইচ্ছা আহরণ করিয়াছে, সেই ইচ্ছা নিজ পরিবর্ত্তন সমূহ প্রকৃতির কর্ম্মের মধ্যে প্রকট করিতেছে। আর এই পুরুষ একও বটে, বহুও বটে; ইহা হইতেছে সেই এক প্রাণ-সত্তা যাহা হইতে সমস্ত প্রাণ সৃষ্ট হইয়াছে আবার ইহাই সমস্ত প্রাণী; ইহা হইতেছে এক বিশ্ব-সত্তা আবার ইহাই হইতেছে বিশ্বের সমস্ত সত্তা, সর্ব্বভূতানি, কারণ এই সবই হইতেছে অদ্বিতীয় এক; বহু পুরুষ সবই হইতেছে তাহাদের মূল সত্তায় একমেবাদ্বিতীয়ম্ একমাত্র পুরুষ। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যান্ত্রিক কৌশল স্বরূপ যে অহংভাব রহিয়াছে, যাহা

প্রকৃতিরই ক্রিয়ার একটা অংশ, তাহার বশে মন বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের সীমাবদ্ধ বিবর্ত্তনের সহিত, কোন বিশেষ দেশ ও কালে প্রকৃতির সক্রিয় চৈতন্যের সমষ্টির সহিত, প্রকৃতির অতীত কর্ম্মসমষ্টির যে-ফল মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হইতেছে তাহার সহিত পুরুষের চৈতন্যকে একই বলিয়া ধারণা করে। প্রকৃতির মধ্যেই এই সব জীবের একত্ব এক প্রকারে উপলব্ধি করা যাইতে পারে, বিশ্ব প্রকৃতির সমগ্র কর্ম্মে এক বিশ্বপুরুষ অভিব্যক্ত, প্রকৃতি পুরুষকে অভিব্যক্ত করিতেছে, পুরুষই প্রকৃতি হইতেছে—এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু ইহা হইতেছে কেবল বিরাট বিশ্ব বিবর্ত্তনকে জানা, এই বিবর্ত্তন মিথ্যা নহে, মায়া নহে, কিন্তু ইহার জ্ঞান হইতেই আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারি না, কারণ আমাদের প্রকৃত আত্মা সকল সময়েই ইহা অপেক্ষা আরও কিছু, ইহার উর্দ্ধে আরও কিছু।

কারণ যে পুরুষ প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত এবং তাহার কর্ম্মে বদ্ধ তাহার উর্দ্ধে রহিয়াছে পুরুষের আর এক স্থিতি (status), তাহা শুধুই একটা স্থিতি, তাহা একেবারেই ক্রিয়া নহে, সেইটি হইতেছে নীরব, অক্ষর, সর্ব্বব্যাপী, স্বপ্রতিষ্ঠ, নিশ্চল আত্মা, সর্ব্বগতম্ অচলম্, তাহা বিবর্ত্তন নহে পরন্তু অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা, তাহাই অক্ষর পুরুষ। ক্ষরে পুরুষ প্রকৃতির কর্ম্মের মধ্যে জড়িত হইয়াছে, অতএব সে কালের স্রোতে, বিবর্ত্তনের তরঙ্গে কেন্দ্রীভূত, যেন নিজেকে তাহার মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে নহে, কেবল এইরূপ দেখায় মাত্র। অক্ষরে প্রকৃতি পুরুষের মধ্যে নীরবতায় পতিত হয় এবং বিশ্রাম করে, অতএব পুরুষ নিজ অক্ষর সত্তা অবগত হয়। ক্ষর

হইতেছে সাংখ্যের পুরুষ যখন সে প্রকৃতির গুণসকলের বৈচিত্র্যময় খেলা নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে, এবং নিজেকে সগুণ (the personal) বলিয়া জানে ; অক্ষর হইতেছে সাংখ্যের পুরুষ যখন এই গুণ সকল সাম্যাবস্থায় পতিত হয় এবং পুরুষ নিজেকে নির্গুণ (the impersonal) বলিয়া জানে। অতএব ক্ষর পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির কর্ম্মের সহিত এক করায় কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়, আর গুণসমূহের ক্রিয়া হইতে বিযুক্ত অক্ষর হইতেছে নিষ্ক্রিয় অকর্ত্তা এবং সাক্ষী। মানুষের আত্মা যখন ক্ষরের প্রতিষ্ঠা গ্রহণ করে, তখন নামরূপের খেলার সহিত নিজেকে এক বলিয়া দেখে এবং প্রকৃতিতে যে অহংভাব রহিয়াছে তাহার দ্বারা নিজ আত্ম-জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিতে তৎপর হয়, অতএব সে তাহার অহংকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে ; আর যখন সে অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে নির্গুণ নির্ব্যক্তিক পুরুষের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে, এবং প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিয়া ও নিজেকে নিষ্ক্রিয় সাক্ষী বলিয়া অবগত হয়, অকর্ত্তারম্। মানুষের মনকে এই দুইটি প্রতিষ্ঠার কোন একটির দিকে ঝুঁকিতে হয়, একটিকে গ্রহণ করিতে গেলে সে অপরটিকে ছাড়িয়া দেয় ; হয় সে প্রকৃতির দ্বারা গুণের ও নামরূপের পরিবর্ত্তনের ধারায় কর্ম্মে বদ্ধ হয় অথবা সে অক্ষর নির্ব্যক্তিক সত্তায় প্রকৃতির কর্ম্মপরম্পরা হইতে মুক্ত হয়।

কিন্তু এই দুইটি, পুরুষের স্থিতি ও অক্ষরতা এবং প্রকৃতিতে পুরুষের কর্ম্ম, তাহার ক্ষরতা—ইহারা বস্তুতঃ একই সঙ্গে যুগপৎ রহিয়াছে। এই সমস্যার সমাধান করিতে মায়াবাদ বা দ্বৈতবাদের ন্যায় কোন মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত যদি না পুরুষের এমন এক পরম সত্তা

থাকিত, এই দুইটি, ক্ষর ও অক্ষর, যাহার দুইটি বিপরীত দিক, কিন্তু তাহা এই দুইটির কোনটির দ্বারাই সীমাবদ্ধ নহে। আমরা দেখিয়াছি গীতা এই সত্তা পাইয়াছে পুরুষোত্তম তত্ত্বের মধ্যে। পরম পুরুষ হইতেছেন ঈশ্বর, ভগবান, সর্ব্ব জীবের প্রভু, সর্ব্বভূতমহেশ্বর। তিনি তাঁহার নিজ সক্রিয়া প্রকৃতিকে (গীতার ভাষায় স্বাম্ প্রকৃতিম্) জীবের মধ্যে প্রকট করেন, তাহা প্রত্যেক জীবের স্বভাবের দ্বারা, তাহার অন্তর্নিহিত ভাগবত সত্তার ধর্ম্ম অনুসারে (প্রত্যেক জীবকেই এই ধর্ম্মের মূল ধারাগুলি অনুসরণ করিতে হয়) প্রকটিত হয়, আবার তাহা অহংভাবাত্মক প্রকৃতিতেও গুণত্রয়ের পরস্পরের উপর জটিল ক্রিয়ার দ্বারা (গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে) প্রকটিত হয়। ইহাই ত্রৈগুণ্যময়ী মায়া, মানুষের পক্ষে এই মায়া অতিক্রম করা বড়ই কঠিন, দুরত্যয়া,—তথাপি গুণত্রয়ের অতীত হইয়া মানুষ ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে। কারণ যদিও ঈশ্বর ক্ষরভাবে তাঁহার প্রকৃতি-শক্তির দ্বারা এই সব সম্পন্ন করেন, তথাপি অক্ষরভাবে তিনি অস্পৃষ্ট, উদাসীন, সব সমভাবে দেখেন, সকলের মধ্যেই ব্যপ্ত, অথচ সকলেরই ঊর্দ্ধে। তিন অবস্থাতেই তিনি ঈশ্বর, সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় তিনি পরমেশ্বর, অক্ষর অবস্থায় তিনি প্রভু ও বিভু, সর্ব্বব্যাপী নির্ব্যক্তিক সত্তা, এবং ক্ষর অবস্থায় তিনি সর্ব্বগত ইচ্ছাশক্তি এবং সর্ব্বত্র বিদ্যমান সক্রিয় ঈশ্বর। যখন তিনি তাঁহার নামরূপের খেলা প্রকট করিতেছেন তখনও তিনি নামরূপের অতীত নির্ব্যক্তিক সত্তায় মুক্ত; তিনি কেবল নির্গুণও নহেন, কেবল সগুণও নহেন, তিনি এই দুই ভাবে একই অদ্বিতীয় সত্তা; উপনিষদের ভাষায় তিনি নির্গুণো

গুণী। কখন কি সংঘটিত হইবে সে সব তিনি পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন (তখনও জীবিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সম্বন্ধে তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, "আমি ইহাদিগকে ইতিপূর্ব্বেই মারিয়া রাখিয়াছি"), আর প্রকৃতি যাহা সংঘটিত করে তাহা কেবল তাঁহারই দিব্য সঙ্কল্পের ফল; তথাপি পিছনে তাঁহার নির্ব্যক্তিকতার জন্য তিনি তাঁহার কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হন না, কর্ত্তারম্ অকর্ত্তারম্।

কিন্তু ব্যষ্টিগত সত্তারূপে মানুষ অজ্ঞানের বশে নিজেকে কর্ম্মের সহিত এবং বিবর্ত্তনের সহিত এক করিয়া দেখে, যেন ঐটিই তাহার আত্মার সবখানি, যেন উহা আত্মার কেবলএকটা শক্তি নহে, উহা হইতেই উদ্ভূত নহে,—এইজন্যই সে অহংভাবের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। সে মনে করে যে, সে এবং অন্যান্য লোকই সব করিতেছে; সে দেখিতে পায় না যে, প্রকৃতিই সব করিতেছে এবং সে অজ্ঞান ও আসক্তির বশে প্রকৃতির কর্ম্মাবলীকে ভুল করিয়া, বিকৃত করিয়া দেখিতেছে। সে গুণ-সকলের দাস, কখনও তমঃ গুণের জড়তার দ্বারা প্রতিহত হইতেছে, কখনও রজঃ গুণের প্রবল ঝটিকার বেগে উড়িয়া যাইতেছে, কখনও সত্ত্বগুণের আংশিক আলোকের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেছে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রাকৃত-মনই এইভাবে গুণ সকলের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সেই মন হইতে সে নিজেকে আদৌ পৃথক করিয়া দেখিতেছে না। সেইজন্যই সে দুঃখ ও সুখ, হর্ষ ও শোক, বাসনা ও রিপু, আসক্তি ও ঘৃণা এই সকলের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে; তাহার কোনরূপ স্বাধীনতা নাই।

মুক্ত হইতে হইলে তাহাকে প্রকৃতির কর্ম্ম হইতে ফিরিয়া অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হইতেই হইবে ; তখন সে গুণত্রয়ের উর্দ্ধে উঠিবে, ত্রিগুণাতীত হইবে। নিজেকে অক্ষর ব্রহ্ম, অপরিবর্ত্তনীয় পুরুষ জানিয়া সে নিজেকে অক্ষর নির্ব্যক্তিক সত্তা বলিয়া, আত্মা বলিয়া জানিবে, প্রকৃতির কর্ম্মধারাকে শান্তভাবে দর্শন করিবে, নিরপেক্ষভাবে সমর্থন করিবে, কিন্তু নিজে থাকিবে স্থির, উদাসীন, অস্পৃষ্ট, অচল, শুদ্ধ, সর্ব্বভূতের সহিত তাহাদের আত্মায় এক, প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্যাবলীর সহিত এক নহে। যদিও এই আত্মা হইতেছে "প্রভু", "বিভু", তাহার উপস্থিতির দ্বারা প্রকৃতিকে কর্ম্ম করিবার অধিকার দিতেছে, তাহার সর্ব্বব্যাপী সত্তার দ্বারা প্রকৃতির সেই সকল কর্ম্ম ধরিয়া রহিয়াছে, অনুমোদন করিতেছে, তথাপি সে নিজে কর্ম্ম সৃষ্টি করে না, কর্তৃত্বের ভাবও সৃষ্টি করে না, অথবা কর্ম্মের সহিত ফলের সংযোগও সৃষ্টি করে না* পরন্তু ক্ষরভাবে প্রকৃতি কেমন করিয়া এইসব সংঘটিত করিতেছে, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে, কেবল তাহাই দর্শন করে, এই সংসারে জাত কোন জীবের পাপ বা পুণ্য সে নিজের বলিয়া গ্রহণ করে না† ; সে তাহার আধ্যাত্মিক নির্ম্মলতা রক্ষা করে। অজ্ঞানে বিমূঢ় অহংই এইসব জিনিষকে নিজের উপর আরোপ করে, কারণ সে কর্ত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে, বাস্তবিক পক্ষে সে যে এক মহত্তর শক্তির যন্ত্র তাহা

*ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ।৫।১৪

†নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ । ৫।১৫

ভুলিয়া নিজেই কর্ত্তা সাজে ; অজ্ঞানেনাবৃতম্ জ্ঞানম্ তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। নির্গুণ নির্ব্যক্তিক সত্তায় ফিরিয়া গিয়া জীবাত্মা মহত্তর আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং প্রকৃতির কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তাহার গুণসকলের দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, তাহার শুভ অশুভের, পাপ পুণ্যের ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হয়। প্রাকৃত সত্তা, মন, দেহ, প্রাণ তখনও থাকে, প্রকৃতি তখনও কার্য্য করে ; কিন্তু আভ্যন্তরীণ সত্তা আর এই সকলের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে না, আর প্রাকৃত সত্তায় গুণসকলের খেলা চলিলেও সে হর্ষ বা শোক করে না। সে হয় সকল ব্যাপারের দ্রষ্টা, স্থির ও মুক্ত অক্ষর আত্মা।

এইটিই কি শেষ অবস্থা, চূড়ান্ত সম্ভাবনা, শ্রেষ্ঠ রহস্য ? তাহা হইতেই পারে না, কারণ ইহা একটা মিশ্রিত বা দ্বিখণ্ডিত অবস্থা, সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যের অবস্থা নহে, এখানে সত্তা দ্বিধা, তাহাতে ঐক্য সিদ্ধ হয় নাই, আত্মায় রহিয়াছে মুক্তি, কিন্তু প্রকৃতিতে রহিয়াছে অপূর্ণতা। ইহা কেবল একটি ধাপ মাত্র হইতে পারে। তাহা হইলে ইহার ঊর্দ্ধে আর কি আছে ? এক সমাধান হইতেছে সন্ন্যাসীর, তিনি প্রাকৃতিক কর্ম্মকে সম্পূর্ণভাবেই বর্জ্জন করেন, অন্ততঃ কর্ম্ম যতদূর বর্জ্জন করা সম্ভব তাহা করেন, যেন অমিশ্র অখণ্ড মুক্তি লাভ করা যায় ; কিন্তু ইহা গীতা কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইলেও গীতার অনুমোদিত সমাধান নহে। গীতাও কর্ম্ম ত্যাগের উপর জোর দিয়াছে, সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্য, কিন্তু সে ত্যাগ ভিতরের, ব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ। ক্ষরে ব্রহ্ম সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির কর্ম্ম সমর্থন করিতেছেন, অক্ষরভাবে সে-কর্ম্ম সমর্থন করিলেও নিজেকে সে-কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র রাখিতেছেন, নিজের মুক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন ;

ব্রহ্মের অক্ষরভাবের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যষ্টিগত জীব মুক্ত ও স্বতন্ত্র হয়, অথচ ব্রহ্মের ক্ষরভাবের সহিত যুক্ত হইয়া প্রকৃতির কর্ম্মকে সমর্থন করে কিন্তু তাহার দ্বারা স্পৃষ্ট বা বদ্ধ হয় না। ইহা সে সর্ব্বোত্তমভাবে করিতে পারে যখন সে দেখে যে, এই দুইটি হইতেছে এক পুরুষোত্তমেরই দুইটি ভাব। পুরুষোত্তম সর্ব্বভূতের মধ্যে গুপ্ত ঈশ্বররূপে বিরাজিত থাকিয়া প্রকৃতিকে পরিচালিত করেন এবং তাঁহার ইচ্ছার বশে প্রকৃতি স্বভাবের দ্বারা কর্ম্মসকল সম্পাদন করে, সে ইচ্ছা আর তখন জীবের অহংভাবের দ্বারা বিকৃত ও স্বরূপভ্রষ্ট হয় না। ব্যষ্টিগত জীব দিব্যভাবাপন্ন প্রকৃতিকে ভাগবত ইচ্ছার যন্ত্র করিয়া দেয়, নিমিত্ত মাত্রম্। সে কর্ম্মের মধ্যেও থাকে ত্রিগুণাতীত, গুণত্রয়ের উর্দ্ধে, গুণ সকল হইতে মুক্ত, নিস্ত্রৈগুণ্য, গীতা পূর্ব্বেই যে আদেশ দিয়াছে, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন, শেষ পর্য্যন্ত সে তাহা সমগ্রভাবে পূর্ণ করে। অবশ্য তখনও সে ব্রহ্মের ন্যায়ই গুণসকলের ভোক্তা থাকে, কিন্তু সে আর তাহাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে না, নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ, সে ব্রহ্মের ন্যায় সব কিছু ধরিয়া থাকিয়াও অনাসক্ত থাকে, অসক্তম্ সর্ব্বভৃৎ; কিন্তু তাহার মধ্যে গুণসকলের ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায়, তাহাদের অহংমূলক স্বরূপ ও প্রতিক্রিয়ার উর্দ্ধে উন্নীত হয়। কারণ সে তাহার সমগ্র সত্তাকে পুরুষোত্তমের মধ্যে একীভূত করিয়াছে, সে ভাগবত সত্তাকে এবং উচ্চতর ভাগবত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়াছে, মদ্ভাবম্, এমন কি তাহার মন এবং প্রাকৃত চৈতন্যকেও ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়াছে, মন্মনা, মচ্চিত্ত। এই রূপান্তরই প্রকৃতির চরম বিকাশ এবং দিব্য জন্মের পূর্ণ সিদ্ধি, রহস্যম্ উত্তমম্। যখন ইহা

সংসাধিত হয়, জীব নিজেকে প্রকৃতির প্রভু বলিয়া জানিতে পারে এবং ভাগবত জ্যোতির জ্যোতি হইয়া এবং ভাগবত ইচ্ছার ইচ্ছা হইয়া তাহার প্রাকৃত কার্য্যাবলীকে দিব্য কর্ম্মে পরিণত করিতে পারে।

নির্ব্বাণ ও সংসারের কাজ

পূর্ণযোগের দ্বারা পুরুষোত্তমের সহিত জীবাত্মার মিলনই গীতার সম্পূর্ণ শিক্ষা, শুধু জ্ঞানের পথে কেবল অক্ষর পুরুষের সহিত মিলনের যে সঙ্কীর্ণতর মত তাহা নহে। এইজন্যই গীতা প্রথমে জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য করিয়া দেখাইতে পারিয়াছে যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সহিত সমন্বিত প্রেম ও ভক্তিই হইতেছে উত্তম রহস্যে পৌছিবার শ্রেষ্ঠতম পন্থা। কারণ যদি অক্ষর পুরুষের সহিত মিলনই একমাত্র রহস্য বা উচ্চতম রহস্য হইত তাহা হইলে উহা আদৌ সম্ভব হইত না; কারণ তাহা হইলে একটা বিশেষ অবস্থায় যেমন আমাদের কর্ম্মের আভ্যন্তরীণ ভিত্তি ধ্বংস ও লুপ্ত হইত ঠিক তেমনিই প্রেম ও ভক্তিরও আভ্যন্তরীণ ভিত্তি ধ্বংস ও লুপ্ত হইয়া যাইত। কেবল অক্ষর পুরুষের সহিত সম্পূর্ণ ও অনন্য মিলনের অর্থ হইতেছে ক্ষরভাবের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন, শুধু ইহার সাধারণ ও নিম্নতন ক্রিয়া নহে পরন্তু ইহার যাহা একেবারে মূল, যাহা ইহার অস্তিত্বকে সম্ভব করিয়াছে, শুধু অজ্ঞানের মধ্যে কার্য্যাবলী নহে, পরন্তু জ্ঞানের মধ্যেও কার্য্যাবলী সবেরই সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন। ইহার অর্থ হইবে মানুষ ও ভগবানের মধ্যে সচেতন প্রতিষ্ঠা ও কর্ম্মে যে পার্থক্য রহিয়াছে, যাহার ফলে ক্ষরপুরুষের খেলা সম্ভব হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন, কারণ তখন ক্ষরের কর্ম্ম হইবে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞানেরই খেলা, তাহাতে ভাগবত সত্যের কোন মূল বা ভিত্তি থাকিবে না। অন্য পক্ষে, যোগের দ্বারা পুরুষোত্তমের সহিত মিলনের অর্থ হইতেছে

আমাদের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তায় তাঁহার সহিত আমাদের একত্বের উপলব্ধি ও আস্বাদন এবং আমাদের ক্রিয়াশীল সত্তায় তাঁহার সহিত একটা প্রভেদ, বিশেষ। এই প্রভেদ দিব্যকর্ম্মের খেলায় বর্ত্তমান থাকে, সে কর্ম্ম হয় দিব্য প্রেমের দ্বারা প্ররোচিত এবং সিদ্ধ ভাগবত প্রকৃতির দ্বারা অনুষ্ঠিত; দিব্য কর্ম্মে এই প্রভেদের স্থায়িত্ব এবং আত্মায় ভগবানের যে উপলব্ধি তাহার সহিত জগতে ভগবানের উপলব্ধির সামঞ্জস্য, ইহার জন্যই মুক্ত কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্ম ও ভক্তি সম্ভব হয়, আর শুধু সম্ভব নহে, তাহার পূর্ণ সিদ্ধির অবস্থায় উহা অবশ্যম্ভাবী হয়।

কিন্তু অক্ষর আত্মার স্বপ্রতিষ্ঠ উপলব্ধির ভিতর দিয়াই হইতেছে পুরুষোত্তমের সহিত মিলনের সোজা পথ, আর যে-হেতু গীতা এইটি না হইলে কর্ম্ম ও ভক্তি তাহাদের পূর্ণ দিব্য সার্থকতা লাভ করিতে পারে না বলিয়া প্রথম প্রয়োজনরূপে এইটির উপর এত জোর দিয়াছে সেইজন্যই গীতার অর্থ বুঝিতে ভুল করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কারণ গীতা যে-সকল শ্লোকে এই প্রয়োজনের উপর খুব বেশী জোর দিয়াছে কেবল সেইগুলিই যদি গ্রহণ করি, কিন্তু পূর্ব্বাপর চিন্তাধারায় তাহাদের স্থান কি সেইটি সমগ্রভাবে লক্ষ্য করিতে অবহেলা করি তাহা হইলে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, গীতা বাস্তবিক পক্ষে কর্ম্মহীন লয়ের অবস্থাকেই জীবের চরম গতি বলিয়া শিক্ষা দিতেছে, অচল অক্ষর সত্তায় নিথর শান্তিলাভের সাধনায় কর্ম্ম কেবল প্রথমাবস্থায় উপযোগী উপায়মাত্র; পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে এবং সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা এই প্রয়োজনের উপর যে-জোর দিয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও ব্যাপক। সেখানে আমরা যে যোগের বর্ণনা পাই

তাহার সহিত কর্ম্মের সামঞ্জস্য হয় না বলিয়াই প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের মনে হইতে পারে এবং যোগী যে পরম পদ লাভ করেন তাহার বর্ণনা করিতে সেখানে "নির্ব্বাণ" শব্দটি পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই পদের লক্ষণ হইতেছে শান্ত আত্ম-নির্ব্বাণের পরম শান্তি, শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং, আর ইহা যে বৌদ্ধমতানুযায়ী শূন্যে আনন্দময় আত্ম-নির্ব্বাণ নহে পরন্তু পূর্ণ সত্তার মধ্যে আংশিক সত্তার বিলয়, যেন তাহাই বুঝাইবার জন্য গীতা সর্ব্বদা "ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ", ব্রহ্মের মধ্যে নির্ব্বাণ, এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছে; আর স্পষ্টতঃই মনে হয় যে, এখানে ব্রহ্ম বলিতে অক্ষরকেই বুঝাইতেছে, অন্ততঃপক্ষে প্রধানতঃ সেই কালাতীত অভ্যন্তরীণ আত্মাকে বুঝাইতেছে যাহা প্রকৃতির বাহ্য ব্যাপারে অনুস্যূত থাকিলেও তাহাতে সক্রিয়ভাবে কোনই অংশ গ্রহণ করে না। অতএব আমাদিগকে দেখিতে হইবে, এখানে গীতার কথার প্রকৃত মর্ম্ম কি, বিশেষতঃ এই যে শান্তির কথা বলা হইতেছে ইহা কি সম্পূর্ণ কর্ম্মশূন্য বিরতির শান্তি, অক্ষরে আত্ম-নির্ব্বাণের অর্থ কি ক্ষরের সমস্ত জ্ঞান ও চৈতন্যের এবং ক্ষরের সমস্ত কর্ম্মের সম্পূর্ণ বর্জ্জন? বস্তুতঃ নির্ব্বাণের সহিত সংসারে কোনরূপ অস্তিত্ব ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য হয় না এইরূপ ধারণাতেই আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর আমরা যুক্তি দেখাইতে পারি যে, "নির্ব্বাণ" শব্দটির ব্যবহারই যথেষ্ট এবং ইহার দ্বারাই প্রশ্নটির চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু আমরা যদি বৌদ্ধমতই অনুধাবন করিয়া দেখি তাহা হইলে নির্ব্বাণের সহিত সংসার ও সংসারিক কর্ম্মের অসামঞ্জস্য বস্তুতপক্ষে বৌদ্ধদেরই মত ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইবে; আর যদি আমরা গীতার শিক্ষা অনুধাবন করি

তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এরূপ মত এই মহত্তম বৈদান্তিক শিক্ষার অন্তর্গত নহে।

যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে উঠিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণিস্থিতঃ, তাঁহার পূর্ণ সমতার কথা বলিয়া গীতা ব্রহ্মযোগ ও ব্রহ্মে নির্ব্বাণ বলিতে কি বুঝে পরবর্ত্তী নয়টি শ্লোকে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছে। প্রথমেই রহিয়াছে, "আত্মা যখন আর বাহ্য বস্তুর স্পর্শে আসক্ত নহে তখনই মানুষ আত্মায় যে সুখ রহিয়াছে তাহা লাভ করে; এরূপ ব্যক্তি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন, কারণ তাঁহার আত্মা ব্রহ্মের সহিত যোগে যুক্ত।"* বাসনা ও ক্রোধ ও চিত্তবিক্ষোভের আক্রমণ হইতে মুক্ত হইতে হইলে অনাসক্তি হইতেছে মূল প্রয়োজন, এবং এইরূপ মুক্তি না হইলে প্রকৃত সুখও সম্ভব নহে, ইহাই গীতার বক্তব্য। ঐ সুখ এবং ঐ সমতা মানুষকে এই শরীরেই সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইবে; বিক্ষোভময় নীচের প্রকৃতির বশ্যতার লেশ মাত্র রহিবে না, শরীর ত্যাগ করিয়াই পূর্ণ মুক্তি লাভ করা যায় এই ধারণা বর্জ্জন করিতে হইবে; পূর্ণতম অধ্যাত্ম মুক্তি এই পৃথিবীতেই লাভ করিতে হইবে, এই মানব জীবনেই উপভোগ করিতে হইবে, প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।† তাহার পর গীতা বলিতেছে, "যিনি আভ্যন্তরীণ সুখ, আভ্যন্তরীণ আরাম এবং আভ্যন্তরীণ জ্যোতি লাভ করিয়াছেন সেই যোগী ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মে

* বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ৫।২১

† শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ৫।২৩

আত্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।*" এখানে নির্ব্বাণ শব্দের অতি স্পষ্ট অর্থ হইতেছে উচ্চতর আধ্যাত্মিক, আভ্যন্তরীণ সত্তায় অহংয়ের নির্ব্বাণ, সে সত্তা চিরদিন দেশ ও কালের অতীত, কার্য্য কারণ শৃঙ্খল এবং ক্ষর জগতের পরিবর্ত্তনসকলের দ্বারা বদ্ধ নহে, তাহা আত্মানন্দ, আত্মজ্যোতি, এবং শাশ্বত শান্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। যোগী আর "অহং" থাকেন না, মন ও শরীরের দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ব্যক্তি থাকেন না; তিনি হন ব্রহ্ম; যে শাশ্বত আত্মা তাঁহার প্রাকৃত সত্তায় অনুস্যূত রহিয়াছে তাহার অক্ষর ভাগবত স্বরূপের সহিত তিনি চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হন।

কিন্তু ইহা কি সকল বিশ্ব-চৈতন্য হইতে দূরে সমাধির কোন গভীর নিদ্রায় প্রবেশ করা, অথবা ইহা কি প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্যাবলীর সম্পূর্ণভাবে এবং চিরকালের জন্য অতীত কোন কৈবল্যাত্মক সত্তায় প্রাকৃত সত্তা ও ব্যষ্টিগত আত্মার লয় বা মোক্ষ লাভের উদ্‌যোগ? নির্ব্বাণে প্রবেশ করিতে হইলে কি বিশ্বচৈতন্য হইতে এইরূপে সরিয়া যাওয়া আবশ্যক, না, পূর্ব্বাপর বাক্য হইতে যাহা বুঝা যায়, নির্ব্বাণ বিশ্ব-চৈতন্যের সহিত একই সঙ্গে থাকিতে পারে, এমন কি একভাবে ইহা নির্ব্বাণেরই অন্তর্গত? শেষেরটিই যথার্থ বলিয়া মনে হয় কারণ গীতা পরের শ্লোকেই বলিতেছে, "সেই ঋষিগণই ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন যাঁহাদের মধ্যে পাপের দাগ মুছিয়া গিয়াছে, সংশয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে,

* যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি। ৫।২৪

যাঁহারা আত্মজয়ী এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধনে ব্রতী।"* এই অবস্থা লাভ করাই নির্ব্বাণ লাভ,—এইরূপ অর্থ এখানে করা যাইতে পারে। কিন্তু পরের শ্লোকটি খুবই স্পষ্ট এবং সেখানে সন্দেহের স্থান নাই, "যে যতি-গণ† কাম ও ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, আত্মজয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মনির্ব্বাণ তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত, তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাঁহারা ইতিমধ্যেই ইহার মধ্যে বাস করিতেছেন, কারণ তাঁহারা আত্মার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।"‡ অর্থাৎ আত্মাকে জানা এবং আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই নির্ব্বাণে অবস্থান। ইহা যে নির্ব্বাণ তত্ত্বের উদার প্রসারণ তাহা সুস্পষ্ট। রিপুগণের সর্ব্ববিধ কলুষ হইতে মুক্তি, এই মুক্তির ভিত্তিস্বরূপ সমতা ও আত্মজয়, সর্ব্বভূতেষু, সর্ব্বভূতের প্রতিই সমভাব এবং সকলের জন্য কল্যাণকর প্রেম, যে সংশয় ও মোহ আমাদিগকে সর্ব্ব ঐক্যসাধক ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে তাহার চরম নিরসন এবং আমাদের মধ্যে এবং সকলের মধ্যে যে এক অদ্বিতীয় আত্মা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান—এইসব হইতেছে নির্ব্বাণের পক্ষে প্রয়োজনীয়, এইসবকে লইয়াই নির্ব্বাণ এবং ইহারাই নির্ব্বাণের অধ্যাত্ম সত্তা, গীতার এই শ্লোকগুলি হইতে ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

---

* লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৫।২৫

† যাঁহারা যোগ ও তপস্যার দ্বারা আত্ম-জয়ের সাধনা করেন তাঁহাদিগকেই "যতী" বলা যায়।

‡ কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ৫।২৬

অতএব নির্ব্বাণ স্পষ্টতঃই বিশ্বচৈতন্য এবং সংসারের কর্ম্মের সহিত সুসঙ্গত। কারণ যে সকল ঋষি ইহা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ক্ষরজগতে প্রকট ভগবান সম্বন্ধে সচেতন এবং কর্ম্মের ভিতর দিয়া তাঁহার সহিত নিবিড়ভাবে যোগযুক্ত ; তাঁহারা সর্ব্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত। তাঁহারা ক্ষর পুরুষের অনুভূতিসকলকে ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা সে সবকে দিব্যভাবাপন্ন করিয়াছেন, কারণ গীতা বলিয়াছে, ক্ষরঃ সর্ব্বভূতানি, ক্ষরই সর্ব্বভূত, এবং ব্যাপকভাবে সকলের হিতসাধন হইতেছে প্রকৃতির ক্ষরলীলার মধ্যে দিব্য কর্ম্ম। ব্রহ্মে বাস করার সহিত জগতে এইরূপ কর্ম্ম করার কোনই অসামঞ্জস্য নাই, বরং এইরূপ কর্ম্ম ব্রহ্মে বাসের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় এবং উহার বাহ্যিক পরিণতি, কারণ যে ব্রহ্মে আমরা নির্ব্বাণ লাভ করি, যে অধ্যাত্ম চৈতন্যে আমরা ভেদাত্মক অহং চৈতন্যের লয় সাধন করি, তাহা যে শুধু আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে তাহা নহে পরন্তু তাহা এই সর্ব্বভূতের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহা শুধু এই সব বিশ্বব্যাপারের উর্দ্ধে ও দূরে নাই পরন্তু এইসবের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে, ইহাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছে, ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকটিত হইতেছে। অতএব ব্রহ্মে নির্ব্বাণ বলিতে বুঝিতে হইবে, যে সীমাবদ্ধ ভেদাত্মক চৈতন্য ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন মায়ার দ্বারা সৃষ্টির বাহিরের দিকে প্রকটিত হইয়াছে, যাহা মিথ্যা ও ভেদের সৃষ্টি করিতেছে, তাহারই বিনাশ ও নির্ব্বাণ, এবং নির্ব্বাণে প্রবেশ হইতেছে এই অপর সত্য ঐক্যসাধক চৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ যাহা হইতেছে সৃষ্টির অন্তঃস্থল এবং ইহার আধার,—ইহারই মধ্যে সৃষ্টি সমগ্রভাবে বিধৃত, ইহাই হইতেছে সৃষ্টির সমগ্র মূল ও শাশ্বত ও চরম সত্য। যখন আমরা নির্ব্বাণ লাভ করি,

১৫

নির্ব্বাণের মধ্যে প্রবেশ করি, তখন ইহা কেবল আমাদের ভিতরেই থাকে না, পরন্তু চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান থাকে, অভিতো বর্ত্ততে, কারণ এই ব্রহ্মচৈতন্য যে কেবল আমাদের অন্তরেই গুপ্তভাবে রহিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু এই ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যেই আমরা বাস করিতেছি। আমরা ভিতরে যে আত্মা ইহা তাহাই, আমাদের ব্যষ্টিগত সত্তার পরমাত্মা ; আবার আমরা বাহিরে যে আত্মা ইহা তাহাও, বিশ্বের পরম আত্মা, সর্ব্বভূতের আত্মা। সেই আত্মার মধ্যে বাস করিয়া আমরা সকলের মধ্যেই বাস করি, তখন আর কেবল আমাদের অহংমূলক সত্তায় বাস করি না ; সেই আত্মার সহিত একত্ব লাভ করায় বিশ্বের সকল বস্তুর সহিত অবিচল ঐক্যবোধ আমাদের সত্তার প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে, আমাদের সক্রিয় চৈতন্যের মূল প্রতিষ্ঠা এবং আমাদের সকল কর্ম্মের মূল প্রেরণা হয়।

কিন্তু আবার ঠিক ইহার পরেই আমরা দুইটি শ্লোক পাই, যাহারা এই সিদ্ধান্তের বিপরীত বলিয়াই মনে হইতে পারে। "সমস্ত বাহ্য স্পর্শ বহিষ্কৃত করিয়া এবং দৃষ্টিকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে ন্যস্ত রাখিয়া এবং নাসিকার অভ্যন্তরে সঞ্চরণকারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান করিয়া, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া মোক্ষপরায়ণ মুনি ইচ্ছা, ক্রোধ ও ভয়শূন্য হইয়া নিত্যমুক্ত হন *।" এখানে এই যোগের প্রণালীতে

* স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ৫।২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ৫।২৮

এমন একটা জিনিষ আনা হইয়াছে যাহা কর্ম্মযোগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়, এমন কি বিচার ও ধ্যানের দ্বারা জ্ঞান লাভের যে খাঁটি জ্ঞান যোগ তাহা হইতেও ইহা বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়; ইহার সব বিশেষ লক্ষণগুলিই হইতেছে রাজযোগের, ইহাতে রাজযোগেরই দেহমন সম্বন্ধীয় তপস্যা গৃহীত হইয়াছে। এখানে মনের সমস্ত বৃত্তিকে জয় করিবার কথা রহিয়াছে, চিত্তবৃত্তিনিরোধ; শ্বাসপ্রশ্বাসের সংযমও রহিয়াছে, প্রাণায়াম; ইন্দ্রিয় ও দৃষ্টিকে ভিতর দিকে টানিয়া লইবার কথাও রহিয়াছে, প্রত্যাহার। এই সবই হইতেছে আভ্যন্তরীণ সমাধিতে মগ্ন হইবার প্রণালী; ইহাদের সকলেরই লক্ষ্য হইতেছে মোক্ষ, আর মোক্ষ বলিতে সাধারণ ভাষায় কেবল ভেদাত্মক অহং চৈতন্যেরই বর্জ্জন বুঝায় না, পরন্তু সমগ্র সক্রিয় চৈতন্যেরই বর্জ্জন বুঝায়, উচ্চতম ব্রহ্মে আমাদের সত্তার লয় বুঝায়। তাহা হইলে কি আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, গীতা ঐ অর্থে লয়ের দ্বারা মোক্ষলাভের শেষ প্রক্রিয়ারূপেই এই প্রণালীটি দিয়াছে, না, বহির্মুখী মনকে জয় করিবার একটা বিশেষ উপায়-রূপে, একটি শক্তিশালী সহায়রূপেই এই প্রণালীটি দিয়াছে? এইটিই কি চরম, চূড়ান্ত, শেষ কথা? ইহা একটা বিশেষ উপায়, একটা সহায় বটে আবার চরম গতিরও অন্ততঃ একটা দ্বার বটে, সে গতি লয় নহে, পরন্তু বিশ্বাতীত সত্তার মধ্যে উন্নয়ন; পরে আমরা দেখিব যে, এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত। কারণ এখানে এই অংশেও এইটিই শেষ কথা নহে; শেষ কথাটি, চরম চূড়ান্ত কথাটি আসিয়াছে পরের শ্লোকে, সেইটিই এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোক। "মানুষ যখন আমাকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা বলিয়া জানিতে পারে, ভুবনসকলের মহান

ঈশ্বর বলিয়া, জীবসকলের সুহৃদ বলিয়া জানিতে পারে, তখন সে শান্তি লাভ করে" *। এখানে আবার কর্ম্মযোগেরই শক্তি আসিয়াছে; এখানে জোর দিয়াই বলা হইয়াছে যে, নির্ব্বাণের শান্তিলাভ করিতে হইলে সক্রিয় ব্রহ্মের জ্ঞান, বিশ্বপুরুষের জ্ঞান আবশ্যক।

এখানে আবার আমরা গীতার সেই মহান্ তত্ত্ব, পুরুষোত্তম তত্ত্ব পাইতেছি,—যদিও এই "পুরুষোত্তম" নামটি একেবারে শেষের দিকেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ নাই, তথাপি কৃষ্ণ "অহং" (আমি) "মাং" (আমাকে) বলিতে সর্ব্বদা পুরুষোত্তমকেই বুঝিয়াছেন, যে-ভগবান আমাদের কালাতীত অক্ষর সত্তায় এক আত্মারূপে রহিয়াছেন, আবার যিনি জগতের মধ্যে, সর্ব্বভূতের মধ্যে, সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যেও রহিয়াছেন, নিশ্চল নীরবতা ও শান্তির অধীশ্বর, আবার শক্তি ও কর্ম্মেরও অধীশ্বর, যিনি এখানে এই মহাযুদ্ধে সারথিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত, পরমাত্মা, সর্ব্বমিদং, সকল ব্যষ্টিগত জীবেরই প্রভু,—শ্রীকৃষ্ণ "অহং" বা "মাং" বলিতে সর্ব্বদা সেই পুরুষোত্তম ভগবানকেই বুঝিয়াছেন। তিনি সকল যজ্ঞের, সকল তপস্যার ভোক্তা, অতএব মুক্তিকামী মানবকে যজ্ঞরূপে, তপস্যারূপে কর্ম্ম করিতে হইবে; তিনি ভুবনসকলের অধীশ্বর, সর্ব্বলোকমহেশ্বর, প্রকৃতিতে এবং এই সর্ব্বভূতে অভিব্যক্ত, অতএব মুক্তিলাভের পরও মুক্ত মানব কর্ম্ম করিবেন জনগণকে

* ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি। ৫।২৯

যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার জন্য, লোকসংগ্রহ; তিনি সর্ব্বজীবের সুহৃদ, অতএব যে ঋষি নিজের মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে (অভিতঃ) নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন তিনি তখনও এবং সর্ব্বদা সকল জীবের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবেন,—যেমন মহাযান বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ ছিল বিশ্বজনের প্রতি করুণার বশে কর্ম্ম। যখন তিনি তাঁহার কালাতীত ও অক্ষর সত্তায় ভগবানের সহিত একত্বলাভ করিয়াছেন তখনও তিনি প্রকৃতির লীলায় সম্বন্ধসকলকে গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে মানুষের প্রতি দিব্য প্রেম এবং ভগবানের প্রতি প্রেম ও ভক্তি সম্ভব হয়।

ইহাই যে গীতার শিক্ষার মর্ম্ম তাহা আরও স্পষ্ট হয় যখন আমরা গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের অর্থ তলাইয়া দেখি; এই অধ্যায়টি হইতেছে পঞ্চম অধ্যায়ের এই শেষ কয়েকটি শ্লোকেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও পূর্ণ পরিণতি,—ইহা হইতেই বুঝা যায়, গীতা এই শ্লোকগুলিকে কত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছে। অতএব আমরা এখানে যত সংক্ষেপে সম্ভব সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ের সার মর্ম্মটি অনুধাবন করিব। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রকৃত সন্ন্যাস বাহিরের ত্যাগ নহে, ভিতরের ত্যাগ—পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট এই কথাটি প্রথমেই বলিয়া গুরু ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ করিলেন। "যিনি ফলকে অবলম্বন না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী, যে-ব্যক্তি যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করেন না এবং কর্ম্ম করেন না তিনি নহেন। যাহাকে লোকে সন্ন্যাস বলে তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিও; কারণ মনের বাসনামূলক সঙ্কল্প সন্ন্যাস

(বা ত্যাগ) না করিলে কেহ যোগী হয় না"*। কর্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু কোন উদ্দেশ্যে, কোন ক্রম অনুসারে? প্রথমে যোগশৈল আরোহণের সময় কর্ম্ম করিতে হইবে, কারণ তখন কর্ম্মই কারণ। কিসের কারণ? আত্ম-সিদ্ধির, মুক্তির, ব্রহ্মে নির্ব্বাণের কারণ; কারণ ভিতরে ত্যাগের একনিষ্ঠ সাধনা করিতে করিতে কর্ম্ম করিলে এই সিদ্ধি, এই মুক্তি, বাসনাত্মক মন, যোগ-আত্মা এবং নীচের প্রকৃতির উপর এই বিজয় সহজেই সম্পাদিত হয়।

কিন্তু যখন কেহ শিখরে উঠিয়াছেন? তখন আর কর্ম্ম কারণ নহে; কর্ম্মের দ্বারা আত্মজয় এবং আত্মোপলব্ধির যে-শান্তি লাভ করা যায় তখন তাহাই হয় কারণ। আবার কিসের কারণ? আত্মাতে, ব্রহ্মচৈতন্যে অবিচল প্রতিষ্ঠার কারণ, যে পূর্ণ সমতায় মুক্ত মানবের দিব্য কর্ম্মসকল সম্পাদিত হয় তাহার কারণ। "যখন কেহ ইন্দ্রিয় বিষয়ে অথবা কর্ম্মে আসক্ত হয় না, এবং মন হইতে সকল বাসনাত্মক সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছে, তখনই বলা যায় যে সে যোগশিখরে আরোহণ করিয়াছে"†। এই ভাব

* অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥৬।১
যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥৬।২
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৬।৩

† যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৬।৪
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৬।৭

লইয়াই মুক্ত মানব কর্ম্ম করেন তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি; তিনি কর্ম্ম করেন বাসনা ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, অহংমূলক ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও যে মানসিক লিপ্সা বাসনার জনক তাহা পরিত্যাগ করিয়া। তিনি তাঁহার নিম্নতন আত্মাকে জয় করিয়াছেন, তিনি যে পূর্ণতম শান্তি লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উচ্চতম আত্মা তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে; সেই উচ্চতম আত্মা সর্ব্বদা নিজের সত্তায় সমাহিত, সমাধিমগ্ন, যখন বাহ্য জগৎ হইতে চেতনাকে ভিতরের দিকে টানিয়া লওয়া হয় কেবল তখনই নহে পরন্তু সর্ব্বদা, মনের জাগ্রত অবস্থাতেও, যখন বাসনা ও অশান্তির কারণ বিদ্যমান থাকে, সুখ দুঃখ, মান অপমান, সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ব উপস্থিত থাকে, শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ। এই উচ্চতর আত্মা হইতেছে অক্ষর, কূটস্থ, তাহা প্রাকৃত সত্তার সকল পরিবর্ত্তন ও বিক্ষোভের উর্দ্ধে অবস্থিত; আর ইহার সহিত যোগীকে তখনই যুক্ত বলা যায় যখন তিনি ইহারই মত, কূটস্থ হন, যখন তিনি সকল বাহ্য দৃশ্য ও পরিবর্ত্তনের উর্দ্ধে উঠেন, যখন তিনি আত্মজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হন, যখন তিনি সকল বস্তু, সকল ঘটনা এবং সকল ব্যক্তির প্রতি সমভাবাপন্ন হন।*

তবে যাহাই হউক এই যোগ লাভ করা সহজ নহে, বস্তুতঃ অর্জ্জুন পরে স্পষ্টতঃই এই ইঙ্গিত করিয়াছেন†, কারণ চঞ্চল মন যে-কোন সময়ে

* জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।৬।৮

† যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্।৬।৩৩

বাহ্য বিষয়ের আক্রমণে এই সকল উচ্চভাব হইতে স্খলিত হইতে পারে এবং শোক ও চিত্তবিক্ষোভ ও অসমতার দারুণ কবলে পুনরায় পতিত হইতে পারে। মনে হয় এইজন্যই গীতা নিজের জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধারণ পদ্ধতি ছাড়াও রাজযোগের ধ্যানের এক বিশেষ পদ্ধতি দিতে অগ্রসর হইয়াছে, মন এবং ইহার সমুদয় ক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে এই পদ্ধতি খুবই শক্তিশালী। এই পদ্ধতিতে যোগীকে সদা সর্ব্বদা আত্মার সহিত যোগ অভ্যাস করিতে বলা হইয়াছে যেন ইহাই তাহার সাধারণ চেতনা হইয়া পড়ে। তাঁহাকে নির্জ্জন স্থানে একাকী উপবেশন করিতে হইবে, মন হইতে সমস্ত বাসনা ও রিপুর চিন্তা দূর করিতে হইবে। সমগ্র সত্তা ও চিত্তকে আত্ম-বশীভূত করিতে হইবে। "তিনি নির্ম্মল স্থানে নিজের স্থির আসন পাতিবেন, উহা যেন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়, প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগচর্ম্ম, তাহার উপর বস্ত্র আচ্ছাদন করিবেন ; তদুপরি উপবেশনপূর্ব্বক মনকে একাগ্র করিয়া এবং মানসিক চৈতন্য ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবেন*। রাজযোগের পদ্ধতি অনুসারে

---

* শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্। ৬।১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে। ৬।১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্। ৬।১৩

শরীরকে সোজা ও স্থিরভাবে রাখিতে হইবে; দৃষ্টিকে টানিয়া লইয়া ভ্রূমধ্যে স্থাপন করিতে হইবে; দিশশ্চানবলোকয়ন্। মনকে প্রশান্ত ও ভয়মুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে হইবে; সমগ্র চিত্তকে সংযত করিয়া ভগবানের দিকে ফিরাইতে হইবে, তাঁহাতে যুক্ত করিতে হইবে যেন চৈতন্যের নিম্নতন ক্রিয়া উর্দ্ধতন শান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়। কারণ এই সাধনার দ্বারা নির্ব্বাণের শান্তিলাভই লক্ষ্য। "এইরূপে মন সংযমের দ্বারা যোগ অভ্যাস করিয়া যোগী নির্ব্বাণের পরম শান্তি লাভ করেন, আমার মধ্যেই সেই পরম শান্তির ভিত্তি, শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাম্"* ।

নির্ব্বাণের এই শান্তি তখনই লাভ করা যায় যখন সমগ্র মানস চৈতন্য সম্পূর্ণভাবে সংযত হয় এবং বাসনা হইতে মুক্ত হয় এবং আত্মাতে স্থির হইয়া নিবিষ্ট থাকে, তখন বায়ুশূন্য স্থানে নিশ্চল দীপশিখার ন্যায় মন তাহার অস্থির ক্রিয়া হইতে বিরত হয়, তাহার বহির্ম্মুখী গতি বন্ধ হয়, এবং মনের এই নিশ্চল নীরবতায় অন্তরের মধ্যে আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়, মন আত্মা সম্বন্ধে যে মিথ্যা ও আংশিক পরিচয় দেয় এবং অহংয়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে যেমন দেখা যায় তেমন দেখা নহে, পরন্তু আত্মার আত্মোপলব্ধিতেই আত্মা প্রকাশিত হয়,

---

* প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ। ৬।১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি। ৬।১৫

স্বপ্রকাশ *। তখন জীব সন্তুষ্ট হয় এবং তাহার নিজস্ব প্রকৃত এবং নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করে,—এই আনন্দ ইন্দ্রিয় ও মনের প্রাপ্য অশান্ত সুখ নহে পরন্তু ইহা আভ্যন্তরীণ প্রশান্ত সৌখ্য, ইহার মধ্যে সে মনের চাঞ্চল্য হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ, আর তাহার সত্তার অধ্যাত্ম সত্য হইতে স্খলিত হইবার কোনই আশঙ্কা থাকে না। মানসিক দুঃখের তীব্রতম আক্রমণও আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না; কারণ আমাদের মানসিক দুঃখ আইসে বাহির হইতে, তাহা বাহ্য বস্তুর স্পর্শেরই প্রতিক্রিয়া, আর আত্মার সুখ হইতেছে আভ্যন্তরীণ ও স্বপ্রতিষ্ঠ, বাহ্য বস্তুর স্পর্শে মনে যে অস্থির প্রতিক্রিয়াসকলের উদ্ভব হয় যাঁহারা সে সবের বশ্যতা আর স্বীকার করেন না কেবল তাঁহারাই এই সুখের অধিকারী হইতে পারেন। ইহা হইতেছে দুঃখের সহিত সংযোগ দূর

---

* যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা। ৬।১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ। ৬।১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি। ৬।২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ। ৬।২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে। ৬।২২
তং বিদ্যাদ্‌ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা। ৬।২৩

করিয়া দেওয়া, মনের সহিত শোকের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া, দুঃখসংযোগবিয়োগম্। সুদৃঢ়ভাবে এই অবিচ্ছেদ্য আনন্দ লাভই যোগ, ইহাই দিব্য মিলন ; ইহা সকল লাভের পরম লাভ, এই সম্পদের কাছে আর সবই তুচ্ছ। অতএব এই যোগ দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে, অনির্ব্বিণ্ণচেতসা, যতদিন না মুক্তিলাভ করা যায়, যতদিন না নির্ব্বাণের আনন্দ চিরদিনের জন্য আয়ত্ত করা যায় ততদিন দুষ্করতা বা অসাফল্যের দ্বারা এতটুকু নিরুৎসাহ হওয়া চলিবে না।

এখানে অনুভবাত্মক মনকে স্থির ও শান্ত করার উপরেই জোর বেশী দেওয়া হইয়াছে, এই মনের মধ্যেই চলে বাসনা ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়ের স্পর্শ গ্রহণ করে এবং আমাদের সাধারণ সুখ দুঃখ আদি ভাবের প্রতিক্রিয়া দ্বারা তাহাতে সাড়া দেয় ; কিন্তু স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তার নিশ্চল নীরবতায় মানসিক চিন্তাকেও স্থির ও শান্ত করিতে হইবে *। প্রথমতঃ, সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত সমস্ত বাসনাকে সম্পূর্ণভাবেই বর্জ্জন করিতে হইবে যেন কিছুমাত্র বাদ বা অবশিষ্ট না থাকে, এবং

---

* সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ। ৬।২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। ৬।২৫
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ। ৬।২৬
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ৬।২৭

ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা সংযত করিয়া ধরিতে হইবে যেন তাহারা তাহাদের বিশৃঙ্খল ও চঞ্চল অভ্যাসের বশে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে না পারে ; কিন্তু তাহার পর মনকেও বুদ্ধির দ্বারা ধরিয়া ভিতরের দিকে টানিয়া লইতে হইবে। দৃঢ়প্রতিষ্ঠ বুদ্ধির দ্বারা মনের ক্রিয়া বন্ধ করিতে হইবে, এবং মনকে ঊর্দ্ধতন আত্মায় নিবিষ্ট করিয়া সাধক কোন কিছু চিন্তা করিবেন না। চঞ্চল ও অস্থির মন যখনই যে-দিকে ছুটিবে তখনই সেই দিক হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে। মন যখন সম্পূর্ণভাবে শান্ত হইবে, তখনই যোগী ব্রহ্মভূত আত্মার উচ্চতম, নিষ্কলঙ্ক, বিক্ষোভহীন সুখলাভ করিবেন। "এই ভাবে রিপুবিক্ষোভের গ্লানি হইতে মুক্ত হইয়া এবং সর্ব্বদা নিজকে যোগযুক্ত রাখিয়া যোগী সহজে এবং সুখে অনন্ত আনন্দময় ব্রহ্মস্পর্শ উপভোগ করেন।"*

অথচ ইহার ফলে জীবিতাবস্থাতে এমন নির্ব্বাণ হয় না যাহাতে সংসারের সমস্ত কাজ, সাংসারিক জীবের সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব হয়। প্রথমে মনে হইতে পারে যে এইরূপ ফলই হইবে। যখন সমস্ত বাসনা ও রিপুবিক্ষোভ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যখন মন আর নিজেকে চিন্তার মধ্যে ছাড়িয়া দিতে পায় না, যখন নীরব নির্জ্জন যোগ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন আর কি কাজ থাকিতে পারে, বাহ্যস্পর্শময় অনিত্য সংসারের সহিত আর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? অবশ্য যোগী আরও কিছুকাল শরীর ধারণ করিয়া থাকেন

---

* যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ৬৷২৮

বটে, কিন্তু তখন তাঁহার পক্ষে পর্ব্বতগুহা, অরণ্য বা শৈলশিখরই যোগ্যতম স্থান বলিয়াই মনে হয়, কেবল এইরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই তিনি বাস করিতে পারেন এবং নিরন্তর সমাধিতে মগ্ন থাকাই তাঁহার একমাত্র আনন্দ ও কাজ হইতে পারে। কিন্তু প্রথমতঃ যখন এই নির্জ্জন যোগ অভ্যাস করা হয় তখন অন্য সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে গীতা উপদেশ দেয় নাই। গীতা বলিয়াছে, যাহারা নিদ্রা ও আহার ও খেলা ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাদের এ-যোগ হয় না আবার যাহারা দেহ ও প্রাণের এই সকল ব্যাপারে অত্যধিক মগ্ন তাহাদেরও এ-যোগ হয় না ; পরন্তু নিদ্রা ও জাগরণ, আহার, বিহার, কর্ম্ম প্রচেষ্টা সবই "যুক্ত" হওয়া আবশ্যক *। ইহার সাধারণতঃ এই অর্থ করা হয় যে, সমস্তই পরিমিত, নিয়ন্ত্রিত, যথাযথ মাত্রায় অনুষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য, এবং বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃত অর্থ হইতে পারে। কিন্তু অন্ততঃ যখন যোগ লব্ধ হইয়াছে তখন এই সমস্ত ব্যাপারকেই আর এক অর্থে "যুক্ত" হইতে হইবে, এবং সেই অর্থেই এই কথাটি গীতার অন্য সকল স্থানেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সকল অবস্থাতে, জাগরণে ও নিদ্রায়, আহারে ও বিহারে ও কর্ম্মে তখন যোগী ভগবানের সহিত যুক্ত থাকিবেন, এবং যোগী সমস্ত করিবেন এই জ্ঞানে যে, ভগবানই আত্মা, ভগবানই সব এবং তাঁহার নিজের জীবন, নিজের কর্ম্ম ভগবানের মধ্যেই রহিয়াছে, ভগবানই

---

* নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ৬।১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ৬।১৭

ধরিয়া রহিয়াছেন। বাসনা, অহং, ব্যক্তিগত সঙ্কল্প, মনের চিন্তা এই সব আমাদের কর্ম্মের প্ররোচক হয় কেবল আমাদের নিম্নতন প্রকৃতিতে; যখন অহং বিনষ্ট হয় এবং যোগী ব্রহ্ম হন, যখন তিনি এক সমুচ্চ ও বিশ্বময় চৈতন্যের মধ্যে বাস করেন, এমন কি তাহাই হন, তখন স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে কর্ম্ম আইসে সেখান হইতে, মানসিক চিন্তা অপেক্ষা উচ্চতর জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান আইসে সেখান হইতে, ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষা মহত্তর অন্য এক শক্তি সেখান হইতে আসিয়া যোগীর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দেয় এবং তাহার ফল আনিয়া দেয়; তখন ব্যক্তিগত কর্ম্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সমস্তই ব্রহ্মে সংন্যস্ত হইয়াছে, ভগবান কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, ময়ি সংন্যস্য কর্ম্মাণি।

ভেদাত্মক মানসিক অহংকে এবং চিন্তা ও অনুভূতি ও কর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার প্রেরণাসকলকে ব্রহ্ম চৈতন্যে নির্ব্বাণ করিয়া যে আত্মোপলব্ধি লাভ করা যায় তাহার স্বরূপ এবং যোগের * ফল বর্ণনা করিবার সময় গীতা বলিয়াছে যে, বিশ্বজ্ঞান (cosmic sense) এই ব্রহ্ম চৈতন্যের অন্তর্ভুক্ত, যদিও তাহা এক নবতর দৃষ্টিতে উন্নীত হয়। "যে মানবের আত্মা যোগযুক্ত, যিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখেন এবং আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতকে দেখেন, তিনি সকল জিনিষকেই সমদৃষ্টিতে দেখেন" †। তিনি যাহা কিছু দেখেন তাঁহার নিকট সবই আত্মা, সব তাঁহারই আত্মা, সবই ভগবান। কিন্তু তিনি যদি ক্ষরের পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে আদৌ

---

* যোগক্ষেমং বহাম্যহম্

† সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ৬।২৯

বাস করেন তাহা হইলে কি আশঙ্কা নাই যে, এই কঠিন যোগ সাধনার সমস্ত ফল তিনি হারাইয়া ফেলিবেন, আত্মাকে হারাইয়া পুনরায় মনের মধ্যে পতিত হইবেন, ভগবান তাঁহাকে হারাইবেন এবং সংসার তাহাকে পাইয়া বসিবে, তিনি ভগবানকে হারাইয়া তাঁহার স্থানে পুনরায় অহংকে এবং নিম্নতন প্রকৃতিকে পাইবেন? গীতা বলিয়াছে, না, এরূপ কোন আশঙ্কা নাই :—"যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমার মধ্যে সব কিছুকেই দেখেন, আমি তাঁহাকে হারাই না, তিনিও আমাকে হারান না" *। কারণ যদিও এই নির্ব্বাণের শান্তি অক্ষরের ভিতর দিয়াই লাভ করিতে হয় তথাপি ইহা পুরুষোত্তমের সত্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, মৎসংস্থাম্, আর এই সত্তা, ভগবান, ব্রহ্ম, জগতের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত এবং যদিও তাহা জগতের অতীত তথাপি সেই অতীত অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ নহে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, সকল বস্তুই তিনি (ভগবান, পুরুষোত্তম), বাসুদেবঃ সর্ব্বম্, এবং সম্পূর্ণভাবে এই দিব্যদৃষ্টিতেই বাস করিতে হইবে, কাজ করিতে হইবে; এইটিই হইতেছে যোগের পূর্ণতম সিদ্ধি।

কিন্তু কর্ম্ম করা কেন? নির্জ্জনে নিজের আসন পাতিয়া বসিয়া থাকিবে, ইচ্ছা হয় সেখান হইতে সংসারের দিকে চাহিয়া দেখিবে, সংসারকে ব্রহ্মের মধ্যে, ভগবানের মধ্যে দেখিবে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ যোগদান করিবে না, সেখানে বিচরণ করিবে না, বাস করিবে না, কর্ম্ম করিবে না, কেবল সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ সমাধির মধ্যেই বাস করিবে,

---

* যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৬।৩০

—এইটিই কি অধিকতর নিরাপদ নহে? এইটিই কি এই উচ্চতম অধ্যাত্ম অবস্থার নিয়ম নহে, বিধি নহে, ধর্ম্ম নহে? আবার বলি, না; মুক্ত যোগীর পক্ষে আর কোনও নিয়ম নাই, বিধি নাই, ধর্ম্ম নাই, শুধু ইহাই যে, তিনি ভগবানের মধ্যে বাস করিবেন, ভগবানকে ভালবাসিবেন এবং সর্ব্বভূতের সহিত এক হইবেন; তাঁহার মুক্তি চূড়ান্ত, তাহা সাপেক্ষ মুক্তি নহে, তাহা স্বপ্রতিষ্ঠ, আর কোন কর্ত্তব্যের বিধি, জীবনের ধর্ম্ম বা কোনরূপ গণ্ডীর উপর তাহা নির্ভর করে না। আর কোন যোগ প্রণালীতে তাঁহার প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি এখন সর্ব্বদাই যোগযুক্ত, নিত্যযুক্ত। "যে যোগী একত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে আমাকে ভালবাসেন, তিনি যেখানেই থাকুন আর যাহাই করুন, তিনি আমার মধ্যেই বাস করেন, কর্ম্ম করেন" *। তখন সংসারের প্রতি ভালবাসা অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রাণিত হয়, ইন্দ্রিয় অনুভূতি হইতে তাহা আত্ম-অনুভূতিতে পরিণত হয়, ভগবৎপ্রেমের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়, আর সেই প্রেমে কোন বিপদ নাই, কোন দোষ নাই। নীচের প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উঠিতে হইলে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ভয় অনেক সময় দরকার হইতে পারে, কারণ বস্তুতঃ ইহা হইতেছে সংসারের মধ্যে প্রতিফলিত আমাদের অহংয়েরই প্রতি বিতৃষ্ণা ও ভয়। কিন্তু ভগবানকে সংসারের মধ্যে দেখিতে পাইলে আর কিছুকেই ভয় থাকে না, তখন সকলকেই ভগবানের সত্তার মধ্যে আলিঙ্গন করা যায়; সকলকে ভগবান বলিয়া দেখিলে আর কোন কিছুর প্রতি দ্বেষ বা ঘৃণা

---

* সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৬।৩১

থাকে না, তখন সংসারের মধ্যে ভগবানকে এবং ভগবানের মধ্যে সংসারকে ভালবাসা যায়।

কিন্তু অন্ততঃপক্ষে নীচের প্রকৃতির জিনিষগুলিকে ত বর্জ্জন করিতে হইবে, ভয় করিতে হইবে ? এই সকলকে ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য যোগীকে যে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে ! না, তাহাও নহে, আত্ম-দর্শনের সমতায় সমস্তকেই আলিঙ্গন করা হয়। "হে অর্জ্জুন, যে-ব্যক্তি আত্মার উপমায় সকল জিনিষকেই সমানভাবে দেখেন, তাহা সুখই হউক আর দুঃখই হউক, তাঁহাকেই আমি শ্রেষ্ঠতম যোগী মনে করি।"* আর ইহার দ্বারা মোটেই বুঝায় না যে, তিনি নিজে দুঃখলেশশূন্য অধ্যাত্ম আনন্দ হইতে চ্যুত হইবেন এবং পরের দুঃখের মধ্য দিয়াই পুনরায় সংসারের দুঃখ ভোগ করিবেন, পরন্তু তিনি যে-সকল দ্বন্দ্ব বর্জ্জন করিয়াছেন, জয় করিয়াছেন সেই সকল দ্বন্দ্বের খেলা অপরের মধ্যে চলিতে দেখিয়া তখনও তিনি সকলকে নিজের মত দেখিবেন, সকলের মধ্যে নিজের আত্মাকে দেখিবেন, সকলের মধ্যে ভগবানকে দেখিবেন, এবং এই সকল জিনিষের বাহ্য দৃশ্যে বিচলিত বা বিভ্রান্ত না হইয়া তাহাদের প্রেরণায় সাহায্য করিতে, নিরাময় করিতে, সর্ব্বভূতের কল্যাণ সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করিতে, মানব সকলকে অধ্যাত্ম আনন্দের দিকে লইয়া যাইতে, ভগবদ্ অভিমুখে সংসারের প্রগতির জন্য কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইবেন, এই সংসারে যতদিন তাঁহাকে জীবন ধারণ করিতে হয় এইভাবেই তিনি দিব্য জীবন যাপন করিবেন। যে ভগবদ্ ভক্ত ইহা করিতে পারেন, এইভাবে সকল জিনিষকেই

---

* আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৬।৩২

ভগবানের মধ্যে আলিঙ্গন করিতে পারেন, শান্ত দৃষ্টিতে নীচের প্রকৃতিকে, ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার খেলাকে অবলোকন করিতে পারেন, গুণসকলের মধ্যে এবং তাহাদের উপরে ক্রিয়া করিতে পারেন অথচ অধ্যাত্ম একত্বের উচ্চভূমি ও শক্তি হইতে বিচ্যুত বা বিচলিত হন না, যিনি ভগবদ্ দর্শনের উদারতায় মুক্ত ও স্বাধীন, ভাগবত প্রকৃতির শক্তিতে মধুর, মহান ও জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠতম যোগী বলা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে সংসারকে জয় করিয়াছেন, জিতঃ সর্গঃ।

গীতা সর্ব্বত্র যেমন তেমনি এখানেও ভক্তিকেই যোগের পরাকাষ্ঠা বলিয়াছে, সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ, ইহাকেই সমগ্র গীতা শিক্ষার শেষ ও সারকথা বলা যাইতে পারে,—যে-ব্যক্তি সর্ব্বভূতে ভগবানকে ভালবাসেন এবং যাঁহার আত্মা ভাগবত একত্বে প্রতিষ্ঠিত, তিনি যেখানেই থাকুন এবং যাহাই করুন তিনি ভগবানের মধ্যেই বাস করেন, কর্ম্ম করেন। এই কথাটা আরও জোরের সহিত বলিবার জন্য দিব্য গুরু মাঝে অর্জ্জুনের একটা প্রশ্নের (মানুষের চঞ্চল মনের পক্ষে এরূপ কঠিন যোগ আদৌ কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে এই সংশয়ের) জবাব দিয়া পুনরায় এই কথাতেই ফিরিয়া আসিলেন এবং এইটিই হইল তাঁহার চূড়ান্ত উক্তি। "যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা বড়, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা বড়, কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও বড়; অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।"* যোগী কর্ম্ম ও জ্ঞান ও তপস্যা বা অন্য

---

* তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥৬।৪৬

যে-কোন উপায়ে কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান চান না, আধ্যাত্মিক শক্তির জন্যই শক্তি চান না, অন্য কোন কিছুই চান না, কেবল ভগবানের সহিত যোগ আকাঙ্ক্ষা করেন, লাভ করেন ; কারণ উঁহার মধ্যেই আর সব কিছুই রহিয়াছে, নিজেদের উর্দ্ধে উন্নীত হইয়া দিব্যতম সার্থকতা লাভ করিতেছে। কিন্তু আবার যোগীদের মধ্যেও যিনি ভক্ত তিনিই শ্রেষ্ঠতম। "যোগিগণের মধ্যে যে-ব্যক্তি তাঁহার সমগ্র অন্তরাত্মা আমাতে সমর্পণ করিয়া আমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন, আমার মতে তিনিই আমার সহিত যোগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত।"* এইটিই গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের শেষ কথা এবং ইহার মধ্যেই গীতার অবশিষ্ট অংশের বীজ নিহিত রহিয়াছে, যাহা এখনও বলা হয় নাই এবং যাহা কোথাও পূর্ণভাবে বলা হয় নাই তাহার বীজ এইখানেই রহিয়াছে ; কারণ তাহা সকল সময়েই কতকটা গূঢ় রহস্যের মতই রহিয়া গিয়াছে, তাহা শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্ম তত্ত্ব এবং দিব্য রহস্য।

---

* যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ।৬।৪৭

কর্ম্মযোগের সারতত্ত্ব

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়কে গীতাশিক্ষার এক রকম স্থূল কাঠামো বলা যাইতে পারে ; এখানে প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি মোটামুটি দেখান হইয়াছে, এবং গীতার বাকী দ্বাদশটি অধ্যায়ে যে-সকল বিষয় বিশদভাবে পরিস্ফুট করা হইবে সেগুলি এখানে অসম্পূর্ণভাবে, ইঙ্গিতমাত্র হইয়া রহিয়াছে, অথচ এই বিষয়গুলির নিজস্ব গুরুত্ব খুবই বেশী, সেইজন্যই অবশিষ্ট দুইটি ভাগে সেইগুলিকে বিশদতরভাবে আলোচনা করিবার জন্য রাখা হইয়াছে। গীতা যদি একটি লিখিত মহান শাস্ত্র গ্রন্থ না হইত এবং সেইজন্য ইহার শিক্ষা শেষ করিতেই না হইত, এই শিক্ষা যদি কোন জীবিত গুরু তাঁহার শিষ্যকে দিতেন এবং শিষ্য যেমন গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় সেই অনুসারে যথাসময়ে অন্যান্য সত্য বিবৃত করিতেন, তাহা হইলে গুরু ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষেই থামিয়া বলিতে পারিতেন,—"প্রথমে এইটুকুই সাধনা কর, তোমার করিবার মত যথেষ্ট জিনিষ ইহার মধ্যেই রহিয়াছে, এখানেই তুমি যতদূর সম্ভব প্রশস্ততম ভিত্তি পাইবে ; সমস্যা ও সংশয়-সকল যেমন উঠিবে, আপনা হইতেই সে-সকলের সমাধান হইয়া যাইবে অথবা আমিই তোমার জন্য সে-সকলের সমাধান করিয়া দিব। উপস্থিত আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই তোমার জীবনে সিদ্ধ করিয়া তোল ; ভিতরে এই ভাব রাখিয়া কর্ম্ম কর।" সত্য বটে, এখানে এমন অনেক জিনিষই আছে, পরবর্ত্তী অংশে যাহা বলা হইবে তাহার আলোকে

সেগুলিকে না দেখিলে সেগুলির ঠিক অর্থ বুঝা সম্ভব নহে। উপস্থিত সমস্যার মীমাংসার জন্য এবং ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা নিরসনের জন্য আমাকেও পরের অনেক কথা এখনই বলিতে হইয়াছে, যেমন পুরুষোত্তমের তত্ত্ব, কারণ এই তত্ত্বের অবতারণা না করিলে আত্মা, কর্ম্ম এবং কর্ম্মের অধীশ্বর সম্বন্ধে কতকগুলি সংশয়ের মীমাংসা করা যাইত না ; মানব শিষ্যের মন এখনও ধারণা করিতে পারিবে না এমন মহান তত্ত্বসকলের অবতারণা করিলে পাছে তাহার প্রথম সাধনার পথে দৃঢ় নিষ্ঠা বিচলিত হয় সেইজন্য গীতা ইচ্ছা করিয়াই এই সংশয়গুলি সমাধান করিবার কোন চেষ্টা এখানে করে নাই।

গুরু এইখানেই শিক্ষা স্থগিত রাখিলে অর্জ্জুনও আপত্তি তুলিয়া বলিতে পারিতেন,—"আপনি বাসনা ও আসক্তির বিনাশ সম্বন্ধে, সমতা সম্বন্ধে, ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা এবং মনকে নিশ্চল করা সম্বন্ধে, কামক্রোধাদি হইতে মুক্ত এবং নির্ব্যক্তিক কর্ম্ম সম্বন্ধে, যজ্ঞার্থে কর্ম্ম সম্বন্ধে, বাহ্যিক ত্যাগ অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ ত্যাগের বাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন, এবং এইগুলি কার্য্যতঃ সাধন করা আমার নিকট যত কঠিন বলিয়াই বোধ হউক, এইগুলি আমি বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু আবার আপনি কর্ম্মের মধ্যে থাকিবার সময়েই গুণসকলের উর্দ্ধে উঠিবার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই সকল গুণ কিভাবে কাজ করে তাহা আপনি আমাকে বলেন নাই, আর যতক্ষণ না আমি তাহা জানিতেছি ততক্ষণ আমার পক্ষে তাহাদিগকে লক্ষ্য করা এবং তাহাদের উর্দ্ধে উঠা কঠিন হইবে। তাহা ছাড়া আপনি ভক্তিকেই যোগের শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ বলিয়াছেন, অথচ আপনি কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন,

কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে এক রকম কিছুই বলেন নাই। আর কাহাকেই বা এই ভক্তি, এই শ্রেষ্ঠতম জিনিষ অর্পণ করিতে হইবে ? নিশ্চল নীরব নির্গুণ ব্রহ্মকে নিশ্চয়ই নহে, ভক্তি করিতে হইবে আপনাকে, ঈশ্বরকে। তাহা হইলে আমাকে বলুন, আপনি কি ? জ্ঞান যেমন কর্ম্ম অপেক্ষা বড় তেমনিই অক্ষর ব্রহ্ম ক্ষর প্রকৃতি অপেক্ষা বড়, আবার ভক্তি যেমন এই আত্মজ্ঞান অপেক্ষা বড় তেমনি আপনিও অক্ষর ব্রহ্ম অপেক্ষা বড়—বলুন আপনার স্বরূপ কি ? এই তিনটি জিনিষের মধ্যে সম্বন্ধ কি ? কর্ম্ম, জ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি ? প্রকৃতি-স্থ পুরুষ, অক্ষর পুরুষ এবং যিনি একই সঙ্গে সকলের অক্ষর আত্মা এবং জ্ঞান ও ভক্তি ও কর্ম্মের অধীশ্বর, যে পরম ভগবান এই মহাযুদ্ধ ও ধ্বংসকাণ্ডে এখানে আমার সঙ্গে রহিয়াছেন, যিনি এই ঘোর ভীষণ কর্ম্মে আমার রথে সারথিরূপে বিদ্যমান, ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি ?" এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেই গীতার বাকী অংশ লিখিত হইয়াছে ; বাস্তবিক, বুদ্ধির পক্ষে একটা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মীমাংসা দিতে হইলে এই সকল প্রশ্ন ফেলিয়া রাখা চলে না, ইহাদের আলোচনা ও সমাধান এখনই করিতে হয়। কিন্তু বাস্তব সাধনায় স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়, অনেক জিনিষ, বস্তুতঃ উচ্চতম জিনিষগুলি বাকী থাকে, আমরা অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে অগ্রসর হইলে তাহারই আলোকে ঐ সকল জিনিষ পরে উঠে এবং আপনা আপনি পূর্ণভাবে মীমাংসিত হইয়া যায়। গীতা কতকটা এই উপলব্ধির রেখাই অনুসরণ করিয়াছে এবং প্রথমে কর্ম্ম ও জ্ঞানের একটা প্রশস্ত আদ্য ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, ইহার মধ্যে এমন একটা জিনিষ রহিয়াছে যাহা হইতে ভক্তি ও মহত্তর জ্ঞানে পৌঁছান

যাইতে পারে কিন্তু সেখানে এখনও সম্পূর্ণভাবে পৌছান যায় নাই। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে আমরা এই ভিত্তিটি পাই।

তাহা হইলে যে-সমস্যা লইয়া গীতার আরম্ভ তাহার সমাধান এই ছয় অধ্যায়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে আমরা এইখানে থামিয়া তাহা আলোচনা করিতে পারি। এইখানে আবার বলা যাইতে পারে যে, কেবল ঐ সমস্যাটিরই সমাধানের জন্য জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং সাধারণ জীবনের পরিবর্ত্তে অধ্যাত্ম জীবন লাভ সম্বন্ধে সমগ্র প্রশ্নটি না তুলিলেও চলিতে পারিত। ব্যবহারিক দিক হইতে, অথবা নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিতে অথবা মানসিক যুক্তি কিম্বা আদর্শের দিক হইতে অথবা এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়াই একটা মীমাংসা করা চলিত ; বস্তুতঃ ঐরূপ সমাধানই আমাদের আধুনিক পদ্ধতির অনুযায়ী হইত। শুধু এই সমস্যাটিকে ধরিলে প্রথমতঃ কেবল এই প্রশ্নটি উঠে, হত্যাকাণ্ডে ব্যক্তিগত পাপ সম্বন্ধে যে নৈতিক বিরাগ অর্জ্জুন কি তাহার দ্বারাই পরিচালিত হইবে, না, দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে বোধ সমানভাবেই নৈতিক, ন্যায় ও ধর্ম্মকে রক্ষা করা, অন্যায় অত্যাচারের সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে সকল মহানুভব ব্যক্তিরই বিবেক যে দাবী করে তাহার অনুসরণ করা— এই আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইবে ? আমাদের যুগে, বর্ত্তমান মূহুর্ত্তেই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, নানাভাবে নানা দিক দিয়া এই প্রশ্নের সমাধান করা যায় এবং বস্তুতঃ পক্ষে আমরা করিতেছি, কিন্তু এ-সমস্ত সমাধানই হইতেছে আমাদের সাধারণ জীবনের দিক হইতে, আমাদের সাধারণ মানবীয় মনের দিক হইতে। আমাদের ব্যক্তিগত বিবেকের নির্দ্দেশ পালন করা উচিত, না, সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহারই

অনুসরণ করা উচিত, একটা আদর্শ নীতির অনুসরণ করা উচিত, না, কার্য্যক্ষেত্রে যাহা উপযোগী এমন ব্যবহারিক নীতিরই অনুসরণ করা উচিত, আত্মার শক্তির ("Soul-force") উপর নির্ভর করা উচিত, না, জীবন এখনও অন্ততঃ সমগ্রভাবে আত্মা হইয়া উঠে নাই এবং ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা কখনও কখনও অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, এই কঠোর সত্যকে স্বীকার করা উচিত? এইসব প্রশ্ন তুলিয়াই সমস্যাটির সমাধান করা যাইতে পারে কিন্তু সে-সব সমাধান হইবে মানসিক যুক্তি, প্রকৃতি, হৃদয়বৃত্তির দিক দিয়া ; এ-সব সমাধান নির্ভর করে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর, আমাদের সম্মুখে যে সমস্যা উপস্থিত হয় তাহার যে সমাধান আমাদের পক্ষে উপযোগী বড় জোর তাহাই হইতে পারে, আমাদের পক্ষে উপযোগী অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতির, আমাদের নৈতিক ও বুদ্ধিগত বিকাশের যে স্তরে আমরা রহিয়াছি তাহারই উপযোগী হইতে পারে, আমাদের যতটুকু জ্ঞান তাহারই আলোকে আমরা আমাদের সাধ্যমত যতটুকু দেখিতে পারি, করিতে পারি এই সমাধান হয় তাহারই অনুযায়ী ; এইভাবে কোনরূপ চরম মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না। কারণ এই মীমাংসা আমাদের সাধারণ মন হইতে আইসে, এই মনের মধ্যে রহিয়াছে আমাদের সত্তার নানা বিচিত্র প্রবৃত্তির জটিলতা, আমাদের বিচারবুদ্ধি, নৈতিকবোধ, আমাদের কর্ম্মপ্রেরণা, আমাদের প্রাণের সহজাত প্রবৃত্তি, আমাদের হৃদয়বৃত্তি এবং আমাদের মধ্যে যে-সব দুর্ল্লভ জিনিষকে আমরা আত্মার সহজাত প্রবৃত্তি বা চৈত্য প্রেরণা (psychical preferences) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি— এইসবের মধ্যে মন কোন একটিকেই বাছিয়া লয় অথবা, ইহাদের মধ্যে

যাহা হউক একটা সামঞ্জস্য করিয়া লয়। গীতা দেখিয়াছে যে, এইদিক দিয়া কোনরূপ চরম মীমাংসা হইতে পারে না, কেবল একটা সাময়িক কাজচলা মীমাংসা হইতে পারে মাত্র ; অর্জ্জুনকে প্রথমে তৎকাল প্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শ অনুসারে এইরূপই একটা কাজচলা মীমাংসা দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু এরূপ মীমাংসা গ্রহণ করিবার মত মতিগতি অর্জ্জুনের ছিল না, বাস্তবিক অর্জ্জুন ইহাতে সন্তুষ্ট হউক এরূপ ইচ্ছা যে দিব্য গুরুরও ছিল না তাহা খুবই স্পষ্ট। তখন গুরু এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক হইতে, এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন উত্তর দিতে অগ্রসর হইলেন।

গীতার মীমাংসা হইতেছে, আমাদের সাধারণ সত্তা ও সাধারণ মনের উর্দ্ধে, আমাদের যৌক্তিক ও নৈতিক সংশয় সমূহের উর্দ্ধে অন্য এক চৈতন্যের মধ্যে উঠিতে হইবে, সেখানে সত্তার ধর্ম্ম আলাদা এবং সেইজন্য আমাদের কর্ম্মের আদর্শও আলাদা ; সেখানে ব্যক্তিগত বাসনা এবং ব্যক্তিগত ভাবাবেগ আর কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে না ; সেখানে দ্বন্দ্বসকলের অবসান হয় ; সেখানে কর্ম্ম আর আমাদের নিজেদের থাকে না, অতএব সেখানে ব্যক্তিগত পুণ্য বা ব্যক্তিগত পাপ বোধের উর্দ্ধে উঠা যায় ; সেখানে বিশ্বগত, নির্ব্যক্তিক, ভাগবত সত্তা আমাদের ভিতর দিয়া জগতে তাহার উদ্দেশ্য সম্পাদন করে ; সেখানে আমরা নিজেরা এক নূতন ও দিব্য জন্মের দ্বারা সেই সত্তার সত্তায়, সেই চৈতন্যের চৈতন্যে, সেই শক্তির শক্তিতে, সেই আনন্দের আনন্দে পরিণত হই, এবং তখন আমরা আর নিম্নতন প্রকৃতিতে বাস করি না বলিয়া আমাদের নিজেদের কোন কর্ম্ম করিবার থাকে না, নিজেদের কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য অনুসরণ করিবার থাকে না, পরন্তু যদি আমরা অদৌ

কর্ম্ম করি (কেবল এই একটি মাত্র প্রকৃত সমস্যা ও প্রশ্ন বাকী থাকে). তাহা হইলে আমরা কেবল ভাগবত কর্ম্ম করি, আমাদের বাহ্য প্রকৃতি সে কর্ম্মের কারণ হয় না, সেখান হইতে তাহার প্রেরণা আসে না পরন্তু বাহ্য প্রকৃতি হয় সে-কর্ম্মের কেবল শান্ত অবাধ যন্ত্র ; কারণ প্রেরণা শক্তি আইসে আমাদের উর্দ্ধে আমাদের কর্ম্মের অধীশ্বরেরই ইচ্ছা হইতে। আর এইটিকেই যথার্থ মীমাংসা বলিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে, কারণ ইহা আমাদের সত্তার প্রকৃত সত্যের অনুযায়ী, আর আমাদের সত্তার প্রকৃত সত্য অনুসারে জীবন যাপন করাই যে শ্রেষ্ঠ মীমাংসা, আমাদের জীবনের সমস্যাসকলের একমাত্র সম্পূর্ণভাবে সত্য মীমাংসা তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মানসিক ও প্রাণিক চরিত্র হইতেছে আমাদের প্রাকৃত জীবনের সত্য, কিন্তু তাহা অজ্ঞানের সত্য, আর যাহা কিছু ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সে-সবই এই স্তরের সত্য, অজ্ঞানের মধ্যে কাজ করিবার জন্য তাহারা কার্য্যতঃ উপযোগী, কিন্তু যখন আমরা আমাদের সত্তার প্রকৃত সত্যে ফিরিয়া যাই তখন আর তাহাদের কোন উপযোগিতা থাকে না। কিন্তু এইটিই যে সত্য সে-সম্বন্ধে আমরা কেমন করিয়া নিঃসন্দেহ হইব ? যতক্ষণ আমরা আমাদের সাধারণ মানসিক উপলব্ধি লইয়াই সন্তুষ্ট ততক্ষণ আমরা এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারিব না ; কারণ আমাদের সাধারণ মানসিক উপলব্ধি হইতেছে সম্পূর্ণ ভাবেই এই অজ্ঞানময়ী নিম্নতন প্রকৃতির উপলব্ধি। আমরা এই মহত্তর সত্যকে জানিতে পারি কেবল যখন উহা আমাদের জীবনের মধ্যে সত্য হইয়া উঠে, অর্থাৎ, যখন আমরা যোগের দ্বারা মানসিক উপলব্ধি ছাড়াইয়া অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে প্রবেশ লাভ করি। কারণ

অধ্যাত্ম উপলব্ধি অনুসারে জীবন যাপন করা, যেন শেষ পর্য্যন্ত আর আমরা মন থাকি না পরন্তু আত্মা হইয়া উঠি, যেন আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতির ত্রুটি সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া আমরা সম্পূর্ণভাবেই আমাদের সত্য ও দিব্য সত্তার মধ্যে বাস করিতে পারি—ইহাই হইতেছে যোগের চরম অর্থ।

এই ভাবে আমাদের সত্তার কেন্দ্রকে উর্দ্ধে উত্তোলিত করা এবং তাহার ফল স্বরূপ আমাদের সমগ্র জীবন ও চেতনার রূপান্তর সাধন এবং সেই সঙ্গে আমাদের কর্ম্মের ভাব ও প্রেরণার পরিবর্ত্তন (বাহ্যিক লক্ষণ সকলে কর্ম্ম অনেক সময়ে ঠিক একই রকম থাকিতে পারে),— ইহাই হইতেছে গীতোক্ত কর্ম্মযোগের সারতত্ত্ব। তোমার সত্তার পরিবর্ত্তন কর, আত্মার মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ কর এবং সেই নব জন্ম লাভ করিয়া তোমার অন্তরস্থিত ভগবান তোমাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন সেই কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হও, ইহাই গীতার বাণীর মর্ম্মকথা। অথবা অন্যভাবে আরও গভীর ও অধিকতর অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার সহিত বলা যাইতে পারে, তোমাকে এখানে যে-কর্ম্ম করিতে হইবে সেইটিকেই তোমার অভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম পুনর্জন্মলাভের, দিব্য জন্মলাভের সাধন স্বরূপ কর, আর যখন দিব্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছ তখনও লোক-সংগ্রহের নিমিত্ত ভগবানের যন্ত্ররূপে দিব্য কর্ম্মসকল সম্পাদন কর। অতএব এখানে দুইটি জিনিষ স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে, স্পষ্ট করিয়া ধারণা করিতে হইবে, প্রথমতঃ, পরিবর্ত্তনের পন্থাটি, এই উর্দ্ধমুখী সঞ্চারণের, এই অভিনব দিব্য জন্ম লাভের পন্থাটি এবং দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মের স্বরূপ, অথবা যে ভাব লইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, কারণ কর্ম্মের বাহ্য রূপের

কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন আবশ্যক না হইতে পারে, যদিও বস্তুতঃ ইহার অভিপ্রায় ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু এই দুইটি জিনিষ কার্য্যতঃ একই, কারণ একটির ব্যাখ্যা করিলে অপরটিরও ব্যাখ্যা হইয়া যায়। আমাদের কর্ম্মের ভাব আমাদের সত্তার স্বরূপ হইতে এবং সত্তার অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠা হইতে উত্থিত হয়, কিন্তু আবার এই স্বরূপই আমাদের কর্ম্মের ধারা ও অধ্যাত্ম ফলের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়; আমাদের কর্ম্মের ভাবে খুব বেশী পরিবর্ত্তন হইলে তাহা আমাদের সত্তার স্বরূপকে পরিবর্ত্তিত করে এবং তাহার আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠারও পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়; আমরা সচেতন শক্তির যে কেন্দ্র হইতে কর্ম্ম করি, ইহা সেইটিকে সরাইয়া দেয়। কেহ কেহ যেমন বলিয়া থাকেন, জীবন ও কর্ম্ম যদি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা মায়া হইত, জীবন বা কর্ম্মের সহিত আত্মার যদি কোন সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ হইতে পারিত না; কিন্তু আমাদের মধ্যে অন্তপুর্রুষ নিজেকে জীবন ও কর্ম্মের দ্বারাই বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, বস্তুতঃ ততটা কর্ম্মের দ্বারা নহে পরন্ত আমাদের অন্তপুর্রুষের কর্ম্মশক্তির অভ্যন্তবীণ ধারার দ্বারাই আত্মার সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। মহত্তর অধ্যাত্ম সিদ্ধির লাভের কার্য্যকরী উপায়রূপে ইহাই হইতেছে কর্ম্মযোগের সার্থকতা।

গোড়াতে ভিত্তিস্বরূপ আমরা ইহাই পাইতেছি যে, মানুষের এই যে বর্ত্তমান আভ্যন্তরীণ জীবন সম্পূর্ণভাবেই তাহার দৈহিক ও প্রাণিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতেছে, কেবল মানসিক শক্তির স্বল্প ক্রিয়ার দ্বারা ইহার উর্দ্ধে উন্নীত,—তাহার জীবনের সম্ভাবনা ইহা অপেক্ষা অনেক বড়, এমন কি ইহা তাহার প্রকৃত বর্ত্তমান জীবনেরও সবখানি নহে।

তাহার মধ্যে রহিয়াছে এক নিগূঢ় আত্মা, তাহার বর্ত্তমান প্রকৃতি হইতেছে এই আত্মারই একটা বাহ্য রূপ অথবা উহার আংশিক লীলা প্রকাশ। গীতা বরাবরই আত্মার লীলা বিকাশকে সত্য বলিয়াই ধরিয়াছে বলিয়া মনে হয়, চরমপন্থী বৈদান্তিকদের ন্যায় ইহাকে মিথ্যা মায়া মাত্র বলে নাই, এইরূপ বেদান্ত মত গ্রহণ করিলে সকল প্রকার কর্ম্ম ও সক্রিয়তার মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। গীতা এই বিষয়ে নিজ দার্শনিক মতটি ব্যক্ত করিতে সাংখ্যদর্শনকৃত প্রকৃতি পুরুষের বিভেদ স্বীকার করিয়াছে (অন্য ভাবেও ইহা করা চলিত),—পুরুষ জানে, ধরিয়া থাকে, প্রেরণা দেয় আর প্রকৃতি কর্ম্ম করে, যন্ত্রের, আধারের, পদ্ধতির নানা বৈচিত্র্য বিকাশ করে। কেবল গীতা সাংখ্যের মুক্ত ও অক্ষর পুরুষকে লইয়া ইহাকে বেদান্তের ভাষায় অদ্বিতীয় অক্ষর সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়াছে এবং ইহার সহিত এই অন্য প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষের প্রভেদ করিয়াছে, এই শেষোক্ত পুরুষই হইতেছে আমাদের ক্ষর ও ক্রিয়াশীল সত্তা, বহুরূপে সকল জিনিষের অন্তরাত্মা, বৈচিত্র্য ও ব্যক্তিগত চরিত্রের ভিত্তি। কিন্তু তাহা হইলে প্রকৃতির ক্রিয়ার স্বরূপ কি ?

তিনটি মূল গুণের পরস্পরের উপর ক্রিয়াই প্রকৃতির পদ্ধতি। আর ইহার আধার কি ? প্রকৃতির করণসকলের ক্রমিক বিকাশের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্নাংশাত্মক সত্তাই হইতেছে আধার, পুরুষের অনুভূতিতে প্রকৃতির ক্রিয়াসকল যে-ভাবে প্রতিফলিত হয় তদনুসারে আমরা ঐ-সব করণকে যথাক্রমে উল্লেখ করিতে পারি—বুদ্ধি ও অহংভাব, মন, ইন্দ্রিয়গণ এবং জড়শক্তির রূপসমূহের ভিত্তিস্বরূপ উপাদান পঞ্চভূত।

এই সমস্তই হইতেছে যন্ত্রবৎ, প্রকৃতির বিভিন্নাংশাত্মক যন্ত্র ; আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া বলা যাইতে পারে যে, ইহারা সকলেই জড়শক্তির অন্তর্গত, প্রকৃতি-স্থ পুরুষ যেমন এক একটি যন্ত্রের বিবর্ত্তনের দ্বারা নিজ সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে তেমনই ইহারাও জড়শক্তির মধ্যে ক্রমশঃ প্রকটিত হয়, তবে ইহাদের অভিব্যক্তির ক্রম পূর্ব্বে উল্লিখিত ক্রমের বিপরীত, যথা—প্রথমে জড়পদার্থ (matter), তাহার পর ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensation), তাহার পর মন, পরে বুদ্ধি এবং শেষে অধ্যাত্ম চৈতন্য। বুদ্ধি প্রথমে প্রকৃতির ক্রিয়াসমূহেই নিবিষ্ট ছিল, এখন সে তাহাদের যথার্থ স্বরূপটি ধরিতে পারে, বুঝিতে পারে যে এই সব কেবল তিন গুণের খেলা, পুরুষ ইহার মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, পুরুষকে এই সকল ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াও দেখিতে পারে ; তখনই পুরুষ নিজেকে মুক্ত করিবার এবং তাহার আদ্য স্বাধীনতা ও অক্ষর জীবনে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ লাভ করে। বেদান্তের ভাষায় সে তখন আত্মাকে দেখে, সত্তাকে দেখে ; সে আর প্রকৃতির করণসমূহ ও ক্রিয়াসকলের সহিত, প্রকৃতির বিবর্ত্তনের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে না ; সে তাহার সত্য আত্মা ও সত্তার সহিতই নিজকে এক করিয়া দেখে এবং নিজের অক্ষর অধ্যাত্ম স্ব-প্রতিষ্ঠ জীবন ফিরিয়া পায়। তখনই সেই অধ্যাত্ম আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতেই সে মুক্তভাবে নিজের সত্তার প্রভুরূপে ঈশ্বররূপে নিজের বিবর্ত্তনের ক্রিয়াকে সমর্থন করিতে পারে।

মনোবিজ্ঞানের যে-সকল তথ্যের উপর এই সব দার্শনিক* ভেদবিচার

---

* জড়জগৎ ও মনোজগতের ব্যাপার সমূহের মূল তত্ত্ব এবং পরম সত্য বস্তু যাহাই হউক তাহার সহিত ইহাদের মূল সম্বন্ধ বিচারবুদ্ধির সহায়ে বিবৃত করাই ফিলজফি philosophy) বা দর্শনশাস্ত্র।

প্রতিষ্ঠিত কেবল সেইগুলিকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারা যায় যে, আমরা দুই প্রকার জীবন যাপন করিতে পারি, (১) নিজের সক্রিয়া প্রকৃতির কর্ম্মপরম্পরায় নিমগ্ন পুরুষের জীবন, সে নিজেকে তাহার মানসিক ও দৈহিক যন্ত্রসকলের সহিত এক করিয়া দেখে, তাহাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, নিজের নামরূপের মধ্যে বদ্ধ হয়, প্রকৃতির অধীন হয়; আর (২) আত্মার জীবন, তাহা এই সকল জিনিষের উর্দ্ধে, বৃহৎ, নামরূপের অতীত, বিশ্বময়, মুক্ত, অসীম, তুরীয়, তাহা অনন্ত সমতার সহিত তাহার প্রাকৃত সত্তা ও কর্ম্মকে ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু নিজের মুক্তি ও অনন্ততার দ্বারা তাহাদের উর্দ্ধে থাকে। এখন আমাদের যাহা প্রাকৃত সত্তা তাহার মধ্যেই আমরা বাস করিতে পারি অথবা আমাদের যে মহত্তর ও অধ্যাত্ম সত্তা তাহারই মধ্যে বাস করিতে পারি। প্রথমতঃ এই মহৎ প্রভেদটির উপরে গীতার কর্ম্মযোগ প্রতিষ্ঠিত।

অতএব আমাদের বর্ত্তমান প্রাকৃত সত্তা হইতে অন্তর্পুরুষকে মুক্ত করাই হইতেছে সমগ্র সমস্যা এবং সমগ্র পদ্ধতি। আমাদের প্রাকৃত জীবনে যে জিনিষটি আর সব কিছুকেই ঢাকিয়া রাখিয়াছে সেইটি হইতেছে জড়প্রকৃতির রূপসকলের বশ্যতা, বাহ্যস্পর্শের বশ্যতা। এইগুলি ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া আমাদের প্রাণের সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং প্রাণও তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া উহাদিগকে ধরিবার জন্য, উহাদের সহিত ব্যবহার করিবার জন্য ধাবিত হয়, বাসনা করে, আসক্ত হইয়া পড়ে, ফলের আকাঙ্ক্ষা করে। মন তাহার সকল আভ্যন্তরীণ অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া, হৃদয়াবেগে, তাহার প্রত্যক্ষ, চিন্তা ও

অনুভবের সকল অভ্যস্ত ধারায় ইন্দ্রিয়গণের এই ক্রিয়ারই অনুসরণ করে ; বুদ্ধিও মনের টানে পড়িয়া এই ইন্দ্রিয়গত জীবনে নিজেকে ছাড়িয়া দেয়, এই জীবনে অন্তর্পুরুষ বস্তুসকলের বাহ্য রূপের অধীন হইয়া পড়ে, মুহূর্ত্তের জন্যও প্রকৃত পক্ষে ইহার উর্দ্ধে উঠিতে পারে না, বাহ্যজগৎ আমাদের উপর যে ক্রিয়া করে এবং আমাদের মনে তাহার যে-সব ফল ও প্রতিক্রিয়া হয় ইহাদের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে না। পারে না অহংবোধের জন্য, এই অহংবোধের দ্বারাই বুদ্ধি আমাদের মন, ইচ্ছা, ইন্দ্রিয় ও শরীরের মধ্যে প্রকৃতির ক্রিয়ার সমষ্টিকে অন্যের মন, ইচ্ছা, স্নায়ুমণ্ডল, শরীরের উপর প্রকৃতির ক্রিয়ার প্রভেদ করে, আমরা জীবন বলিতে বুঝি কেবল প্রকৃতি আমাদের অহংয়ের উপর কিভাবে ক্রিয়া করিতেছে এবং তাহার স্পর্শে আমাদের অহং কিভাবে সাড়া দিতেছে। আমরা আর কিছুই জানি না, আমরা যে আর কিছু তাহা মনে হয় না ; আত্মাকেই তখন মনে হয় কেবল মন, ইচ্ছা, হৃদয়বৃত্তি ও স্নায়বিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার একটা স্বতন্ত্র স্তুপমাত্র। আমরা আমাদের অহংকে প্রসারিত করিতে পারি, নিজদিগকে পরিবার, কুল, সম্প্রদায়, দেশ, অধিজাতি (nation), এমন কি সমগ্র মানব জাতির সহিতই এক করিয়া দেখিতে পারি, কিন্তু তথাপি এইসব ছদ্মবেশের অন্তরালে অহংই থাকে আমাদের কর্ম্মের মূলতত্ত্ব, কেবল সে বাহ্য বস্তুসকলের সহিত এই উদারতর ব্যবহারের দ্বারা নিজের স্বতন্ত্র সত্তার অধিকতর পরিতৃপ্তি লাভ করে।

তখনও আমাদের মধ্যে প্রাকৃত সত্তার ইচ্ছাই কার্য্য করে, বাহ্যজগতের স্পর্শসকলকে ধরিয়া ব্যক্তিগত অহংয়ের বিভিন্ন দিককেই

পরিতৃপ্ত করিতে চায়, এবং এই ক্রিয়ায় ইচ্ছা হইতেছে সকল সময়েই বাসনা কামনার ইচ্ছা, আমাদের কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ফলে আসক্তির ইচ্ছা, ইহা হইতেছে আমাদের মধ্যে প্রকৃতিরই ইচ্ছা; আমরা বলি বটে যে, ইহা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, কিন্তু আমাদের অহংয়ের যে ব্যক্তিগত রূপ তাহা হইতেছে প্রকৃতিরই সৃষ্টি, তাহা আমাদের মুক্ত আত্মা, আমাদের স্বাধীন সত্তা নহে, হইতেই পারে না। সমস্তটিই হইতেছে প্রকৃতির গুণের খেলা। ইহা তমোগুণের ক্রিয়া হইতে পারে, তখন আমাদের ব্যক্তিত্ব হয় জড় তামসিক, তাহা হয় বস্তুসকলের গতানুগতিক ধারার অধীন এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট; মুক্ততর কর্ম্ম ও প্রভুত্বের জন্য সবল প্রয়াস করিবার কোন ক্ষমতাই থাকে না। অথবা ইহা রজোগুণের ক্রিয়া হইতে পারে, তখন আমাদের ব্যক্তিত্ব হয় অস্থির কর্ম্মপ্রবণ, তাহা প্রকৃতির উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাহাকে নিজের প্রয়োজন ও বাসনার কাজে লাগাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু দেখিতে পায় না যে তাহার আপাতদৃশ্য প্রভুত্ব বস্তুতপক্ষে দাসত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ তাহার প্রয়োজন ও বাসনাসমূহ হইতেছে প্রকৃতিরই, আর যতক্ষণ আমরা উহাদের বশ ততক্ষণ আমাদের কোন স্বাধীনতাই সম্ভব নহে। অথবা ইহা সত্ত্ব গুণেরই ক্রিয়া হইতে পারে, তখন আমাদের ব্যক্তিত্ব হয় জ্ঞানময়, তাহা বিচারবুদ্ধি অনুসরণে জীবন যাপন করিতে অথবা সত্য, শিব বা সুন্দরের কোন আদর্শ সিদ্ধ করিয়া তুলিতে প্রয়াস করে; কিন্তু এই বিচারবুদ্ধিও প্রকৃতির বাহ্য রূপেরই অধীন এবং এই সকল আদর্শ আমাদের ব্যক্তিত্বেরই পরিবর্ত্তনশীল ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই সবে শেষ পর্য্যন্ত আমরা কোন নিশ্চিত নীতি বা স্থায়ী তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। তখনও

আমরা একটা পরিবর্ত্তনের চক্রে ঘূর্ণীত হইতে থাকি, আমাদের অহংয়ের ভিতর দিয়া এক শক্তি আমাদিগকে ঘুরায়, সে শক্তি আমাদের মধ্যে, এই সবের মধ্যেই রহিয়াছে, কিন্তু আমরা নিজেরা সে শক্তি নহি অথবা তাহার সহিত আমাদের যোগ বা সহকারিতা নাই। তখনও স্বাধীনতা নাই, প্রকৃত প্রভুত্ব নাই।

অথচ স্বাধীনতা সম্ভব। ইহার জন্য প্রথমে আমাদিগকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর বাহ্যজগতের যে ক্রিয়া তাহা হইতে সরিয়া নিজেদের ভিতরে আসিতে হইবে, অর্থাৎ, আমাদিগকে অন্তর্মুখী হইয়া চলিতে হইবে এবং ইন্দ্রিয়গণ যে স্বভাবতঃ তাহাদের বাহ্য বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় তাহাদিকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণের উপর প্রভুত্ব, তাহারা যে-সব বস্তুর জন্য লালায়িত সে-সব বর্জ্জন করিবার সামর্থ্য,—ইহাই হইতেছে প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবন লাভের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন ; কেবল এইরূপেই আমরা অনুভব করিতে আরম্ভ করি যে, আমাদের ভিতরে এক আত্মা আছে, বাহ্য বস্তুর স্পর্শ গ্রহণ করিয়া মনের যে অবস্থা-বিপর্য্যয় হয় সে আত্মা তাহা হইতে স্বতন্ত্র, সে আত্মা নিজের গভীরতর সত্তায় স্ব-প্রতিষ্ঠ, অক্ষর, প্রশান্ত, আত্মবশ, গম্ভীর, স্থির ও সুমহান, তাহা নিজেই নিজের ঈশ্বর এবং আমাদের বাহ্যপ্রকৃতির সাগ্রহ ছুটাছুটিতে সম্পূর্ণ অবিচলিত। কিন্তু যতক্ষণ আমরা বাসনার বশ ততক্ষণ ভিতরের এই আত্মাকে অনুভব করা যায় না। কারণ আমাদের সমগ্র বাহ্যজীবনের মূল তত্ত্ব এই বাসনা ইন্দ্রিয়ের জীবনেই তৃপ্তি পায়, কাম ক্রোধাদি রিপুগণের ক্রিয়াতেই সে মত্ত থাকে। অতএব আমাদিগকে বাসনা দূর করিতেই

হইবে। আমাদের প্রাকৃত সত্তার এই প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইলে, ইহার অনুভবাত্মক ফলস্বরূপ কামক্রোধাদি চিত্তবিকারসকল শান্ত হইয়া পড়িবে; কারণ যে সুখদুঃখের বোধ এই সকল চিত্তবিকার সৃষ্টি করে তাহা আমাদের অন্তর হইতে চলিয়া যাইবে, বাসনা বিদূরিত হইলে আর আমরা লাভ ও ক্ষতিতে, জয় ও পরাজয়ে, সুখময় ও বেদনাময় বাহ্যস্পর্শে সুখ ও দুঃখ অনুভব করিব না। তখন আসিবে এক প্রশান্ত সমতা। আর যেহেতু তখনও আমাদিগকে সংসারে বাস করিতে হইবে, কর্ম্ম করিতে হইবে, আর যেহেতু আমাদের প্রকৃতি এইরূপ যে কর্ম্ম করিতে হইলেই ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিতে হয়, আমাদিগকে সেই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে এবং কর্ম্মের ফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, নতুবা বাসনা এবং বাসনার সমস্ত পরিণাম থাকিয়াই যাইবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কর্ম্মীর এই প্রকৃতি কেমন করিয়া পরিবর্ত্তন করা যায়? কর্ম্মকে অহং ও ব্যক্তি-সত্তা হইতে পৃথক করিতে হইবে, বুদ্ধির দ্বারা দেখিতে হইবে যে, এ-সবই হইতেছে প্রকৃতির গুণের খেলা, আমাদের অন্তর্পুরুষকে এই খেলা হইতে পৃথক করিতে হইবে, প্রথমেই তাহাকে করিতে হইবে প্রকৃতির কর্ম্মসকলের সাক্ষী, এবং ঐ সকল কর্ম্মকে সেই শক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে যে-শক্তি বস্তুতঃপক্ষে উহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে,—প্রকৃতির মধ্যে ঐ শক্তি হইতেছে আমাদের অপেক্ষা মহত্তর, তাহা আমাদের ব্যক্তিসত্তা নহে, তাহা হইতেছে বিশ্বের অধীশ্বর। কিন্তু মন এই সব করিতে দিবে না; মনের স্বভাবই হইতেছে বাহিরের দিকে ইন্দ্রিয়গণের পশ্চাতে ধাবমান হওয়া এবং বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তিকেও নিজের সঙ্গে

টানিয়া লওয়া। অতএব মনকে কেমন করিয়া শান্ত করা যায় তাহা আমাদিগকে শিখিতেই হইবে। আমাদিগকে এমন পূর্ণতম শান্তি ও নিস্তব্ধতা লাভ করিতে হহবে যাহাতে আমরা আমাদের অন্তরস্থিত প্রশান্ত, নিশ্চল, আনন্দময় আত্মাকে জানিতে পারি, সে-আত্মা বস্তু-সকলের স্পর্শে চির-অক্ষত, চির-অবিচলিত, তাহা আপনাতে আপনি পূর্ণ, নিজের মধ্যেই তাহা অনন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করে।

এই আত্মাই হইতেছে আমাদের স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা। ইহা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা সর্ব্বভূতের মধ্যে এক, সর্ব্বব্যাপী, সকল বস্তুর প্রতি সমান, নিজের অনন্ত সত্তার দ্বারা ইহা সমগ্র বিশ্বলীলাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু কোন সসীম বস্তুর দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ নহে, প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তনসকলের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় না। যখন এই আত্মা আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়, যখন আমরা ইহার শান্তি ও নিস্তব্ধতা অনুভব করি, তখন আমরা এই আত্মা হইয়া উঠিতে পারি; আমরা আমাদের অন্তর্পুরুষকে প্রকৃতির মধ্যে তাহার নিম্নতর অবস্থা হইতে উত্তোলিত করিয়া আত্মার মধ্যে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। আমরা ইহা করিতে পারি, আমরা যে সকল জিনিষ লাভ করিয়াছি, শান্তি, সমতা, বিক্ষোভহীন নির্ব্যক্তিকতা—এই সকলের শক্তির দ্বারা। কারণ যতই আমরা এই সকল জিনিষে বর্দ্ধিত হই, ইহাদিগকে পূর্ণ করিয়া তুলি, আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে ইহাদের অধীন করিয়া দিই ততই আমরা এই শান্ত, সম, বিক্ষোভহীন, নির্ব্যক্তিক, সর্ব্বব্যাপী আত্মা হইয়া উঠি। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ ঐ নিথর নিস্তব্ধতার মধ্যে পতিত হয় এবং আমাদের উপর

বাহ্যজগতের স্পর্শসকলকে পরম শান্তির সহিত গ্রহণ করে; আমাদের মন নিস্তব্ধতার মধ্যে পতিত হয় এবং শান্ত বিশ্বমুখিন সাক্ষী হইয়া উঠে; আমাদের অহং এই নির্ব্যক্তিক সত্তায় লয় হইয়া যায়। আমরা নিজেরা এই যে আত্মা হইয়াছি তাহার মধ্যেই আমরা সকল বস্তুকে দেখি; আমরা মূল অধ্যাত্ম সত্তায় সর্ব্বভূতের সহিত এক হইয়া উঠি। এই অহংভাবশূন্য শান্তি ও নির্ব্যক্তিকতায় কর্ম্ম করিয়া, আমাদের কর্ম্ম আর আমাদের থাকে না, তাহাদের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আর আমাদিগকে বদ্ধ করে না, বিক্ষুব্ধ করে না। প্রকৃতি এবং তাহার গুণসমূহ তাহার কর্ম্মের জাল বুনিতে থাকে, কিন্তু আমাদের দুঃখলেশশূন্য স্ব-প্রতিষ্ঠ শান্তির হানি করিতে পারে না। সমস্তই সেই এক, সম, সর্ব্বগত ব্রহ্মে সমর্পিত হয়।

কিন্তু এখানে দুইটি সমস্যা থাকিয়া যায়। প্রথমত, শান্ত ও অক্ষর আত্মা এবং প্রকৃতির কর্ম্ম এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে কর্ম্মের অস্তিত্ব আদৌ কেমন করিয়া সম্ভব হয় অথবা একবার আমরা অক্ষর আত্ম-প্রতিষ্ঠায় প্রবেশ লাভ করিলে আর কর্ম্ম কেমন করিয়া চলিতে পারে? সেখানে কর্ম্মের সেই প্রেরণা কোথায় যাহার দ্বারা আমাদের প্রকৃতির কর্ম্ম সম্ভব হইবে? যদি আমরা সাংখ্যের সহিত বলি যে, প্রেরণা রহিয়াছে প্রকৃতিরই মধ্যে, আত্মার মধ্যে নহে, তাহা হইলেও প্রকৃতিতে একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই, পুরুষকে অনুরাগ, অহংভাব ও আসক্তির দ্বারা তাহার কর্ম্মের মধ্যে টানিয়া লইবার শক্তি থাকা চাই, আর যখন এইসব জিনিষ আর নিজদিগকে পুরুষের চৈতন্যের মধ্যে প্রতিফলিত করে না তখন প্রকৃতির

আর শক্তি থাকে না এবং সেই সঙ্গে কর্ম্মের প্রেরণাও বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু গীতা এই মত গ্রহণ করে নাই, বস্তুতঃ এই মত অনুসারে বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, কেবল এক বিশ্বপুরুষ নহে, নতুবা জীবের পৃথক পৃথক জীবন এবং যখন লক্ষ লক্ষ অন্য জীব বদ্ধ রহিয়াছে তখন কোন একটি জীবের মুক্তি কেমন করিয়া সম্ভব হয় তাহা বুঝা যায় না। প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে, ভগবানের যে শক্তি বিশ্বসৃষ্টিতে বাহির হইয়াছে তাহাই প্রকৃতি। কিন্তু ভগবান যদি কেবল এই অক্ষর আত্মা হন এবং জীব হয় কেবল এমন একটি জিনিষ যাহা তাহা হইতে ঐ শক্তির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা হইলে যে মূহুর্ত্তে সে প্রত্যাবৃত্ত হইবে এবং আত্মায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, সেই মূহুর্ত্তেই পরম ঐক্য ও পরম নিস্তব্ধতা ভিন্ন আর সবই বন্ধ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, যদিই কোন অচিন্ত্য উপায়ে কর্ম্ম তখনও চলিতে থাকে, তথাপি যেহেতু আত্মা সকল জিনিষের প্রতিই সমভাবাপন্ন, সেহেতু কর্ম্ম হইল কি না তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, আর যদিও কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, কি কর্ম্ম করা হইল তাহাতেও কিছু আসিয়া যায় না। তাহা হইলে এই ঘোরতম ও নিষ্ঠুরতম কর্ম্ম করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ কেন, এই রথ, এই যুদ্ধ, এই রথী, এই দিব্য সারথী কেন?

গীতা ইহার উত্তরে দেখাইয়াছে যে, ভগবান অক্ষর আত্মা অপেক্ষাও মহত্তর, অধিকতর ব্যাপক, তিনি একাধারে এই আত্মা আবার প্রকৃতির কর্ম্মের অধীশ্বর। কিন্তু অক্ষরের যে অনন্ত শান্তি, যে সমতা, যে কর্ম্ম ও ব্যক্তিত্বের অতীত স্বরূপ,—ভগবান ভিতরে অক্ষরের এই ভাব লইয়াই প্রকৃতির কর্ম্মসকল পরিচালনা করেন। আমরা বলিতে পারি যে, সত্তার

এই প্রতিষ্ঠা হইতেই তিনি কর্ম্ম পরিচালনা করেন, আর আমরা যতই এই প্রতিষ্ঠায় গড়িয়া উঠি ততই আমরা তাঁহার সত্তায় এবং দিব্য কর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় গড়িয়া উঠি। এই অক্ষর প্রতিষ্ঠা হইতেই তিনি প্রকৃতিতে ইচ্ছা ও শক্তিরূপে বহির্গত হন, নিজেকে সর্ব্বভূতে অভিব্যক্ত করেন, জগতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন, সকলের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন, অবতাররূপে, মানুষের মধ্যে দিব্য জন্মরূপে নিজেকে প্রকট করেন; আর মানুষ যেমন তাঁহার সত্তায় গড়িয়া উঠে, এই দিব্য জন্মের মধ্যেই সে গড়িয়া উঠে। কর্ম্ম করিতে হইবে আমাদের কর্ম্মের এই অধীশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে, এবং আমাদিগকে আত্মায় গড়িয়া উঠিয়া আমাদের সত্তায় তাঁহার সহিত আমাদের একত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে এবং আমাদের ব্যক্তিত্বকে দেখিতে হইবে প্রকৃতিতে তাঁহারই আংশিক অভিব্যক্তি। সত্তায় তাঁহার সহিত এক হইয়া আমরা বিশ্বের সকল জীবের সহিত এক হইয়া উঠিব এবং দিব্য কর্ম্ম করিব, আমাদের নিজের কাজ বলিয়া নহে, পরন্তু লোক রক্ষা ও লোক সংগ্রহের নিমিত্ত আমাদের ভিতর দিয়া তাঁহারই কর্ম্ম বলিয়া।

এইটি সিদ্ধ করিয়া তোলাই মূল কথা, এবং একবার এইটি সিদ্ধ হইলে, অর্জ্জুনের সম্মুখে যে-সকল সমস্যা উঠিয়াছে সে-সব দূর হইয়া যাইবে। সমস্যাটি তখন আর আমাদের ব্যক্তিগত কর্ম্মের সমস্যা থাকে না, কারণ যাহা লইয়া আমাদের ব্যক্তিত্ব তাহা তখন সাময়িক ও নীচের জিনিষ হইয়া পড়ে, সমস্যাটি তখন হয় ভগবৎ ইচ্ছা আমাদের ভিতর দিয়া বিশ্বমাঝে যে-কর্ম্ম করিতেছে তাহারই সমস্যা। এইটি বুঝিতে হইলে আমাদিগকে জানিতে হইবে যে, এই পরম পুরুষ নিজে কি এবং

প্রকৃতিতেই বা কি, প্রকৃতির কর্ম্মপরম্পরা কি এবং তাহাদের লক্ষ্যই বা কি ; প্রকৃতি-স্থ পুরুষ এবং এই পরম পুরুষের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, জ্ঞানযুক্ত ভক্তির উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, তাহা জানিতে হইবে। এই সকল প্রশ্নের মীমাংসাই গীতার বাকী অংশের আলোচ্য বিষয়।
